৬ষ্ঠ বর্ষ; ১৩২৫

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

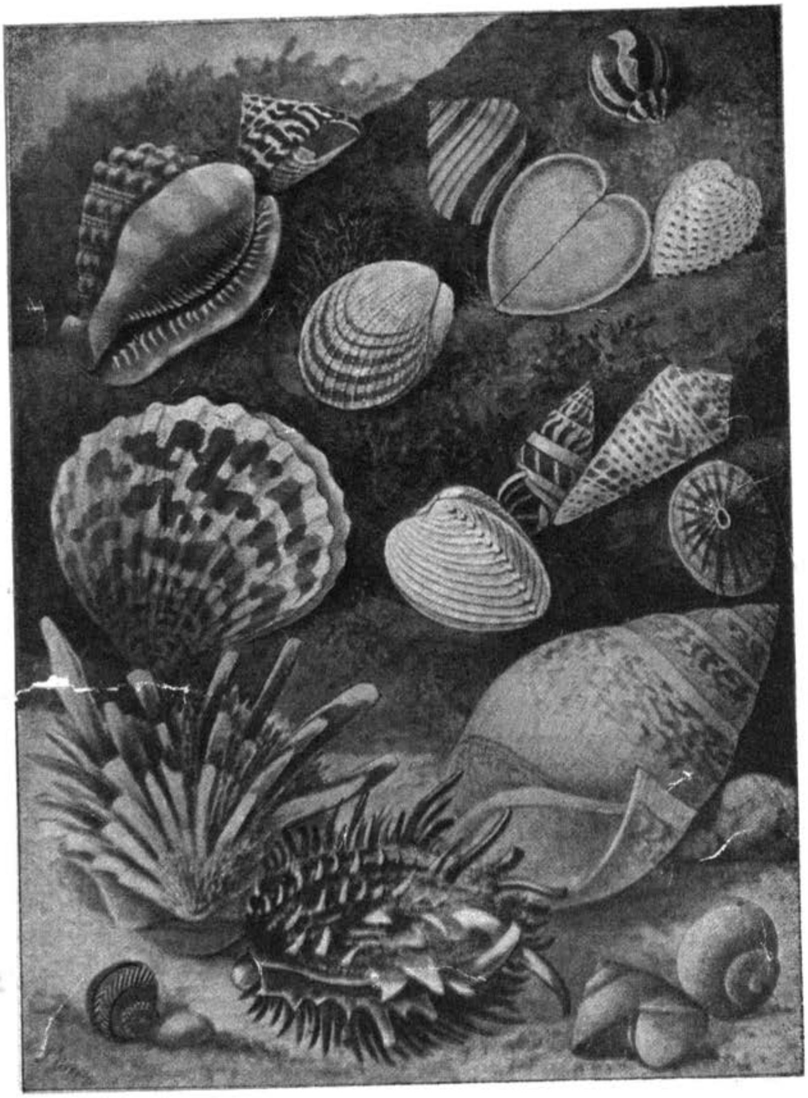


ষষ্ঠ বর্ষ ১৩২৫

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অদ্ভুত মাছ	১৫৩	খাই খাই	২০৪
অর্ফিয়ুস্	১১৯	খোঁড়া মুচির পাঠশালা	১১৬
অবুঝ	৩১৯	গরুর বুদ্ধি	৩৩৯
অহঙ্কারী রাজা	২৬১	গয়াসুর	২৩৩
আকাশের আলো	১	গান	২২৪
আগুন	২৪০	গাড়ী	৮৭
আজব খেলা	৩৩	গ্লাটন	২৭০
আস্থিকালের কীর্ত্তিস্তম্ভ	৩৮২	গ্রীসেল্‌ডা	৩০৬
তাবোল	২৮, ২৫৪	ঘটক ও বাঘ	১০২
আলো	২৪	চন্দ্র হংসের উপাখ্যান	১৬৫
আশ্চর্য্য ছবি	১১৩	চেলা বা তেঁতুলে বিছা	৩৬৪
আড়ি	২৮৯	চোখের ফাঁকি	৫৪
আহ্লাদী	৩৫১	ছুটি	১৯৩
উট পাখী	২০	জানোয়ার ইঞ্জিনিয়ার	২৪৯
ওয়াং	১৬২	জানোয়ারের ঘুম	১৮৩
ঔত্তম মনু	১৯৪	জীবনের হিসাব	৯৭
কালাচাঁদের ছবি	৮৩	"জোয়ান্"	২৭৯
কিম্ভুত	১৯১	জ্বর আর মাকড়সা	১১১
কুকুরের মালিক	১৮৮	ঝড়ের ছড়া	১২৯
কুকুরের গল্প	২৬৬	ঠকানে প্রশ্ন	২৪৮
কৃপণের সাজা	২১২	ঠকানে প্রশ্নের উত্তর	২৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ডোরিজেন	[illegible]	বুনো মোষ পোষমানা	৪৪
তারকাসুর	[illegible]	বুড়ীর বাড়ী	২৮৫
তিমির ব্যবসা	[illegible]	বেগের কথা	২১৬
তেওয়ারি	[illegible]	বেদব্ভ জাতক	৩২৭
তেজিয়ান্	[illegible]	বেহদ্দ বোকা	২২৬
দক্ষিণ দেশ	[illegible]	ব্রাহ্মণীর গঙ্গা লাভ	৬৬
দুই বন্ধু	[illegible]	ভয় কিসের ?	৯৫
দুঃখের কথা	১২৭	ভালুক কেন শীতকালে ঘুমায় ?	৬৯
দেবতার দুর্ব্বুদ্ধি	৩৪৬	ভূমিকম্প	১০৪
দোহা	২২৫	ভোলানাথের সর্দ্দারি	৩৭৮
ধাঁধা	৩০,২৫৬	মাজজুন	৩৭২
ধাঁধার উত্তর	৩২,৬৪	মজায় খেলা	২২১
নদী	১১২	মহাশীলব্জ জাতক	৩৫৪
নমস্কার	৩২১	মাছি	৭৮
নাক কাটা বুড়ো	৩৯	মানুষের কথা	১২২
নাকের বাহার	২৮৭	মুদ্রার কথা	১৪০
নানাকথা	১৫০	মেঘ বৃষ্টি	১৭৩
নিমন্ত্রণ	৮	যমজ রাজা	৭১
নিশাচর	৩১৬	লক্ষ্মী পক্ষী	১৪৩
নূতন তারা	১২৬	লাইব্রেরী	৩৪১
নোবেলের দান	১৮০	শান্তশীলা	৫৭
পতিব্রতার কাহিনী	১৩১	শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্য কথা	৩১২,৩৩১
পঞ্চুলাল	১৯৫,৩২২,৩৫৯	শীতের কাপড় ৩০২	৩
পণ্ডিত পক্ষীর উপাখ্যান	২৯০	শেয়াল আর কুমীর	১৬
পণ্ডিতের খেলা	১৪৭	সচ্চরিত্রতা	২৫৮
পিরামিড	৪৮	সয়তানীর সাজা	২২৯
পুরাতন লেখা	১৭০,২০২,২৩৫,২৭৬,৩৩৬,৩৬৯	স্বরলিপি	৩৭৬
পোষা বাঘ	৭৫	সাতচাল আর একচাল	১৯৯
বর্ষার কবিতা	৬৫	সোমিলক	১৭৭
বাজে গল্প	৩২,১৩৮	হিন্দুস্থানী গল্প	২৭২
বাতাসের গান	২৫৭	হেস’না	৬৩
বিলাতী হাতুড়ে	২১৪	হো	১২
বীরক	৯৮	ক্ষীর পুতুলের বিয়ে	১৬১



কয়েকটি রঙিন্ শঙ্খ



ষষ্ঠ বর্ষ বৈশাখ, ১৩২৫ প্রথম সংখ্যা

আকাশের আলো

রাত পোহাতে নিত্যি দেখা দাও
নীল আকাশে সোণার ভেলা
ভাসিয়ে চল সারা বেলা,
সন্ধ্যা হ'লে কোথায় ডুবে যাও ?

সূর্য্য তুমি কিসের তরে ভাই
একলা কর এপার ওপার ?
নাই কি খেলার সাথী তোমার ?
ছুটি তোমার একটি দিনও নাই ?

তোমরা কে গো জাগো সাঁঝের শেষে ?
অন্ধকার ঐ আকাশ তলে
হাজার বাতি উঠ্‌ল জলে।
দিপালী কি রোজ তোমাদের দেশে ?

চাঁদ তোমারে বড়ই ভাল বাসি।
দিনের আলো নিভে গেলে
জ্যোৎস্না আলো দাও গো জেলে—
পূর্ণিমাতে পূর্ণ রূপ রাশি।

আমরা ফিরি, মোদের সাথে ফিরে
দিন রাতি মাস পালা করি,
ছয় ঋতুরে হাতে ধরি,
নিখিল পিতার চরণ ঘিরে ঘিরে।

শ্রীসুখলতা রাও।

তারকাসুর

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দিতি ছিলেন কশ্যপের স্ত্রী। দৈত্যগণ সকলেই দিতির পুত্র ছিল। সত্যযুগে বিষ্ণু যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং অন্য দানবগণও ইন্দ্রের হাতে মারা যায়, তখন দিতি তাঁহার স্বামী কশ্যপের নিকট বর চাহিলেন—"আমার ইন্দ্রের মত বলবান্ একটি পুত্র হউক।" কশ্যপ বলিলেন— "এক হাজার বৎসর নিয়ম পালন করিয়া যদি শুদ্ধমনে থাকিতে পার, তবেই তোমার সেইরূপ পুত্র জন্মিবে।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ হাজার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে একদিন দিনের বেলা ঘুমাইয়া দিতি নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রও সেই সুযোগ পাইয়া জন্মিবার পূর্ব্বেই সন্তানটিকে বজ্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন। দিতি আবার কশ্যপের নিকট বর চাহিলেন—"আমার এমন একটি পুত্র হউক যে ইন্দ্রকে জয় করিবে এবং দেবতাগণের অস্ত্রশস্ত্রে যাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

কশ্যপ বলিলেন—"যদি দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিতে পার তবে "বজ্রাঙ্গ" নামে তোমার একটি পুত্র হইবে। তাহার শরীর হইবে বজ্রের মত শক্ত, সুতরাং অস্ত্র শস্ত্র তাহার কিছু করিতে পারিবে না।" দশহাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিয়া দিতির এক পুত্র জন্মিল।

পুত্র জন্মিয়াই সকল রকম শাস্ত্র শিখিয়া ফেলিল এবং মাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বলিল—"মা! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?" দিতি বলিলেন—"বাবা! দেবরাজ ইন্দ্র আমার অনেক পুত্র বধ করিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতিশোধ লও।"

মহাবীর বজ্রাঙ্গ মায়ের কথায় তখনই স্বর্গে গেল এবং ইন্দ্রকে বাঁধিয়া মায়ের নিকট লইয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা ও কশ্যপ সেখানে আসিলেন এবং বজ্রাঙ্গকে বলিলেন—"বাছা! ইন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়া তোমার কোন লাভ নাই; তাঁহার অপমান

যথেষ্ট হইয়াছে সুতরাং এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও।" তাঁহাদের কথায় বজ্রাঙ্গ তখনই ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া বলিল—"আমি তপস্যা করিতে চাই। হে দেব! আপনার অনুগ্রহে আমার তপস্যায় যেন কোন বাধা না ঘটে।"

বজ্রাঙ্গের কথায় ব্রহ্মা "আচ্ছা, তাহাই হইবে" বলিয়া পরমসুন্দরী এক কন্যা সৃষ্টি করিলেন। কন্যার নাম দিলেন "বরাঙ্গী" এবং তাহাকে বজ্রাঙ্গের সহিত বিবাহ দিয়া সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। ইহার পর বজ্রাঙ্গ স্ত্রীর সহিত বনে গিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল।

দৈত্য বজ্রাঙ্গ এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দুই হাত উপরের দিকে রাখিয়া তপস্যা করিল। তারপর হাজার বৎসর মাথা নীচু করিয়া এবং হাজার বৎসর পাঁচটি আগুনের কুণ্ডের মধ্যে অনাহারে থাকিয়া তপস্যা করিল। ইহার পর হাজার বৎসর তপস্যা করিল জলের মধ্যে থাকিয়া। দৈত্যপত্নী বরাঙ্গীও জলাশয়ের তীরে অনাহারে থাকিয়া



এবং একটিও কথা না কহিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যার তেজ দেখিয়া

দেবরাজ ইন্দ্রের মহা ভাবনা হইল! তিনি বরাঙ্গীর তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড বানর সাজিয়া আশ্রমের জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চূরমার করিলেন। বড় একটা সাপ হইয়া বরাঙ্গীকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। মেঘ হইয়া তাহার আশ্রম জলে ভাসাইয়া দিলেন! কিন্তু কিছুতেই বরাঙ্গীর তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক এইরূপে আরও হাজার বৎসর কাটিয়া গেলে ব্রহ্মা আসিয়া বজ্রাঙ্গকে বর দিতে চাহিলেন। বজ্রাঙ্গ বলিল—"হে দেব! চিরকাল যেন তপস্যায় আমার মতি থাকে। আমার মনে যেন কোন মন্দ ভাব না আসে।" ব্রহ্মা "তথাস্তু" (তাহাই হউক) বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তপস্যার পর বজ্রাঙ্গ দেখিল তাহার স্ত্রী বনের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" বরাঙ্গী বলিল—"হতভাগা ইন্দ্র আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে এমন একটি পুত্র যদি আমার থাকিত তবে সুখী হইতাম।"

স্ত্রীর দুঃখের কথা শুনিয়া বজ্রাঙ্গের বড় রাগ হইল। ইচ্ছা করিলে সে তখনই ইন্দ্রকে সাজা দিতে পারিত। কিন্তু সাধু দৈত্য তাহা না করিয়া পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আবার কেন তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিতেছ?" বজ্রাঙ্গ বলিল—"প্রভু! তপস্যা করিয়া এমন একটি পুত্র লাভ করিতে চাই যে ইন্দ্রকে সাজা দিয়া তাহার অত্যাচারের শোধ লইতে পারিবে।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি বর দিলাম—তারক নামে তোমার মহা বলবান্ এক পুত্র হইবে; দেবতারা তাহার নিকট হারিয়া যাইবেন।"

তারপর যথাসময়ে বরাঙ্গীর এক পুত্র জন্মিল। পুত্র জন্মিবামাত্র সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, ভীষণ বাতাস বহিতে লাগিল, মুনি ঋষিগণ ভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, চারিদিক্ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। তখন অসুরগণের আনন্দ দেখে কে! স্বর্গে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ভয়ের সীমা রহিল না! তারক জন্মিবামাত্র কুজম্ভ, মহিষ প্রভৃতি মহাবলবান্ দানবেরা আসিয়া তাহাকে দৈত্যকুলের রাজা করিল।

রাজা হইয়া তারক পর্ব্বতের গুহায় মহা ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল। কখন শুধু জলপান করিত, কখন অনাহারে থাকিত, আবার কখন শরীরের মাংস কাটিয়া আগুনে আহুতি দিত—এইরূপে শত শত বৎসর অতি কঠিন তপস্যা করিল। তখন

ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—"বাছা! আর তপস্যা করিও না, আমি তোমাকে বর দিব।" ইহা শুনিয়া তারক বর চাহিল—"কেহ যেন আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারে এবং কোনও অস্ত্রে যেন আমার মরণ না হয়।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"বাছা তারক! জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, কেহ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না। সুতরাং যাহা হইতে মৃত্যুর কোনই আশঙ্কা নাই এমন কোন লোকের হাতে তোমার মৃত্যু হইবার বর চাহিয়া লও।" ইহা শুনিয়া তারক মোহবশতঃ বর চাহিল—"হে প্রভু! সাত দিনের শিশুর হাতে যেন আমার মরণ হয়।" ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

এখন তারকের ক্ষমতার আর সীমা নাই। দেবতারা তাহার ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির! চন্দ্র সূর্য্য তাহার রাজ্যে আলো দেন, পবন তাহাকে বাতাস করেন আর স্বয়ং যম সব সময় উপস্থিত থাকিয়া চাকরের মত তাহার কাজ করেন। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। এক দিন সে খুব অহঙ্কার করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিল—"আমি যদি স্বর্গই আক্রমণ না করিলাম তবে রাজত্ব করিয়া লাভ কি? অতএব শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন কর, আমার আট চাকার রথ প্রস্তুত হউক।"

তখন সেনাপতি মহাবীর গ্রসন ভেরী বাজাইয়া দানব সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বলিল। তারকের আট চাকার রথ প্রস্তুত হইল, তাহাতে এক হাজার ঘোড়া! সে কি যেমন তেমন রথ—চার যোজন জায়গা জুড়িয়া রথখানি; তাহার চারিদিক্ সাদা কাপড়ে ঢাকা। দশ কোটি মহা বলবান্ দৈত্য যুদ্ধের জন্য সাজিল। জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জর, মেঘ, কালনেমি, নিমি, মথন, জম্ভক ও শুম্ভ—এই দশ মহা যোদ্ধা তাহাদের দলপতি। তারকের রথের চূড়ায় সোণার নিশান, গ্রসনের ধ্বজে মকর, জম্ভের ধ্বজে লোহার পিশাচমুখ, কুজম্ভের গাধা, মহিষের রথে সোণার শৃগাল এবং শুম্ভাসুরের ধ্বজে কাকের আকৃতি নিশান। ইহাদিগের রথের চূড়াগুলি যেমন অদ্ভুত তেমনই অদ্ভুত বাহনগুলি। সেনাপতি গ্রসনের রথের বাহন একশটা বাঘ, জম্ভাসুরের একশ সিংহ, কুজম্ভের রথে অনেকগুলি পিশাচমুখ গাধা ও মহিষের রথের বাহন অনেকগুলি উট। এইরূপ নানা রকম অদ্ভুত বাহনের রথে চড়িয়া দৈত্যদলপতিগণ যুদ্ধ যাত্রা করিল।

দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সাজিলেন। ইন্দ্রের রথখানি অযুত ঘোড়ায় টানে, তাহার চূড়ায় সোণার হাতী আর মাতলি তাহার সারথি। যমরাজা

দণ্ড হাতে মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। অগ্নির হাতে ভীষণ শক্তি আর তাঁহার বাহন ছাগল। পবন হাতে অঙ্কুশ লইয়া প্রস্তুত হইলেন। বরুণ চলিলেন সাপে চড়িয়া আর কুবের মানুষটানা রথে চড়িয়া। চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ দল বল লইয়া সাজিলেন। ইহা ছাড়া যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আসিল। তারপর উভয় দলে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে দেখিতে রক্তের স্রোত বহিল।

যমরাজ দৈত্যসেনাপতি গ্রসনকে আক্রমণ করিলেন। তিনি তাহাকে দারুণ বাণসকল মারিতে লাগিলেন বটে কিন্তু গ্রসন হাসিতে হাসিতে সব বাণ কাটিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশটি বাণ মারিল—যম একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি রাগিয়া গ্রসনের রথের উপর ভীষণ এক মুদ্গর ছুড়িয়া মারিলেন, কিন্তু সে লাফ দিয়া শূন্যের মধ্যেই বাঁ হাতে সেই মুদ্গর ধরিয়া ফেলিল। শুধু তাহাই নহে, আবার সেই মুদ্গর দিয়াই তাঁহার বাহন মহিষটিকে ধরাশায়ী না করিয়া ছাড়িল না। ইহাতে যম রাগিয়া প্রাসাস্ত্র দিয়া তাহাকে এমনই আহত করিলেন যে সে মাটিতে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান! তখন জম্ভাসুর ভয়ঙ্কর এক ভিন্দিপাল দিয়া যমের বুকে এমন দারুণ আঘাত করিল, যে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল।

এ দিকে সেনাপতি গ্রসন চেতনা পাইয়া যমের উপর সাংঘাতিক এক গদা ছুড়িয়া মারিল, যমও তৎক্ষণাৎ তাহার উপর ভীষণ কালদণ্ড ছাড়িলেন। আকাশে এই দুই মহা অস্ত্রে ঠোকাঠুকি হইয়া ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সৃষ্টি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। কিন্তু শেষে যমদণ্ডেরই জয় হইল—অসুরের গদাকে চূরমার করিয়া দণ্ড গ্রসনের মাথায় পড়িবামাত্র পুনরায় তাহার জ্ঞান লোপ পাইল।

ক্ষণকাল পর চেতনা পাইয়া গ্রসন ভাবিল—"আমি যদি এখন হারিয়া যাই তবে সৈন্যদল নষ্ট হইবে।" এই ভাবিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে দারুণ এক মুদ্গর লইয়া যমের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। যম চক্ষের নিমেষে সরিয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন কিন্তু মুদ্গর অনেকগুলি যমকিঙ্করকে না মারিয়া ছাড়িল না। তখন যমকিঙ্করগণ ভীষণ রাগিয়া চারিদিক হইতে গ্রসনকে আক্রমণ করিল। গ্রসন গদা দিয়া, শূল দিয়া এবং মুদ্গর দিয়া অনেকগুলিকে মারিল বটে কিন্তু কিঙ্করেরা তবু তাহাকে ছাড়িল না। কেহ তাহার হাতে ঝুলিল, কেহ কামড়াইয়া ও কেহ কীলাইয়া তাহাকে অস্থির ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিল।

তাহা দেখিয়া যমও পুনরায় তাহাকে ভীষণ আক্রমণ করিলেন এবং দণ্ড দিয়া তাহার রথের বাঘগুলিকে মারিয়া শেষ করিলেন। তখন গ্রসন রথ হইতে নামিয়া যমের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ চড়, চাপড়, মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে যম ক্লান্ত হইয়া দানবের কাঁধের উপর ঢুলিয়া পড়িলেন। এই সুযোগ পাইয়া দানব গ্রসন তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া এমনই প্রহার করিল যে যম সাংঘাতিক আহত হইয়া মরার মত পড়িয়া রহিলেন। তখন গ্রসনের আস্ফালন দেখে কে ?

এ দিকে কুবের দারুণ এক শূল দিয়া সত্তর হাজার দানব বধ করিয়া জম্ভাসুরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়াছেন। জম্ভাসুর এক পরশু মারিয়া কুবেরের রথটাকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিল। কুবেরও মহা ক্রোধে তাঁহার গদার আঘাতে জম্ভাসুরকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। তখন দানব কুজম্ভ কুবেরকে আক্রমণ করিল। কুবের তাঁহার শক্তি দিয়া তাহাকেও অজ্ঞান করিলেন। কিন্তু খানিক পরেই চেতনা পাইয়া কুজম্ভ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর এক পট্টিশ দিয়া এমনই আঘাত করিল যে কুবের অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া রক্ষপতি "নিঋতি" তামসী মায়ায় চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া কুজম্ভকেও মোহিত করিলেন। দানবসৈন্যেরা আর চক্ষে দেখিতে পায় না, তাহারা অন্ধকারে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন মহিষাসুর অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত্র মারিয়া অন্ধকার দূর করিলে পর দানব কুজম্ভ দারুণ ক্রোধে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রাক্ষসপতি নিঋতির চুলের মুঠি ধরিয়া খড়গদ্বারা তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া বরুণ দেব তাঁহার পাশাস্ত্র দ্বারা চক্ষের নিমেষে দানবের দুটি হাত বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং গদা দিয়া তাহাকে এমন সাংঘাতিক আঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমি করিতে লাগিল। কুজম্ভের এই দুরবস্থা দেখিয়া মহিষাসুর প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নিঋতি ও বরুণকে গিলিতে আসিল ! নিঋতি উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া ইন্দ্রের আশ্রয় লইলেন কিন্তু বরুণ ছুটিয়াই চলিলেন আর তাঁহার পিছনে মহিষাসুরও হাঁ করিয়া চলিল।

এই সময়ে চন্দ্রদেব যুদ্ধ করিতে আসিলেন বলিয়া বরুণের রক্ষা ! চন্দ্র সোমাস্ত্র ও বায়ব্যাস্ত্র মারিতেই দারুণ শীতে দৈত্যদিগের শরীর অসাড় হইয়া গেল। দুরন্ত মহিষ শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল !

(আগামীবারে শেষ হইবে)

নিমন্ত্রন

দামুর দোষের মধ্যে এই যে, শুধু সে পেটুক নয়, কৃপণও বটে। বেচারা বড্ড খেতে ভালবাসে, কিন্তু একটি আদ্‌লা পর্য্যন্ত সহজে খরচ করতে চায় না। তিন পাড়ার সকলের সঙ্গেই সে সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছে, কেউ খুড়ো, কেউ মেশো, কেউ পিশে। একলা মানুষ, বাড়ীতে প্রায়ই হাঁড়ী চড়েনা, আজ এর বাড়ী, কাল তার বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। দামুর মনটা কিন্তু বেজায় খোলাখালা, আর তেম্‌নি আমুদে। সকলে তাকে খুসী হয়েই খাওয়াত, এমন কি বাড়ীতে ভাল খাবার টাবার হলে দামুর ডাক পড়ত সবার আগে। কাজেই দামুর দিন বেশ চলে যায়।

ও পাড়ার চণ্ডীচরণ এই সব দেখে শুনে হাড়ে হাড়ে চটে—"কেন, এত খাতির কিসের? লোকের মোটা ভাত কাপড়ই এখন মেলা দায়, আর নিত্য এত সাত ব্যঞ্জন পরের ঘাড়ে খেয়ে বেড়াবার দরকার কি? এ বড় বাড়াবাড়ি!"—

একদিন ত পথে দামুর সঙ্গে তার দেখা। দামু সোজা মানুষ, অত শত জানে না, এক গাল হেসে বলে ফেল্‌ল "কি চণ্ডীদা! খাওয়াচ্ছ কবে? শুনেছি বৌদি নাকি ওস্তাদ রাঁধুনী; আর তোমাদের পুকুরের মাছও, যাই বল, লোকে বলে বড়ই মিষ্টি——"! চণ্ডী বল্‌ল "তোমাকে খাওয়াবনাত খাওয়াব কাকে? খুব ভাল করেই খাওয়াব অনেক দিন যাতে মনে থাকে—বুঝলে? তাহলে কাল সকালে আমার ওখানেই দক্ষিণ হস্তের কার্য্যটি করো। মনে থাকবে ত—?"

নেমন্তনের কথা আবার মনে থাক্‌বে না? পরদিন ভালক'রে সকাল না হতেই স্নান টান করে দামু একেবারে প্রস্তুত। তার আর সবুর সইছে না, একটু এদিক ওদিক পাইচারি ক'রে খিদেটাকে বেশ ক'রে জাগিয়ে চণ্ডীচরণের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল।

সেখানে বসে গল্প স্বল্প করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল, দামু ভাবে—"নেমন্তনের গন্ধ পাচ্ছি না কেন? কৈ খেতেও ত ডাকে টাকে না"! শেষে নিরাশ হয়ে বলে ফেল্‌ল "চণ্ডীদা খেতে দেবে কখন? পেট যে চোঁ চোঁ করছে।"

"আরে তোমার এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল! কচি খোকা নাকি হে? অত ব্যস্ত হয়োনা ভায়া; আমিষ আর নিরামিষ দুই রকমই হচ্ছে কিনা? সবুরে মেওয়া ফলে—তা জানত হে"?—এমনি ক'রে আরো ঘণ্টা খানেক কাট্‌লে পর তখন খাবার ডাক পড়ল। খেতে বসে দামু দেখল পাতায় শুধু একটুখানি ভাত দেওয়া হয়েছে। ভাবল

তরকারী হয়ত বৌদি নিজে পরিবেশন করবেন। এই আসবে, এখনই আসবে মনে করছে, তরকারী আর আসে না। হটাৎ দেখে চণ্ডীচরণ শুধু ভাত ডেলা পাকাচ্ছে আর টপাটপ্ মুখে দিচ্ছে; সামনের বাড়ীতে মাচায় সুন্দর লাউ হয়েছে, সেই দিকে তাকিয়ে এক একবার হাঁ করছে আর ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছে।

দামু বল্‌ল "কি দাদা, বড় যে বেজায় ক্ষিদে দেখছি! মেওয়া ফলবার সবুর বুঝি আর সইছে না?" চণ্ডী বড় বড় চোখ ক'রে বল্‌ল "সে কি দামু দাস! তুমি খাচ্ছ না নাকি? আমারত নিরামিষ প্রায় শেষ হল। ঐ মাচার লাউ দেখ্‌ছি আর ভাত খাচ্ছি, অর্দ্ধেকটা লাউ খাওয়া হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেক তোমার জন্য রেখেছি। এখন বোসেদের পাঁঠাটা একবার ডাকলেই আমার আমিষ খাওয়া আরম্ভ হবে।" দামু হেসে বল্‌ল "চণ্ডীদাদা, ঠাট্টা করছ—না"? "ভাল আপদ! তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে যাব কেন? এই আক্রার দিনে আমাদের মত মানুষের এম্‌নি না কর্‌লে চলবে কেন? আমাদের বাড়ীর এই রকমই দস্তুর হয়েছে। নইলে কি আর রক্ষা আছে? তোমার মতন ভায়া পরের ঘাড়ে খেয়ে ফুর্ত্তি করেত বেড়াই না। আমাদের ভাবনা চিন্তা আছে, নিজেরা খেটে ক'রে খাই।"

দামোদর তখন ঘাড় গুঁজে শুধু শুধু কতগুলো ভাত গিলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যাবার সময় চণ্ডীচরণ তার পিঠ থাবড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল "বেশ পেট ভরে খেয়েছত? দামু বল্‌ল "ওঃ! যা খাইয়েছ দাদা—এ আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।" এই বলে দামু বাড়ী পালাল। তখন চণ্ডী বল্ল, "গিন্নি, এইবার খাবারগুলো আন ত। এখন ভাল ক'রে খাওয়া যাক্"।

বাড়ী এসে দামু একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ল, তুই দিন কাউকে আর মুখ দেখাল না। তিন দিনের দিন পাশের বাড়ী থেকে তার এক বুড়ী "জেঠি" এসে বল্লেন "বাবা দামু, তোমায় আজ কদিন দেখতে পাইনে যে? অসুখটসুখ করে নি ত?" দামু মাথা নেড়ে বল্লে "না"। জেঠিমা বল্লেন "পরশু সকালে আমার বাড়ীতে জামাই খাওয়াচ্ছি—তা, তোমারও নেমন্তন রইল। আর দেখ, আমার ত লোক জন নেই—জানইত সব অসুখ বিসুখ। তা তুমি যদি একটু—" দামু উৎসাহে বলে উঠল "তার জন্য ভাবছেন কেন জেঠিমা—আমি বাজার টাজার সব ক'রে দিচ্ছি"। শুনে জেঠিমা খুসী হ'য়ে বাড়ী গেলেন।

তারপরদিন ঘুম থেকে উঠেই দামু দৌড়ে বোসপাড়ায় গিয়ে তার চণ্ডীদা'কে বলে এল "কাল আমার বাড়ী তোমার নেমন্তন"। নেমন্তনের কথা শুনে সে পাড়ায়

২

হুলস্থূল পড়ে গেল। সবাই বলে "হ্যাঃ—যে কৃপণ, ওকে কে খাওয়ায় তার ঠিক নেই—ও আবার চণ্ডীকে খাওয়াবে"।

নেমন্তন্নের দিন সকাল বেলা দামু তার জেঠীর জন্য বাজার করতে গেল। ফির্‌বার সময় মস্ত এক মাছ নিয়ে সে চণ্ডীর বাড়ীর সাম্‌নে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, "চণ্ডীদা, আজ



নেমন্তন, মনে আছে ত"? চণ্ডী জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখে দামুর পিঠে মস্ত মাছ। দেখে চণ্ডীর মুখে হাসি আর ধরে না! দামু বল্ল, "ময়রার লোক এখনি এসে পড়্‌বে, তাই তাড়াতাড়ি মাছটা নিয়ে যাচ্ছি। রান্নার কিছু দেরী হ'তে পারে, তা একটু র'য়ে স'য়ে যেও"। চণ্ডী হেসে বল্ল, "যে রকম আয়োজন ক'রেছ, খিদেটাও সেই রকম জমিয়ে নিতে হবে ত"?

তারপর সেই রাস্তা দিয়ে মিঠাই নিয়ে ময়রা গেল, দই ক্ষীরের হাঁড়ি নিয়ে গদাধর গয়লা গেল। চণ্ডী সব দেখছে, আর জিভ দিয়ে তার জল পড়ছে! বেলা যখন দুপুর

হ'য়ে এল, আর ক্ষিদেটাও বেশ ক'রে জেগে উঠ্ল, তখন চণ্ডীচরণ মাছ দই আর সন্দেশের কথা ভাব্তে ভাব্তে দামুর বাড়ী হাজির হ'ল। দামুর ঘরের পিছনেই পাঁচিল, তার ওপাশে জেঠীর বাড়ীতে রান্না চলেছে—সেই রান্নার গন্ধে চণ্ডীর প্রাণটা যেন উদাস হ'য়ে উঠ্ল। সে বল্ল, "ও দামু দাস! কাণ্ডটা ক'রেছ কি! এ যে পোলাও পোলাও গন্ধ ঠেক্ছে"! দামু মুখখানা কাচুমাচু ক'রে বল্ল, "হ্যাঁ, এই পোলাও রাঁধ্ছে"। শুনে সত্য সত্যই চণ্ডীর জিভ থেকে টুপ্ ক'রে এক ফোঁটা জল প'ড়ে গেল। সে বল্ল, "ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং—ঐ সুগন্ধেই আমার অর্দ্ধেক পেট ভ'রে এল"।

তারপর চমৎকার পায়েসের গন্ধ পাওয়া গেল। তখন দামু উঠে কোথায় যেন গেল —আর খানিক বাদেই উঠান থেকে ডাকতে লাগল "ও চণ্ডী দা! তুমি পেঁয়াজ খাওত? পাঁঠার ঝোলে পেঁয়াজ দিয়ে ফেলেছে"। পাঁঠার নাম শুনে চণ্ডীচরণ উৎসাহে "খুব খাই, খুব খাই" বলে উঠে দেখে দামু এক খুরি মাংস নিয়ে টপাটপ্ খাচ্ছে আর বল্ছে, "একটু চেখে দেখছি, নুন টুন ঠিক হ'লো কি না।" একে চণ্ডীচরণের খিদে তখন জ্বলে উঠেছে, তার উপর এই কাণ্ড! সে তাকিয়ার উপর পড়ে ছটফট কর্তে লাগল। এম্নি ক'রে অনেকক্ষণ শুয়ে ব'সে চণ্ডী বল্ল "আর কত দেরী হে"? দামু বল্ল "দেখে আসি"। এই বলে সে খিড়কীর দরজা দিয়ে নেমন্তনের বাড়ীতে ঢুকে খেতে বসে গেল। ওদিকে বসে থাকতে থাকতে চণ্ডীচরণ ঝিমিয়ে পড়েছে, দামু খাওয়া দাওয়া সেরে মুখের মধ্যে একগাল পান পুরে ঢেকুর তুল্তে তুল্তে বাড়ী ফিরেই ডাক দিল "চণ্ডীদা"! চণ্ডী ধড় মড়িয়ে উঠে বল্ল "ডাক্ছ নাকি"? দামু বল্ল "হ্যাঁ—বল্ছি, এখন বাড়ী যাচ্ছ নাকি?" চণ্ডী প্রথমটা ভাবল দামু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, কিন্তু দামুর মুখে পান দেখে তার শুক্‌নো মুখ একেবারে চামড়ার মত শুকিয়ে গেল; সে কাষ্ঠ হেসে বল্ল "কই! খেতে ডাক্লে না?" দামু বড় বড় চোখ ক'রে অবাকমত মুখ ক'রে বল্ল, "সে কি দাদা? একশো হাত দূরে কাঁচা লাউ দেখ্লে আর পাঁঠার শব্দ শুন্লে তোমার খাওয়া হয়ে যায়, আর এখনও বলছ খেতে ডাকল না! ভেবে দেখত, তোমার নাকের গোড়া দিয়ে কত ক্ষীর গেল দই গেল, সন্দেশ গেল পান্তুয়া গেল, অমন বড় মাছটা গেল—তারপর পোলওয়ের গন্ধ পায়েসের গন্ধ সেও কি দাদা কম খেয়েছ? আর তখন যে খুরী ভরা মাংস খেলাম তাও কি তোমায় দেখিয়ে খাই নি? আর শব্দের কথা যদি বল, রান্নার ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ আর খন্তি নাড়ার খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ত সারাক্ষণই শুনেছ? এতে তোমার মত দশজন খাইয়ের পেট ভরতে পারে। তুমি যে এতক্ষণ ধ'রে কিছুই খাওনি আমি কি ক'রে জান্‌ব বল"?

তখনও চণ্ডীচরণ আশা ছাড়েনি—সে বল্ল, "বল কি হে! তুমি একা নিজের জন্য এত আয়োজন ক'রেছিলে নাকি"? দামু বল্ল, "অবাক কর্‌লে যে! আমি কোত্থেকে আয়োজন কর্‌ব? আমার এক জেঠী আজ জামাই খাওয়াচ্ছেন তাই আমাকে বলেছিলেন বাজার টাজার ক'রে দিতে। আমি ভাবলুম, চণ্ডীদার ত খাওয়ার কোন ল্যাঠা নেই—এতগুলো ভাল ভাল খাওয়া আছে, দেখে আর শুঁকে আর রান্নার গন্ধেই ও খেয়ে বাঁচবে। তাও যদি একটু আগে বল্‌তে, না হয় জেঠীর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে কিছু নিয়ে আস্‌তাম—এখন কি আর বাকী আছে কিছু? এখন কাকে কুকুরে এঁটো খাচ্ছে"।

চণ্ডীচরণ আর কথাটি না ব'লে আস্তে আস্তে বাড়ীমুখো রওনা হ'ল।

বিকাল বেলায় পাড়ার লোকে নেমন্তন্নের খবর শুনবার জন্য যখন চণ্ডীর বাড়ীতে গেল, তখন তারা শুনল যে চণ্ডীর শরীরটা ভাল নয়—সে আজ কারও সঙ্গে দেখা কর্‌বে না। সবাই বল্‌ল, "দামু বোধহয় বেজায় খাইয়েছে।"

শ্রীশান্তিলতা চৌধুরী।

হো

আমাদের ভারতবর্ষে যেমন সুসভ্য লোকেরা অনেক কাল থেকে বাস করে আসচে—আবার তেমনি অসভ্য জঙ্গলীরাও গভীরবনে পাহাড়ের গায়ে কুঁড়ে ঘরে আজ পর্য্যন্ত বাস করে। এদের সঙ্গে আমাদের সব চেয়ে তফাত এই যে আমরা লিখতে পড়তে জানি আর ওরা লেখাপড়া যে কাকে বলে তাই জানেনা—তাই ঠিক আদিমকালেও যেমন ছিল এখনও সেই রকমটিই আছে। এখনও এরা প্রায়ই একটা আস্ত গাছকে এড়োভাবে কেটে, গাছের চারিধার যেমন এবড়োখেব্‌ড়োই থাক, গাড়ীতে লাগিয়ে চাকার কাজ করে নেয়। এই অসভ্য জাতির সঙ্গে রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। তবে, আমাদের বাংলায় যেমন পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ আছে আর তাদের সকলেরই ভাষা ও চালচলন কিছুনা কিছু তফাৎ, এদেরও মুণ্ডা, সাঁওতাল খেড়িয়া প্রভৃতির সঙ্গে সেই রকম আচারে বিচারে, ভাষায় ভঙ্গীতে কিছু কিছু তফাৎ। যেমন, রাঁচি জেলার লোকে মাঠকে বলে 'পিঁড়ি' আর 'হো'রা বলে 'পি', মুণ্ডারা মেয়েকে বলে 'কুড়ি' 'হো'রা বলে 'কুয়ি', মুণ্ডারা বাড়ীকে বলে 'ওড়া' আর 'হো'রা 'ওয়া' বলে।

হোদের যে আর একটা নাম 'লড়কাকোল' আছে, সেটা তাদের আসল নাম নয়। ওরা লড়াই ভালবাসে বলে 'লড়কা' নামটা চলে আস্‌চে। এদের ছোট ছোট ছেলেরা যখন গরুচরাতে যায় বা বন জঙ্গলে যায় তখন সর্ব্বদাই হাতে তীর ধনুক রাখে। ছেলেদের খেলাই হ'ল তীর ছোড়া। ছোট বেলা থেকে অভ্যাস করে শেষে এরা খুব ভাল তীরন্দাজ হ'য়ে দাড়ায়। 'হো' মানে ওদের ভাষায় মানুষ। আর মুণ্ডারা নিজেদের 'মুড়া' বলে, একথাটার মানে 'মুণ্ড' (মাথা বা শ্রেষ্ঠ)। দেখা যায় সব জাতের লোকেরাই নিজের নিজের জাতকে বড় দেখে।



অসভ্য জাত মাত্রেই দেখা যায় ফুল আর রংচং খুব ভালবাসে। এরাও তাই রং আর ফুল খুব পছন্দ করে। কোথাও লাল টকটকে ফুল দেখ্‌লেই সেটি পুরুষেরা কাণে আর মেয়েরা তাদের উড়েমেয়েদের মত করে বাঁধা একপেশে খোঁপায় গুঁজে ফেল্‌বে।

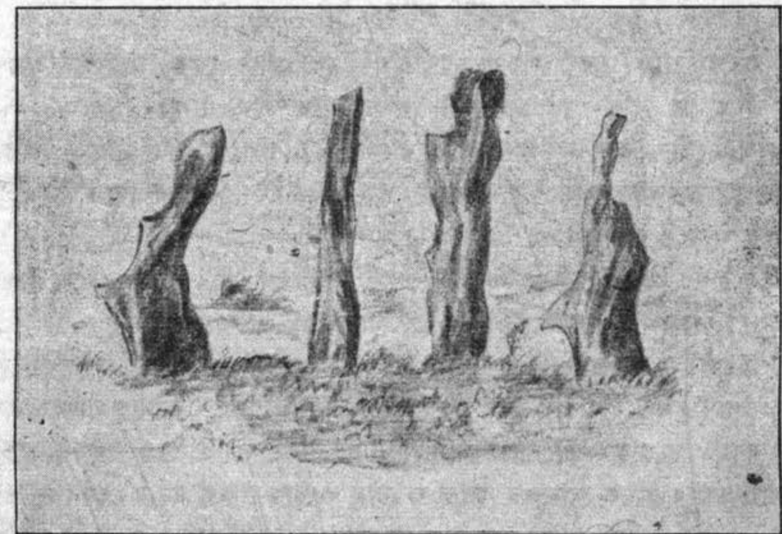
এদের বাড়ীতে যাও দেখবে কেমন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবার ঘরের দেয়ালে নানা রকম লাল হলুদ, সাদা কালো মাটিদিয়ে চিত্রবিচিত্র করা। সবারই ঘরের সামনে ঐ রকম পরিষ্কার উঠান ('রাচা') থাকে সেইখানে কাজকর্ম্মের পর সকলে এক সঙ্গে বসে বসে তাদের চাষবাসের আর সুখ দুঃখের কথা বার্ত্তা কয়। এদের ঘর তৈরীর একটা মস্ত দোষ এই যে, আলো হাওয়ার জন্য এরা জানলা আদৌ রাখেনা কেবল ঘরে ঢোকবার একটি মাত্র দরজা থাকে। বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে এদের বাড়ীর উঠান খুব ছোট করে আর চারপাশটা খুব উঁচু পাথরের বা কাঠের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে রাখে।

এই সব অসভ্যদের গায়ের রং কালো মিশমিশে, ঠোঁট পুরু, নাক খাঁদা, চোখ ফুলোফুলো। কিন্তু, হোদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলের লোককে বেশ সুশ্রী আর ফর্সা দেখা যায়। এদের পুরুষ আর মেয়েরা সকলেই খুব খাটে ব'লে ওদের শরীরের গঠন খুব সুন্দর হয়। এরা প্রায় আমাদের দেশের সভ্যদের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে। খুব বুড়ো হ'লে আমদের লোকেরা যেমন অথর্ব্ব হ'য়ে পড়ে, এরা তা হয়না। মরবার আগে পর্য্যন্ত বন থেকে গাছে চড়ে, কাঠ কেটে ঘরে আনতে ও কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমি তৈরী করতে এদের দেখা যায়। হো'রা খুব সাদাসিদে আর সত্যবাদী আর গল্প স্বল্প নাচ গান খুব ভালবাসে।

এদের প্রধান দেবতা হ'লেন 'সিংবোঙ্গা'—সূর্য্যদেব। আর দেবী হলেন তাঁর স্ত্রী 'চাণ্ডু'—চাঁদ। এই দুটি ছাড়া আরো অনেক ছোটখাট দেবতা আছেন। যেমন চানালা দেসুমবোঙ্গা আর তাঁর বৌ পানগোরা। এদের বছরে সাতটা পর্ব্ব। প্রায় সব পর্ব্বই ওদের চাষ বাস নিয়ে। ওদের মাঘি পরব সব চেয়ে বড় উৎসব। এই পূজোতে দেসাউলি বোঙ্গার পূজো হয়। সমস্ত মাঘ মাস এক একদিন এক এক গ্রামে দলে দলে লোকজন জড় হয় আর মাদল বাজিয়ে নাচে। এদের নাচ সাঁওতালদের মতই, হাত ধরাধরি করে এক একদল স্ত্রী পুরুষে তালে তালে পা ফেলে একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে, একবার ঝুঁকে একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সিপাইদের ড্রিলের মত করে। এদের আচার বিচার ভারি মজার। ছেলের নামকরণ করবার সময় সাধারণতঃ ঠাকুর-দাদার নামই ওরা রাখে তবে তারও একটা পরীক্ষা আছে। ছেলের বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এক জায়গায় বসে একটি পাত্রে জল রাখে তাতে একে একে ধান ফেলে। যদি বেশী ধান ভাসে তবেই ছেলের ঠাকুরদাদার নামে নামকরণ হয়, তা না হ'লে যেদিন হ'য়েচে সেই দিনের—যেমন, সোমবারে জন্মালে সোমা, বৃহস্পতিতে জন্মালে বিরসা—

এই রকম বা অন্য একটা কিছু নাম দেয়। এই উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনকে ছেলের বাপ মা ভোজ খাওয়ান। নাচ গানও হয়। এরা যেমন দেব দেবী মানে তেমনি আবার দুষ্টু ভূত, ডাইন প্রভৃতি ও মানে। নিজেদের বা গরুবাছুরের কোন অসুখ বিসুখ হ'লেই ডাইন ধরার জন্যে পাড়ার 'সোখার' (যারা ডাইন ধরে দেয় তাদের 'সোখা' বলে) কাছে যায়। শেষে, পাড়ার কোন লোক ডাইন বলে সাব্যস্ত হ'লে তার আর লাঞ্ছনার শেষ থাকে না! আগে ওরা একেবারেই তাকে মেরে ফেলত—ইংরাজের শাসনে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমি একবার একটা বীরভূমের সাঁওতাল পল্লীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি গোশালার দেয়ালে দেখলুম পূজোর ঘটে হিন্দুদের যেমন সিঁদুর দিয়ে মানুষের আদরা আঁকা থাকে এখানেও সেই রকম গোবর দিয়ে আঁকা। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এটি একটি দেবতা, গোশালা পাহারা দিচ্চেন। 'হো'রা আবার নানান শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। পথে একপাল হনুমান দেখলে গরু বাছুর বৃদ্ধি, রাস্তার মাঝে বিনা



শসানদিরির পাথর।

কারণে একটা কোন বড় গোছের ডাল পড়ে থাকতে দেখলে শ্বশুর কুলের নয় নিজের

পরিবারের মধ্যে কোন আত্মীয়ের অমঙ্গল হয়, বলে স্থির করে। গুব্‌রে পোকাকে যদি পায়ের মাঝে একটা অসম্ভব রকম বড় গোবর তাল পাকিয়ে পাকিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়, তবে যে দেখ্‌তে পায় সে গরীব হ'য়ে যায়।

এদের মৃত সংস্কার মহাসমারোহে হ'য়ে থাকে। কোন লোকের মৃত্যু হ'লে তাকে প্রথমে স্নান করায়, পরে একটা বাক্সে পুরে তাতে তার কোদাল শাবল ধনুক যা সে ব্যবহার করত সব দিয়ে, সবশুদ্ধ দাহ করে পরে সেই ছাই একটা মাটির হাঁড়িতে রেখে মহাধুমধামে ওদের যেখানে মৃতের চিহ্ন পাথরচাপা দিয়ে সবাই রাখে, সেই 'শসান দিরিতে' একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে চাপা দেয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা পাথর দেয়। সেই সময়ে খুব জোরে জোরে মাদল বাজায়। শসানদিরিতে পাথর খাড়া করেও বসানো থাকে।*

শেয়াল আর কুমীর

(হো জাতির গল্প)

এক নদীর ধারে এক শেয়াল থাক্‌ত। সে রোজ রোজ নদী পেরিয়ে পাকা পাকা বটফল খেতে যে'ত। গাছটা নদীর অপর পারে অনেকটা দূরে ছিল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল—নদীও জলে ভরে গেল। শেয়ালের হ'ল মুস্কিল! কি ক'রে ওপারে যাবে, গিয়ে বটফল খাবে? মনের দুঃখে সে নদীর পারে টহল দিতে লাগলো আর নানা মতলব আঁটতে লাগল।

সেখানে নদীর ভিতর ছিল এক কুমীর; সে শেয়ালের ভাব গতিক দেখে জল থেকে মুখটি বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কি হে শেয়াল ভায়া, তোমার হ'ল কি?

ধূর্ত্ত শেয়ালের মাথায় তক্ষুনি এক দুষ্টুমি বুদ্ধি এসে গেল—সে কুমীরকে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কুমীর দাদা সে আর বল্‌ব কি—বেজায় বিপদ! আমায় পাড়ার মানুষেরা এক মস্ত কাজ দিয়েছে—তাদের শসানদিরির জন্যে একটা প্রকাণ্ড পাথর চাই, তাই তারা আমায় ওপার থেকে আন্‌বার জন্যে ফরমাস করেছে, কিন্তু নদীর যেমন ভাব গতিক তাতে তো ওপারে যাবারই কোন উপায় দেখছি না, তা পাথর আন্‌ব কি করে বল? কিন্তু

---

* শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার "হোরেয়া কাজি" (হো'দের গল্প) নামে বহি বাহির করিতেছেন, তাহা হইতে 'হো' জাতির বিবরণ ও শেয়াল কুমীরের গল্প ও ছবি লওয়া হইল।

কাজটা কর্ত্তে পার্‌লে বেশ দুপয়সা লাভ ছিল হে! গাঁয়ের লোকগুলো আমায় বলেছে পাথর এনে দিতে পার্‌লে তারা কতকগুলো বেশ মোটা সোটা দেখে পাঁঠা আমাকে বখ্‌শিশ দেবে। অবিশ্যি এ কাজটার জন্যে যদি কেউ কিছু সাহায্য করে তবে সে ও পাঁঠার ভাগ পাবে।"

পাঁঠার নাম শুনেই পেটুক কুমীরের জিভ দিয়ে জল পড়ুতে লাগ্‌ল। সে তক্ষুনি শেয়ালকে নিজের পিঠে চড়িয়ে নদী পার করে দিতে রাজি হ'য়ে গেল।

শেয়াল দিব্যি করে তার পিঠে চড়ে নদী পের'ল। পেরিয়ে বটফল কুড়োচ্চে আর খাচ্চে—কুড়োচ্চে আর খাচ্চে। যখন খুব পেটটা ভরে ঢেঁকি হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন গাছের ছায়ায় শুয়ে এক ঘুম দিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। কান্নার সুরে দুঃখের ভান করে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কুমীরকে বল্লে, "ভাই, আর তোমায় বল্‌ব কি! খাসা একটা পাথর পেয়েছিলুম! কিন্তু কি বল্‌ব—আমার অদৃষ্ট খারাপ! সেটাকে গাড়ীতে তো অতি কষ্টে তুললুম—তারপর ওমা! গাড়ীটা নদীর দিকে দুপা যেতে না যেতেই চাকার 'ধুরো' গেল ভেঙে। আর কি এত বেলায় পাথর গাড়ীতে ওঠাতে পারি, না গাড়ী মেরামত কর্‌তে পারি? আমার সমস্ত দিনের খাটুনি—সব মাটি হ'য়ে গেল!" ব'লে শেয়াল হুক্কাহুয়া ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। মোটাবুদ্ধি কুমীর গল্পটা দিব্যি বিশ্বাস করে শেয়ালকে পিঠে করে ওপারে পৌঁছে দিলে।

পরদিন শেয়াল আবার কুমীরের পিঠে চড়ে ওপারে গিয়ে বটফল খেতে গেল। যাবার সময় সে কুমীরকে বলে গেল, "ছাখ কুমীরদা, আজ গাড়ীটা মেরামত কর্‌তে হবে, তারপর সেই প্রকাণ্ড পাথরটা আবার তুল্‌তে হবে। দেরী হ'লে তুমি কিছু মনে কোরো না।"

তারপর পারে গিয়ে শেয়াল বেশ পাকাপাকা বটফল খেয়ে পেট বোঝাই করে সমস্ত দিনটা সেইখানেই আরামে ঘুমিয়ে কাটাল। শেষে যখন রাখালদের গরু নিয়ে মাঠ থেকে ফেরবার সময় হ'ল, তখন সেও নদীর ধারে ফির্‌ল।

এবারও কুমীরকে পাথর আনার খুব লম্বা চওড়া গল্প জুড়ে দিল। সে কেমন করে, সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গাড়ীটা মেরামত করে পাথরটা চড়াল, কি করে আবার গাড়ীটা পড়ে গিয়ে সবশুদ্ধ চুরমার হ'য়ে গেল, এমনি অনেক কথা বল্‌লে। কুমীর এবারও তার কথা বিশ্বাস করে তাকে পিঠে চড়িয়ে নদী পার করে দিলে।

দিনকতক এমনি করে বানিয়ে বানিয়ে গাড়ী আর পাথরের গল্প বলে কুমীরকে ভুলিয়ে শেয়াল আপনার কুলখাওয়ার কাজ চালাতে লাগ্‌ল। কিন্তু এম্নি ক'রে আর কত দিন চালান যায়? কুমীরকে হাতে হাতে একটা কিছু প্রমাণ না দিলে আর ভাল দেখায় না। তাই সে একদিন একটা ঠোঙ্গায় কতকগুলো সাদা সাদা চর্ব্বির মত দেখ্‌তে নুড়ি এনে নদীর ধারে কিছু দূরে এক জায়গায় রেখে কুমীরকে বল্লে, "দাদা ঐ দেখ, তোমার জন্যে কেমন পাঁঠার চর্ব্বি এনেছি।" কুমীর চর্ব্বি দেখে খুব খুসী। শেয়াল কাঠ কুটো দিয়ে আগুন করে পাথরগুলোকে ভাজ্‌তে লাগ্‌ল। পাথরগুলো যখন খুব গরম হ'য়ে উঠেছে তখন কুমীরকে খেতে ডাক্‌লে আর বল্লে, "দাদা, এবার মুখটি হাঁ কর, গরম গরম চর্ব্বি তোমার মুখে ঢেলে দি।"

লোভী কুমীর মুখ যতটা পার্‌লে হাঁ কর্‌লে আর শেয়াল সেই তপ্ত পাথরগুলো মুখের ভিতর ঢেলে দিলে। পাথরগুলো একেবারে কুমীরের পেটের মধ্যে গিয়ে পড়ুল। কুমীর যন্ত্রনায় অস্থির হ'য়ে তাড়াতাড়ি ঝুপ করে জলে গিয়ে পড়্‌ল। সে যাত্রায় কোন গতিকে তার প্রাণটা বেঁচে গেল। কিন্তু এবার এতদিনে সে শেয়ালের দুষ্টুমি বুঝতে পার্‌ল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল শেয়াল আর বড় কুমীরের দিকে ঘেঁসে না। একদিন শেয়ালের বেজায় তেস্টা পেয়েছে, কোথায় আর জল খেতে যাবে, তাই নদীতেই গেল জল খেতে। দৈবাৎ কুমীরও সেই সময় ওকে দেখতে পেলে। সে আস্তে আস্তে দূর থেকে শেয়ালকে দেখে নিশানা করে এক ডুব দিলে। কুমীরদের ধরণ ধারণ শেয়াল বেশ জানত। সে জানত এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাক্‌লে কুমীরে দূর থেকে লক্ষ্য করে ডুব দিয়ে ঠিক সেই জায়গায় এসে ধরে। তাই সে জলখাবার সময় এক জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে না থেকে সরে সরে যাচ্ছিল। কুমীরটা যে জায়গায় লক্ষ্য করে ডুব দিয়েছিল ঠিক্ সেই জায়গায় 'ভূস' করে ভেসে উঠল; কিন্তু শেয়ালকে সেখানে পেলে না —শেয়াল তার আগেই অন্য জায়গায় সরে গেছে। কুমীর সে জায়গায় একটা 'নাচাল দারু' গাছের শিকড় পেয়ে সেইটাকেই শেয়ালের ল্যাজ মনে করে কামড়ে ধর্‌লে। তারপর দেখ্‌লে ঠকে গেছে ; ঠকে তার রাগ আরো বেশী বেড়ে উঠল।

একদিন কুমীর দেখে নদীর কাছেই চাষীদের ধানের খামারে ('কোলাম') 'গুঁধলি' খড়ের গাদা রয়েছে। কুমীর শেয়ালকে ধরবার জন্য সেই গাদার ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। এই সময় শেয়ালও কোথা থেকে একটা ছাগলের গলায় বাঁধবার কাঠের ঘণ্টা (টুটুকি)

নিজের গলায় বেঁধে সেই খড়ের গাদার উপরে চড়ে নাচতে লাগল। কুমীরটা খড়ের গাদার নীচে থেকে ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে তাকে ছাগল মনে করে বলতে লাগল,



"ওরে ছাগল! আজ তুই প্রাণ ভরে নেচে নে, তোকে আমি চাচ্ছি নারে—আজ সেই বজ্জাৎ শেয়ালটাকে ধরতে বেরিয়েছি।" ব্যাপারটা বুঝতে শেয়ালের একটুকু দেরী হ'লনা। সে আর কোন কথাটি না বলে তক্ষুনি সেই খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পিট্‌টান্ দিলে।

কুমীরের শেষে পিঠ জ্বলে ফোসকা পড়ে একাকার—সে বেচারার প্রাণ যায় যায়! জ্বলন্ত খড়সুদ্ধ পিঠে নিয়ে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীতে পড়ে তার প্রাণটা বাঁচল বটে কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনার পর থেকেই সেই যে তার পিঠে এবড়ো খেবড়ো পোড়া দাগের মত হ'য়ে গেল, সে দাগ আর কোন কালে ঘুচবেনা।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

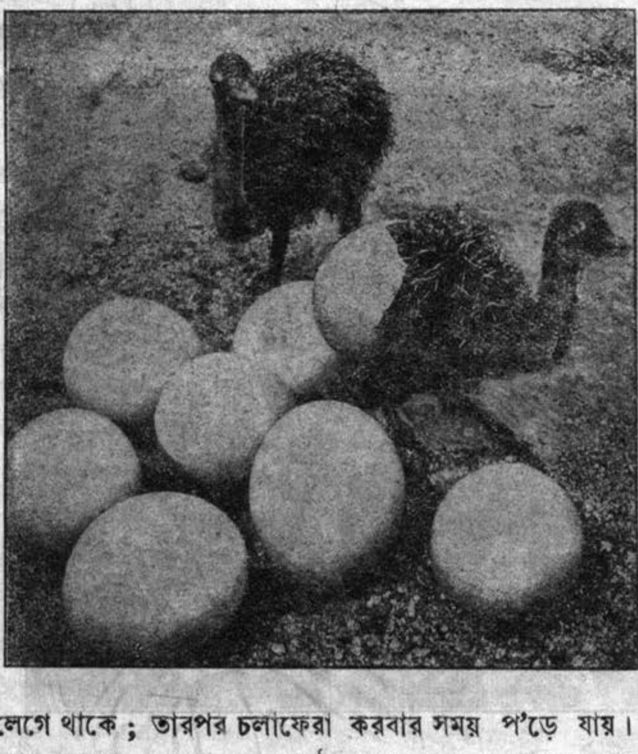
উটপাখী

যে পাখী মাসে আধ-হাত ক'রে লম্বায় বাড়ে, আর জন্মের তিন দিন বাদেই নুড়ি-পাথর আর কাঁচের টুক্‌রো খেতে আরম্ভ করে, সে পাখী যে সামান্য পাখী নয়, তা' তো বুঝ্‌তেই পার। তার উপর পাখীর গায়ের জোরও নিতান্ত কম নয়—ঐ রোগা 'ঠ্যাঙের এক লাথিতে মানুষকে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে পারে। একটা বড় উটপাখী ওজনে একজন বড় মানুষের প্রায় দ্বিগুণ, আর উঁচুতেও প্রায় পাঁচ হাত হবে। এদের পায় খুব ধারাল নখ আছে; তা' দিয়ে মাটি খুঁড়ে, ইঁট, পাথর, আর অন্যান্য খাবার জিনিষ খুঁড়ে বার করে, আর বাসা বানায়। মারামারির সময়ও নখের ব্যবহার খুব চলে, কারণ ঐ ধারাল নখের এক একটা আঁচড় বড় কম সাংঘাতিক হয় না!

উটপাখীর পালক বড় দামী জিনিষ; তাই এদের বড় আদর। অনেক জায়গায় পালকের ব্যবসার জন্য উটপাখী পালা হয়। তাদের থাক্‌বার জন্য সুন্দর জায়গা ক'রে দিয়ে, খাবার দাবার বন্দোবস্ত ক'রে, অসুখে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে, ছোট ছানাদের যত্ন ক'রে, ডিম ফুটাবার বন্দোবস্ত ক'রে,—নানা রকমে উটপাখীর বংশ বাড়িয়ে তোলা হয়, আর তাদের পালক যাতে উৎকৃষ্ট হয় তার উপায় করা হয়। উটপাখীর আদি জন্মস্থান আফ্রিকায়, কিন্তু তার আসল ব্যবসা হয়ে থাকে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে। এডুইন কষ্টন নামে, একজন সাহেব, প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে কয়েকটা উটপাখী আফ্রিকা থেকে কিনে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন; তাদেরই বংশ বেড়ে এখন শত শত উটপাখী আমেরিকায় হয়েছে। প্রথম যে সব পাখী এসেছিল তাদের অধিকাংশই আজও বেঁচে আছে, আর তাদের শরীরের অবস্থা দেখে মনে হয় যে তারা ৫০ বছর বাঁচ্‌বে।

উটপাখীর ডানা নিতান্ত ছোট, তাই তারা উড়্‌তে পারে না। দৌড়াবার সময় ডানা-জোড়া ছড়িয়ে চলে। এদের ডিমও একটা দেখ্‌বার জিনিষ;—আকারে একটা ফুটবলের

চেয়ে কম হবে না! একটা তাজা ডিমের ওজন প্রায় ছ'সের হবে। খেতেও এ ডিম নাকি বেশ ভাল, আর একটা ডিম ভাজা কর্‌লে ত্রিশ জন লোকের খাওয়াও হয়ে যায়। কিন্তু দামটা বড় বেশী—একটা ডিম ৪০।৫০ টাকার কম হবে না! ডিম পাড়্‌বার সময় হ'লে পুরুষ উটপাখী নখের সাহায্যে একটা মস্ত গর্ত্ত খোঁড়ে; সেই গর্ত্তের মধ্যে স্ত্রী-পাখীটা ডিম পাড়ে। একদিন অন্তর একটা ক'রে ডিম পেড়ে, প্রায় ১০।১৫টা হ'লে, তবে তার ডিম পাড়া শেষ হয়। তখন স্ত্রী-পাখীটা সেই ডিমের রাশির উপর ২।৩ ইঞ্চি মাটি ফেলে দেয়। তারপর ডিমে 'তা' দেওয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে ডিমগুলো বড় নরম থাকে, তাই খুব সাবধানে তা দিতে হয়। উটপাখী কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই হুঁশিয়ার;—গর্ত্তের ছ'পাশে ছুই পা দিয়ে, শরীরটাকে ডিম থেকে অল্প উঁচুতে রেখে, শরীরের পালক চাপা দিয়ে ডিমে তা' দেয়। পুরুষ আর স্ত্রী পাখীতে সময় ভাগা-ভাগি ক'রে নিয়ে এ কাজ করে।

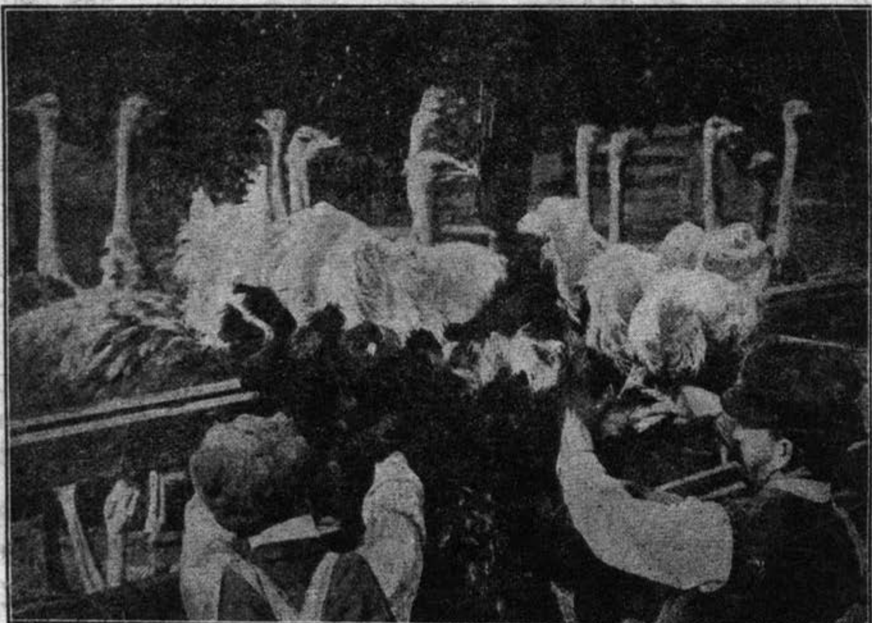


ডিম ফুট্‌বার কয়েক দিন আগেই ডিমের ভিতরে ছানা নড়্‌তে আরম্ভ করে, আর ঠোঁট দিয়ে খোলা ভাঙ্‌তে চেষ্টা করে। একটা ছোট ছেঁদা কর্‌তে পার্‌লেই তারা খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে। ছ'এক দিন পরেও খোলার অংশ ছানার শরীরে কখনো কখনো লেগে থাকে; তারপর চলাফেরা করবার সময় প'ড়ে যায়। জন্মাবার ছয় মাসের মধ্যে তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে ওঠে, আর প্রায় মানুষের সমান উঁচু হয়। তারপর খুব

আস্তে আস্তে বাড়ে। ছেলেবেলায় এদের হাড়ের গুঁড়ো ভুষি, ঘাস আর কফিপাতা খেতে দেওয়া হয়।

জন্মাবার এক বৎসর পরে এদের পালক কাট্‌বার উপযুক্ত হয়। পাখীর বয়স অনুসারে আর স্ত্রীপুরুষভেদে পালকের রংও বিভিন্ন হয়। বড় পুরুষ পাখীর পালকই দামী। সে পালক কালো আর সাদা হয়। ডানার পালকই সব চেয়ে বড় আর সুন্দর হয়,—তার দামও খুব বেশী।

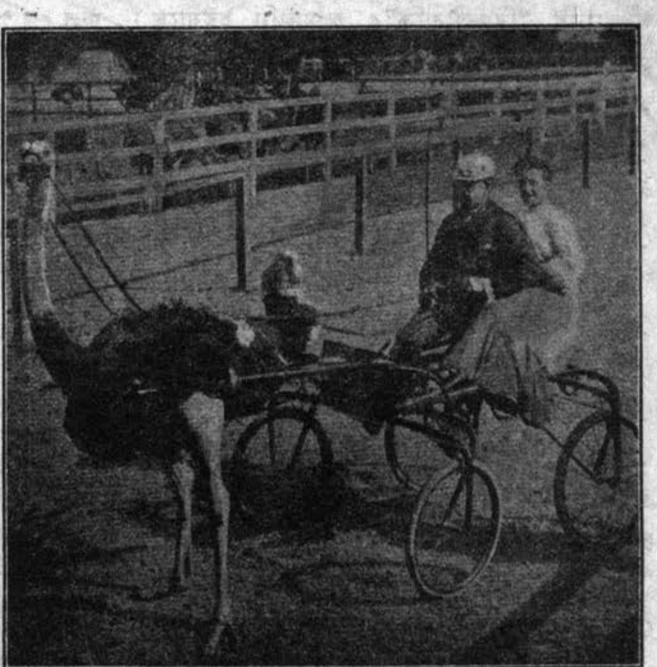
নয় মাস অন্তর পালক পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, আর কাটার উপযুক্ত হ'লেই কাটা হয়। খুব ওস্তাদ লোক ছাড়া এ কাজ কর্‌তে পারে না। কাটবার সময় যদি কোন রকমে পালকের গোড়াশুদ্ধ উঠে আসে, তবে আর সে জায়গায় পালকই গজাবে না। ছোট ছোট পালকগুলি টান্‌লেই উঠে আসে, কিন্তু ডানার পালক মোটা কাঁচি দিয়ে, যত্ন করে, গোড়া বাদ দিয়ে কাট্‌তে হয়। তা হ'লেই আবার নয় মাস পর বেশ সুন্দর পালক



হয়। প্রত্যেকটা পাখী বৎসরে ৯০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত দামের পালক দেয়।

আর কোন কোন পাখী ৬০।৭০ বৎসরও বাঁচে। কাজেই এক একটা পাখী প্রায় কুড়ি হাজার টাকার পালক পর্য্যন্ত দিতে পারে! পালক কাট্‌বার উপায়টিও বড় মজার। একটা সরু লম্বা থলি উটপাখীর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়, আর সে কিছু দেখ্‌তে পায় না। তখন সে নিতান্ত শান্ত হয়ে যায়। এই অবসরে একজন লোক তা'কে ধরে, আরেকজন পালক কাটে। সে সময়ে একটু সাবধান থাক্‌তে হয়, কারণ চোখ বাঁধা থাক্‌লেও এদের লাথিমারা অভ্যাসটা যায় না।

পালক কাটা হ'লে বিভিন্ন রঙের পালক বেছে আলাধা ক'রে, ভিন্ন ভিন্ন থলিতে পোরা হয়। তারপর বিক্রীর উপযুক্ত কর্‌বার জন্য কারখানায় চালান করা হয়। সেখানে প্রথমে সাবান-জল দিয়ে পালক গুলিকে বেশ পরিষ্কার ক'রে ধোয়া হয়। তারপর রং করা হয়। রং করে ময়দা গোলা জলে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয়। তারপর ভাল ক'রে ময়দা ঝেড়ে পরিষ্কার পালক বেছে, দরকার মত দুই তিনটা পালক এক সঙ্গে সেলাই ক'রে দেওয়া হয়। তারপর ওস্তাদ কারিকরে পালকগুলি চিরুনি দিয়ে আচ্‌ড়িয়ে, কৌশল ক'রে কুঁক্‌ড়িয়ে, দেখ্‌তে সুন্দর ক'রে দেয়। সকলের শেষে পালক গুলিকে একত্র ক'রে তোড়া বেঁধে দেওয়া হ'লেই পালক বিক্রীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।



উটপাখীকে শেখালে মানুষকে পিঠে নিয়ে যেতে পারে; গাড়ীও টান্‌তে পারে। ছবিতে দেখ একটা উটপাখীকে কেমন গাড়ীতে জোতা হয়েছে। উটপাখী মানুষকে বড়

একটা ভয় করে না ; বড় বড় কুকুরকেও ভয় করে না, কিন্তু ছোট্ট কুকুর দেখ্‌লেই পালায়। এর কারণ হচ্ছে যে এক হাতের চেয়ে নীচু কোন জিনিষে এরা লাথি মার্‌তে পারে না।

উটপাখীর সম্বন্ধে আর একটা মজার কথা শোনা যায়। খুব ভয় পেলে সে নাকি মাটিতে গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে মাথা গুঁজে রাখে। এম্নি ক'রে নিজের চোখ বন্ধ ক'রে সে ভাবে, এখন আমায় কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

শ্রীসুবিনয় রায়।

আশ্চর্য্য আলো

আজকাল সহরে সহরে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। জাহাজে রেলগাড়ীতে সবখানেই "বিজলীবাতি"র আমদানি হইয়াছে। জল জোগাইবার জন্য রাস্তায় যেমন নল বসান হয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাঠাইবার জন্য সেই রকম লোহা বা তামার তার খাটাইতে হয়। জলের কারখানায় বড় বড় দমকলের চাপে জল ঠেলিয়া উঁচুতে তোলে, সেই তোলাজল সহরের নল বাহিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও কতকটা সেই রকম—বিদ্যুতের কারখানায় বড় বড় কলে বিদ্যুৎ জমাইয়া রাখে, আর সেই বিদ্যুৎ আপনার চাপে তারের পথ ধরিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। নলের মুখ বন্ধ থাকিলে যেমন জল আর চলে না, তেমনি তার কাটিয়া দিলে বা কোনখানে তারের জোড় খুলিয়া গেলে, বিদ্যুতেরও চলার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জলের চাপ যদি খুব বেশী হয়, তবে সে অনেক সময়ে সকল বাধা ঠেলিয়া আপনার পথ করিয়া লয়—জলের তোড়ে রাস্তাঘাট ভাসাইয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করে। সেইরকম, বিদ্যুতের প্রবল স্রোত যদি সহজ পথ না পায়, তবে সেও আকাশ চীরিয়া জোর করিয়া আপনার পথ কাটিতে জানে। ঝড়ের সময়ে আকাশ ফুঁড়িয়া মেঘে মেঘে বিদ্যুতের হানাহানি চলে, সেই পথহারা বিদ্যুৎ পৃথিবীর ঘাড়ে পড়িলে যে ভয়ানক কাণ্ড হয় তাহারই নাম "বাজ পড়া"। নর্দ্দামা কাটিয়া যেমন জল সরায়, বুদ্ধিমান মানুষে তেমনি বাড়ীর পাশে লোহার শিক খাড়া করিয়া বিদ্যুতের জন্য সহজ পথ করিয়া রাখে।

পণ্ডিতেরা বোতলের ভিতরে এইরকম বিদ্যুৎ ছুটাইয়া অনেক আশ্চর্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বোতলটাকে খালি করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে অতি অদ্ভুত রঙীন আলোর খেলা দেখা যায়। কেবল রঙের খেলা নয়, পণ্ডিতেরা তাহার মধ্যে

এমন সব আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পান, যে তাহার আলোচনার জন্যই কত লোকে সারা-জীবন ভরিয়া খাটিতেছেন।

বোতলকে "খালি" করার কথা বলিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ কি? সাধারণতঃ, আমরা যাহাকে "খালি বোতল" বলি তাহা মোটেও খালি নয়, কারণ, তাহার ভিতরটা আগাগোড়াই বাতাসে পোরা। সেই বাতাসকে কলে চুষিয়া বাহির করিলে যাহা থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে বলেন Vacuum, অর্থাৎ ফাঁকা আকাশ। এই রকম একটা বোতলের দুই দিকে তার জুড়িয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলীক্ চালাইলে দেখা যায় যে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের এক নূতন চেহারা বাহির হয়। বিদ্যুতের তেজ স্নিগ্ধ জ্যোতির মত বোতলের একমাথা হইতে আর এক মাথায় ছড়াইয়া পড়ে, আর বোতলের ভিতরটা আশ্চর্য্য সুন্দর আলোয় ভরিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে।

দেখিবার জিনিষ এবং শিখিবার জিনিষ ইহার মধ্যে এত আছে যে সেসব কথা আজ আর বলিবার সময় নাই, কেবল একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা এখানে বলিব। তাহার কথা তোমরা অনেকে হয়ত শুনিয়াছ—তাহার নাম "রঞ্জেনের আলো" বা X-Rays (অজানা আলো)। ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের আঘাতে এই আশ্চর্য্য আলোর জন্ম হয়। কাঁচ ফুঁড়িয়া সেই আলো বাহিরে চলিয়া আসে, কিন্তু তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

কোন কোন জিনিষ আছে, তাহারা নানারকম তেজ শুষিয়া সেই তেজে আবার আপনি আলো দিতে থাকে। একরকম পাথর দেখা যায়, তাহারা দিনের আলোক জমাইয়া রাখে, আর অন্ধকারে জ্বল্জল্ করে। রাত্রে সময় দেখিবার জন্য আজকাল একরকম ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কাঁটা ও সময়ের অঙ্কগুলা আপনার আলোয় টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ মশলামাখান একপ্রকার রঙের ব্যবহার হয়; যেখানে শত্রুর ভয়ে ভালরকম আলো জ্বালিবার উপায় নাই, সেখানে এই জ্বলন্ত রঙের চিহ্ন আঁকিয়া নানারকম সঙ্কেত জানান হয়, অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলাফেরার সুবিধা করা হয়।

ফাঁকা বোতলের ঐ অদৃশ্য তেজ ধরিবার জন্যও নানারকম মশলা পাওয়া যায়। একটা পর্দ্দার উপর সেই মশলা মাখাইয়া তাহাকে ঐ বিদ্যুৎপোরা বোতলের কাছে আনিলেই পর্দ্দাটা আলো হইয়া উঠে। বোতলটাকে কাল কাগজে মুড়িয়া ফেল,

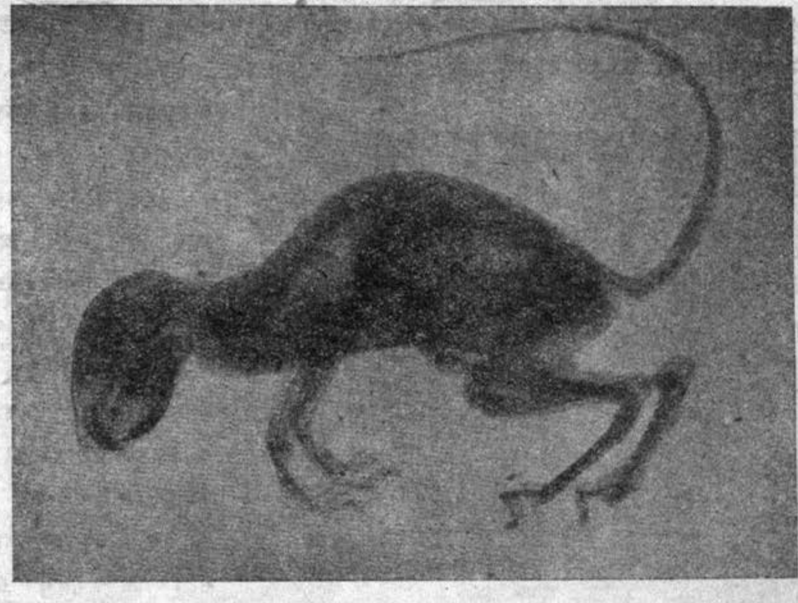
তবুও পর্দ্দা জ্বলিতে থাকিবে। বোতলের উপর কাঠের বাক্স চাপা দেও—কাঠ ভেদ করিয়া সে অদৃশ্য আলো মশলার পর্দ্দাকে জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু বিদ্যুৎ চালান একটিবার বন্ধ করিয়া বোতলের তেজ নিভাইয়া দাও, সেই সঙ্গে পর্দ্দার আলোও নিভিয়া যাইবে। পর্দ্দার সামনে যদি একখানা লোহার টুক্‌রা ধর, তাহা হইলেও যেখানে লোহার আড়াল পড়িয়াছে, সেইখানে পর্দ্দা জ্বলিবে না—কারণ বোতলের আলো লোহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটা পয়সা আনিয়া পর্দ্দার সাম্‌নে ধর, তাহারও পরিষ্কার গোল ছায়া পড়িবে। এই রকম পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পর্দ্দার উপর হাড়ের ছায়া পড়ে, কিন্তু মাংস বা চামড়ার কোন ছায়া পড়ে না।



এইজন্য পর্দ্দার সামনে তোমার জামাশুদ্ধ হাতখানা ধরিলে তোমার জামাও দেখিবে না, আর নধরপুষ্ট মাংস-ভরাট আঙ্গুলও দেখিবে না—দেখিবে কতগুলো হাড়ের ছায়া! ছবিতে দেখ, এক মেমসাহেবের হাতের চেহারা। মেমসাহেব আংটি আর বালা পরিয়াছিলেন, তাহার চমৎকার ছায়া পড়িয়াছে। হাতে দস্তানা ছিল, তাহার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু দস্তানার গায়ে যে লোহার 'হুক্' আছে সেটি বাদ পড়ে নাই। সেটি যেন শূন্যেই ঝুলিতেছে।

তারপর পরের পৃষ্ঠায় ঐ কাঠবিড়ালের ছবিটি দেখ। ছবিতে হাড়গোড় সবই উঠিয়াছে—অথচ অমন জমকালো ল্যাজটির চিহ্নমাত্র নাই। জ্যান্ত জীবের এরকম কঙ্কালছায়া সর্ব্বপ্রথম দেখেন রঞ্জেন্ বা রণ্ট্‌গেন্ সাহেব (Rontgen) তিনিই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর আগে, ঐরূপ জ্বলন্ত পর্দ্দার সাহায্যে এই আলো আবিষ্কার করেন। প্রথম যখন তিনি পর্দ্দার সাম্‌নে হাতের আড়াল দিয়া দেখেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কতগুলা হাড়ের ছায়া দেখিবেন। তাই হঠাৎ আপনার "হাড্ডিসার" ছায়া দেখিয়া তিনি ভারি আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছিলেন।

তামাসা হিসাবেও এটা একটা দেখিবার মত ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কাঠের বাক্সের মধ্যে চামড়ার ব্যাগ্, কাগজ কলম, হাড়ের বোতাম, ছুঁচসুতা, চাবি ভরিয়া



একবার পর্দ্দার আলোর সামনে ধর—কাঠের বাক্স ছায়াতে কাঁচের মত স্বচ্ছ দেখাইবে, আর তাহার ভিতকার ছুঁচ চাবি আর কলমের মুখটা স্পট হইয়া ধরা পড়িবে। বোতামের ফিকে ছায়া দেখা যাইবে, কিন্তু কাগজ সুতা বা চামড়ার ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে—অথচ ব্যাগের ভিতর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহারও পরিষ্কার ছায়া পড়িবে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা কেবল তামাসা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা ইহার নিয়ম কানুন বাহির করিয়া ব্যাপারটাকে অনেক রকম কাজে লাগাইয়াছেন। ডাক্তারেরা এই আলোকের সাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন, নানারকম কৌশল করিয়া জ্যান্ত মানুষের বুকের ধুকধুকানি আর পাকস্থলীর হজমক্রিয়া দেখিতেছেন, শরীরের ভিতরে কোথায় হাড় ভাঙ্গিল, কোথায় গুলি লাগিল, কোথায় উৎকট রোগের সঞ্চার হইল, সব চোখে দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজকালকার যুদ্ধে কত হাজার হাজার আহত সৈন্যকে এই আলোকে পরীক্ষা করিয়া আঘাতের রকমটা স্পষ্ট বুঝিয়া তাঁহার

চিকিৎসা করা হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে নানা জিনিষের ভেজাল ধরিবার জন্য ও নানারকম খুঁৎ পরীক্ষার জন্যও এই আলোর ব্যবহার হয়। প্রথম যাঁহারা এই সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এ আলো কি সাংঘাতিক জিনিষ! অদৃশ্য আলোয় ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে অনেকের চোখ অন্ধ হইয়াছে, হাতে সাংঘাতিক ঘা হইয়া হাতটি নষ্ট হইয়াছে, এমন কি কেহ কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এমন সর্ব্বনেশে আলো!



তোমাদের কাহারও মনে কি এমন অহঙ্কার আছে যে তোমার চেহারাটি খুব সুন্দর? যদি থাকে, তবে একটিবার এই আলোতে ঐ মুখখানির ফটো তুলাইয়া দেখ। তাহা হইলে বোধ হয় আর রূপের দেমাক থাকিবে না। এই দেখ একজন সাহেব তাঁহার সেই রকম চেহারা উঠাইয়াছেন। আশা করি এই ছবি দেখিয়া তোমরা তাঁহার আসল চেহারার দোষ গুণ বিচার করিবে না।

আবোলতাবোল

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখ্‌নু বিনা চশমাতে
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা ক'চ্ছে খেলা জোছ্‌নাতে।
ক'চ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে
আহ্লাদেতে ধুপ্‌ধুপিয়ে ক'চ্ছে কেমন হল্লা সে!

শুন্‌তে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকিহাসি কট্‌কটে
দেখ্‌ছে নেড়ে ঝুণ্টী ধরে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠ্‌ছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠস্বরে ডাক ছেড়ে
খ্যাঁশ্‌খ্যাঁশানি শব্দে যেমন করাৎ দিয়ে কাঠ চেরে।
যেমন খুসী মার্‌ছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কেমন কাণমলা
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে তোলে চ্যাংদোলা।
বল্‌ছে আবার: "ওরে আমার নোংরামুখো সুঁট্‌কো রে
দেখ্‌না ফিরে প্যাখ্‌না ধ'রে হুতোম-হাসি মুখ ক'রে।



ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁৎকা রে
অন্ধবনের গন্ধগোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে।
ওরে আমার বাদ্‌লা রোদে জ্যৈষ্ঠ: মাসের বিষ্টিরে
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।

ওরে আমার রান্নাহাঁড়ির কান্নাহাসির ফোড়ন্দার
ওরে আমার জোছ্না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোব্‌রাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌রে
ছিঁচ্‌কাঁদুনে ফোক্‌লা মাণিক ফের যদি তুই কাঁদিস্‌রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপ্‌টি ফট্‌ ক'রে
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ক'রে।

নূতন ধাঁধা

(শব্দ চৌকি)

সমান অক্ষরের কয়েকটা কথাকে যদি এমন ভাবে সাজান যায় যে ডাইনে-বাঁয়ে পড়িলে যা হয় উপর নীচ পড়িলেও তাই—ইংরাজিতে তাহাকে বলে Word Square বা শব্দ চতুষ্কোণ। যেমন

C A T	P A W
A R E	A S H
T E A	W H O

ডাইনে বাঁয়ে এবং উপর নীচ পড়িয়া দেখ ঠিক একই কথা। বাংলাতেও এই রকম শব্দ চৌকী বানান যায়, যেমন

কো দা ল	আ রা ম
দা লা ল	রা ক্ষ স
ল ল না	ম স লা

তিন অক্ষরের এই রকম চৌকী বানান কিছু শক্ত নয়। চেষ্টা করিলে সে রকম অনেক কথা পাওয়া যায় কিন্তু চার অক্ষরের কথা বানান আরও অনেক শক্ত। ইংরাজির চাইতেও বাংলায় বেশী শক্ত। একটা ইংরাজি আর দুটা বাংলা নমুনা দিলাম—

P A S T	অ প মা ন	দ শা ন ন
A S I A	প থ ক ষ্ট	শা স্তি ম য়
S I L K	মা ক ড় শা	ন ম স্কা র
T A K E	ন ষ্ট শা স্তি	ন য় র ত্ন

আরও কতগুলা চৌকী বানাইয়াছি, তাহার সঙ্কেত বলিতেছি—তোমরা সেগুলা পূরণ কর দেখি ?

তিন অক্ষরের কথা ১। প্রথম কথার মানে হংস সবে বুঝি
দ্বিতীয়টি পাবে দেখ রঘুবংশে খুঁজি
তৃতীয় ছাড়িলে হয় বিস্বাদ ব্যঞ্জন—
এখন বুঝিয়া বাঁধ চৌকির বন্ধন।

২। প্রথমে আদর করি চোখে চোখে রাখি
দ্বিতীয়ের কিবা গুণ শুধু দেয় ফাঁকি
তৃতীয় ঢলিয়া পড়ে না জানি কি ঝোঁকে—
এখন মিলাও চৌকি বুদ্ধিমান লোকে।

৩। প্রথম তাহারে কহি যাহা কিছু রচি
দ্বিতীয় শীতল গন্ধে দেহ করে শুচি
তৃতীয় সে ধর্ম্মবীর নমি তাঁর পায়ে—
চৌকির সহজ বন্ধ দেখাও পুরায়ে।

৪। প্রথম মহার্ঘ-ধাতু বর্ণ সমুজ্জ্বল
দ্বিতীয় কঠিন নহে, অতি সুকোমল।
তৃতীয় সুমিষ্ট ফল রসে ভরপূর—
বাঁধিয়া চৌকির বাঁধ ধন্ধ কর দূর ॥

চারি অক্ষরের চৌকি ১। প্রথম একাগ্র বড় দ্বিধা নাই মনে
দ্বিতীয়ের কোলাহল শুনি কলস্বনে
তৃতীয় উজ্জ্বলবর্ণ মহারত্ন মণি
নূতন হতেও নব চতুর্থেরে গণি।

২। প্রথম সে সমীপেতে সোজা চলি যায়
দ্বিতীয় সে রাজদেহে শিরায় শিরায়
তৃতীয় সে বিক্রমের নবরত্নে রাজে
চতুর্থের চিহ্ন দেখি রক্তলেখা মাঝে।

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

পাঁচড়া।

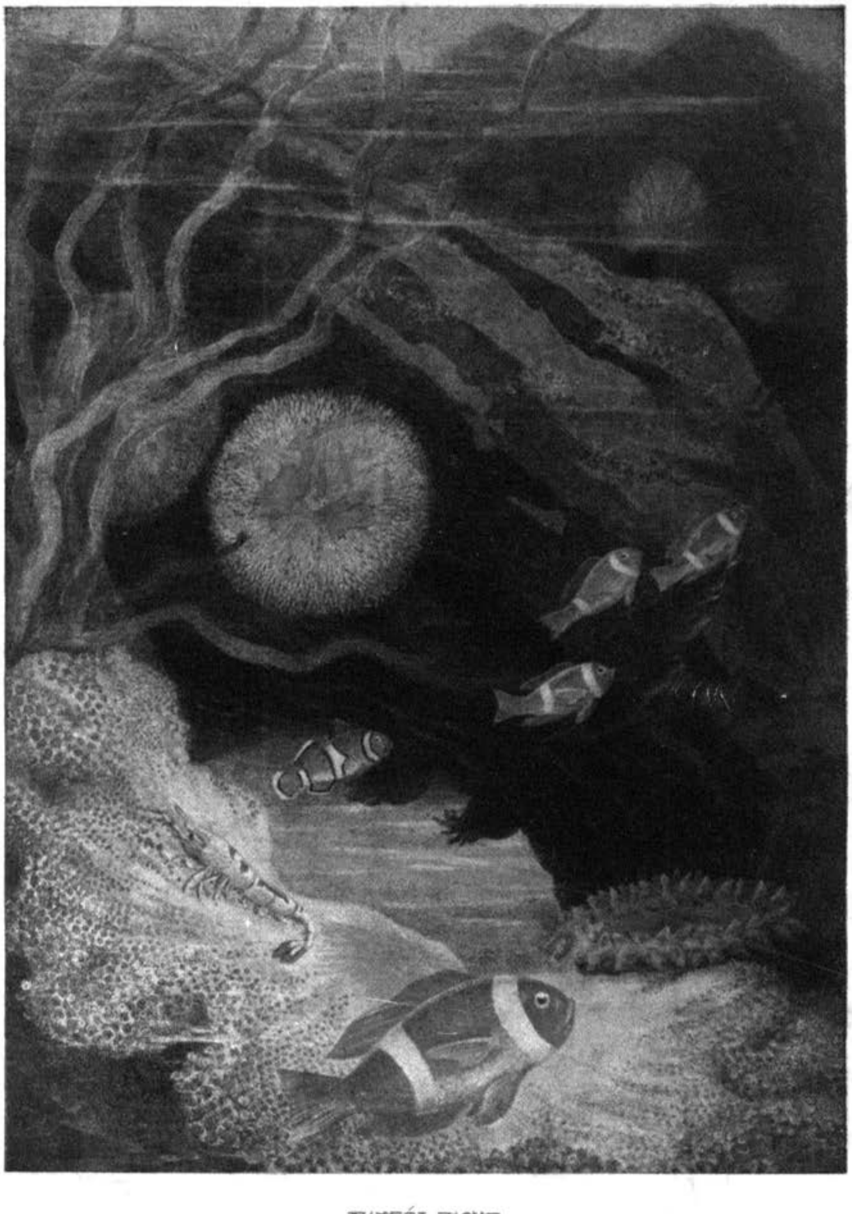
বাজেগল্প

দুই বন্ধু ছিল। একজন অন্ধ আর একজন বদ্ধ কালা। দুইজনে বেজায় ভাব। কালা বিজ্ঞাপনে পড়িল, আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন যাত্রা হইবে ; সেখানে সঙেরা নাচগান করিবে। কালা বলিল "অন্ধ ভাই, চল, যাত্রায় গিয়া নাচ দেখি।" অন্ধ হাত নাড়িয়া গলা খেলাইয়া কালাকে বুঝাইয়া দিল "কালা ভাই, চল, যাত্রায় নাচ গান শুনিয়া আসি"।

দুই জনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল। রাত দুপুর পর্য্যন্ত নাচ গান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, "বন্ধু, গান শুনিলে কেমন ?" কালা বলিল, "আজকে ত নাচ দেখিলাম— গানটা বোধ হয় কাল হইবে"। অন্ধ ঘনঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, "মূর্খ তুমি! আজ হইল গান—নৃত্যটাই বোধ হয় কাল হইবে"।

কালা চটিয়া গেল। সে বলিল, "চোখে দেখ না, তুমি নাচের মর্ম্ম জানিবে কি ?" অন্ধ তাহার কাণে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিল "কাণে শোন না, গানের তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কি ?" কালা চীৎকার করিয়া বলিল, "আজকে নাচ, কালকে গান," অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল "আজকে গান, কালকে নাচ"।

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি। কালা বলে "অন্ধটা এমন জুয়াচোর—সে দিনকে রাত করিতে পারে"। অন্ধ বলে "কালাটা যদি নিজের কথা শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত, সে কতবড় মিথ্যাবাদী"।



আশ্চর্য্য বাগান

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আজব খেলা

সোণার মেঘে আল্‌তা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্য্যি মামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভ'রে ভ'রে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন ক'রে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরায়না কি সোণার খেলা? রঙের নাহি পার?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার?

সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে,
উঠ্‌ছে জেগে—সেই কথা কি সূর্য্যি মামা জানে?

———

তারকাসুর

[তারকাসুরের জন্ম ও ব্রহ্মার কাছে বর লাভের কথা গতবারে বলা হইয়াছে। দানব সেনাপতিরা স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছে। ঘোর যুদ্ধের মধ্যে চন্দ্রদেব সোমাস্ত্র মারিয়া দানবদিগকে দারুণ শীতে কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। মহিষাসুর প্রভৃতি যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবে কি—কাঁপিয়াই অস্থির !]

তখন কালনেমি মায়াবলে যুদ্ধক্ষেত্রে অযুত সূর্য্যের সৃষ্টি করিল। এতগুলি সূর্য্যের তেজে তখন কি আর শীত আসিতে পারে? দানব সৈন্যগণ সুস্থ হইয়া আবার মার মার শব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া সূর্য্যদেব সারথিকে বলিলেন—"ওহে অরুণ! শীঘ্র আমার রথ কালনেমির নিকট লইয়া যাও।" কালনেমির নিকট গিয়াই সূর্য্যদেব ভীষণ সঞ্চারাস্ত্র ছাড়িলেন। আর দেখিতে দেখিতে দেবতারা দানবরূপ এবং দানবেরা দেবতার রূপ ধরিল। ক্রুদ্ধ কালনেমি এই মায়া বুঝিতে না পারিয়া চক্ষের নিমেষে দেবতা ভাবিয়া দশ লক্ষ দানব সৈন্যই মারিয়া ফেলিল! তখন নেতি নামে এক দৈত্য কালনেমিকে বলিল—"ওহে কালনেমি, তুমি একি করিলে? সূর্য্যের অস্ত্রে মোহিত হইয়া আমাদেরই যে দশলক্ষ সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছ? শীঘ্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়, নতুবা আর উপায় নাই!" নেতি দানবের কথায় চৈতন্য পাইয়া কালনেমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িবামাত্র সূর্য্যের সঞ্চারাস্ত্র শান্ত হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া সূর্য্য রাগিয়া বিষম ইন্দ্রজালদ্বারা নিজের শরীরটিকে কোটি ভাগ করিয়া ফেলিলেন। এক সূর্য্যের তেজেই রক্ষা নাই, তাহার উপর আবার কোটি সূর্য্যের তেজ! দানব সৈন্যগণ সে তেজ সহ্য করিতে পারিবে কেন? দেখিতে দেখিতে তাহারা গরমে চারিদিকে জলের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহাদের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল, শরীরে ঘামের স্রোত বহিল! তৃষ্ণায় তালু ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু জলের নিকট যাইবার শক্তি নাই! যে যেখানে ছিল, অচেতন হইয়া সেখানেই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। তখন দুরন্ত কালনেমি আবার অদ্ভুত মায়াবলে সূর্য্যের মায়াকে নষ্ট করিয়া দানব সৈন্যের উপরে শীতল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর সে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে দেবতারা ভয়ে অস্ত্র ও রথ ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুষ্ট কালনেমিও পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া সেখানে গেল।

এদিকে বিষ্ণু দেবগণের এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং তাহার পিঠে চড়িয়া তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া অসুর-

গণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা বলিতে লাগিল—"ওহে, এই বিষ্ণুই দেবগণের একমাত্র সম্বল; উহাকে জয় করিতে পারিলেই দেবতারা জব্দ হইবে।" এই বলিয়া গ্রসন, কালনেমি, নিমি, মথন, জম্ভক, ও শুম্ভ প্রভৃতি মহা বলবান্ দৈত্যগণ একসঙ্গে বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল। নিমিদৈত্য ভল্লের আঘাতে বিষ্ণুর ধনু কাটিয়া ফেলিল। জম্ভাসুর বাণের পর বাণ মারিয়া গরুড়কে অস্থির করিয়া দিল। শুম্ভাসুর এক বাণ মারিয়া বিষ্ণুর হাতে দারুণ আঘাত করিল। বিষ্ণুর বড় বড় অস্ত্র তাহারা কাটিয়া শেষ করিতে লাগিল। বিষ্ণু তখন ধনু লইয়া রৌদ্রবাণ ছাড়িলেন,—তাহাতে নিমেষ মধ্যে চারিদিক বাণে ছাইয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া গ্রসনাসুর ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া রৌদ্রাস্ত্রকে শান্ত করিল।

নারায়ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ মহাভীষণ সুদর্শন চক্র মারিয়া দৈত্যসেনাপতি গ্রসনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর বিষ্ণু গরুড়কে বলিলেন—"গরুড়! যদি ক্লান্ত হইয়া থাক তবে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া লও। আর যদি ক্লান্ত না হইয়া থাক তবে শীঘ্র আমাকে মথনাসুরের নিকট লইয়া চল।" একথায় গরুড় তখনই মথনাসুরের নিকট গেল। বিষ্ণু গদা লইয়া মথনাসুরকে এমনই আঘাত করিলেন যে দুষ্ট দানব রথসহ চূরমার হইয়া গেল!

মথনাসুরের মৃত্যুতে রাগে পাগলের মত হইয়া মহিষাসুর প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া বিষ্ণুকে গিলিতে আসিল। তিনি দিব্যাস্ত্র মারিয়া দানবের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তারপর আর একটি ভীষণ বাণের আঘাতে মহিষাসুর মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু মরিল না। তখন বিষ্ণু তাহাকে বলিলেন—"হে মহিষাসুর! ব্রহ্মার বরে কুমারীর হাতে তোমার মৃত্যু হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম—এখন শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন কর।"

মহিষাসুর পলায়ন করিলে পর বিষ্ণু ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া শুম্ভ দৈত্যকেও জয় করিলেন এবং বলিলেন—"তুমি অল্প দিন মধ্যেই স্ত্রীলোকের হাতে মরিবে, সুতরাং এখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই—প্রস্থান কর।"

তখন নিমি প্রচণ্ড এক গদা লইয়া গরুড়ের মাথায় এবং জম্ভ ভীষণ এক পরিঘ লইয়া বিষ্ণুর মাথায় এমনই আঘাত করিল যে বিষ্ণু ও গরুড় রণস্থলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে, উভয়ের চেতনা হইলে, গরুড় বিষ্ণুকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

বিষ্ণুর পরাজয় দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"প্রভু! ইচ্ছা করিলে আপনি চক্ষের নিমেষে সৃষ্টি নষ্ট করিতে পারেন, তবে কেন এই সামান্য দৈত্যগুলার সহিত খেলা করিতেছেন? ইহাদিগকে বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তখন বিষ্ণু বলিলেন—"দেবরাজ! এই সকল দৈত্যের মৃত্যুর ভিন্ন ভিন্ন এক একটা উপায় আছে, তাহা ছাড়া ইহাদিগের মৃত্যু হইবে না। তারক দৈত্য সাত দিনের বালকের হস্তে ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে মরিবে না। মহাবীর জম্ভাসুরকে মারিবে তুমি—অতএব এখন যুদ্ধ করিয়া জম্ভকে বধ কর, নতুবা অন্য কোন উপায়ে তাহার মরণ নাই।"

বিষ্ণুর কথায় ইন্দ্রের মনে বল ফিরিয়া আসিল, তিনি দেবসেনার সহিত পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াই জম্ভাসুরকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্র বাণ মারেন জম্ভাসুর কাটে, জম্ভাসুর বাণ মারে দেবরাজ কাটিয়া ফেলেন। এইরূপে উভয়ে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। তারপর জম্ভাসুর ভয়ঙ্কর এক হাতীর রূপ ধরিয়া ইন্দ্রকে আক্রমণ করিলে তিনি নরসিংহাস্ত্র মারিয়া শত শত সিংহ সৃষ্টি করিলেন। সিংহের ভয়ে দুষ্ট অসুর হাতীরূপ ছাড়িয়া বিকট এক মূর্ত্তি ধরিল। দৈত্যের মাথা ঠেকিল আকাশে, তাহার বিশাল শরীরে সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া গেলেন। ইন্দ্রকে গিলিবার জন্য সে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া ছুটিল। কত দেবসৈন্য যে তাহার পেটে গেল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

ইন্দ্র ভয় পাইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"হে নারায়ণ! এখন আমি কি করি? আর ত এই দানবের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না।" বিষ্ণু বলিলেন—"শীঘ্র ইহাকে নারায়ণাস্ত্র মার।" ইন্দ্র তখনই নারায়ণাস্ত্র ছাড়িলেন বটে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুষ্ট দানব তিন কোটি দেবসৈন্য গিলিয়া ফেলিল। যাহা হউক নারায়ণাস্ত্র দানবের বুকে গিয়া বিঁধিবামাত্র তাহার ভীষণ রূপ দূর হইয়া গেল। সে তখন মায়াবলে শূন্যে অদৃশ্য থাকিয়া দেবতাদিগকে মারিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ কর।"

ইন্দ্র জম্ভাসুরের উপর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। এই দারুণ অস্ত্রের সম্মুখে জম্ভাসুরের মায়া খাটিল না, ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল এবং সে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রহ্মাস্ত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মাথা কাটিয়া শেষ করিল।

জম্ভাসুরের মৃত্যু হইলে দৈত্য সৈন্যগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তারকাসুরকে সংবাদ দিল। এই সংবাদে তারকের ক্রোধের সীমা রহিল না; সে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া

উপস্থিত হইল। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবতাগণকে গ্রাহ্যও করে না, দেবতারাও তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইলেন। যুদ্ধে আসিয়াই তারক ইন্দ্রের বুকে সাংঘাতিক এক বাণ মারিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে রথের উপরে বসিয়া পড়িলেন। বিষ্ণুর হাতে সে এমন এক বাণ মারিল যে তাঁহার হাত হইতে শার্ঙ্গ ধনু খসিয়া পড়িল। তারপর তারক ভীষণ এক মুদ্গর লইয়া ইন্দ্রের উপর ছুড়িয়া মারিলে ইন্দ্র লাফাইয়া মাটিতে পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু তাঁহার রথ চূরমার হইয়া গেল। পরে দৈত্যরাজ বিষ্ণুকে ও গরুড়কে অস্ত্রের আঘাতে অচেতন করিয়া ফেলিল। এইরূপে যম, অগ্নি, পবন, কুবের, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অন্য দেবতাগণও একে একে তারকের নিকট জব্দ হইলেন।

এ দিকে বিষ্ণু জ্ঞান লাভ করিয়া তারকের বুকে সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন কিন্তু দৈত্যের বুকে ঠেকিয়া অব্যর্থ সুদর্শন চক্রও চূরমার হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দেবতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দারুণ অস্ত্রগুলি সমস্তই তারকের উপর মারিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হইল না—ইন্দ্রের বজ্র, পবনের অঙ্কুশ, যমের দণ্ড, বরুণের পাশাস্ত্র, অগ্নির শক্তি, রাক্ষসরাজ নিঋর্তির ভীষণ খড়গ সমস্তই তারকের শরীরে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল!

দেবগণের অস্ত্র বিফল হইলে দৈত্যরাজ তারক পাশাস্ত্রে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে বাঁধিয়া দৈত্যপুরীতে লইয়া গেল। পুরীতে গেলে পর দানব কালনেমি জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বন্দিগণ কোথায় থাকিবে?" তারক বলিল—"এই ত্রিভুবনই আমার বাড়ী ঘর, বন্দিগণ ইহার যেখানে ইচ্ছা থাকুক—তুমি ইহাদের বাঁধন খুলিয়া ছাড়িয়া দাও।" কালনেমি তখনই দৈত্যরাজের আদেশে সকলকে ছাড়িয়া দিল।

মুক্তি পাইলে পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া ব্রহ্মার নিকটে সকল কথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"পৃথিবীতে কাহারও হস্তে তারকাসুরের মৃত্যু হইবে না; যে তাহাকে মারিবে সে এখনও জন্মায় নাই। শিবের এক পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রই সপ্ত দিবস বয়সে তারকাসুরকে বধ করিবে। দক্ষযজ্ঞে শিবের স্ত্রী সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আবার শীঘ্র হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্মিবেন। এখন এই কন্যার সহিত যাহাতে শিবের বিবাহ হয় তাহার উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি। তোমরা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর।" ব্রহ্মার কথায় দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর জন্ম এবং শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ—এ সব কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিবাহের পর কালক্রমে দেবী পার্ব্বতীর পরমসুন্দর একটি পুত্র জন্মিল। বালকের ছয়টি মুখ, শরীর সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, সোণার মত রং। জন্মিয়াই তিনি তীক্ষ্ণ শক্তি ও শূল হাতে লইলেন। তাঁহার নাম হইল কুমার (কার্ত্তিকেয়)। জন্মের পর ষষ্ঠীর দিনে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ আসিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া বলিলেন—"দৈত্যরাজ তারকের উৎপাতে আমরা আর স্বর্গে থাকিতে পারিতেছি না, আপনি তাহাকে বধ করুন।"

ইহা শুনিয়া কার্ত্তিক তখনই দেবতাগণের সঙ্গে চলিলেন। ইন্দ্র দূতদ্বারা তারককে বলিয়া পাঠাইলেন—"দুষ্ট দানব! তুমি অনেক পাপ করিয়াছ; আজ সে পাপের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।" দূতের কথা শুনিয়া তারকাসুর ভাবিল—"নিশ্চয়ই ইন্দ্র কোন সহায় পাইয়াছে, নতুবা এরূপ বলিতে কখনই সাহস পাইত না"। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তারক দেখিল দেবতাগণ দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত! দলের আগে এক অদ্ভুত বালক যোদ্ধা। তারক বুঝিতে পারিল, তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়াছে।

এই কথা স্মরণ করিয়া দৈত্যরাজ শরীরে বর্ম্মও আঁটিল না, সঙ্গে কোন লোকও লইল না, একাকী হাঁটিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল। কালনেমি প্রভৃতি দানবগণকে বলিয়া গেল—"তোমরা সকলে শীঘ্র আমার পিছনে আইস।" যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াই তারক কার্ত্তিককে দেখিয়া বলিল—"ওহে বালক! এ বয়সে তোমার মত শিশুরা খেলা করে, তুমি কেন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ"? কার্ত্তিক বলিলেন—"ওহে তারক! শিশু বলিয়া আমাকে তুচ্ছ করিও না—জানিও, এই শিশুর হাতেই আজ তোমার মৃত্যু!"

কার্ত্তিক এই কথা বলিলে তারক তখনই তাঁহার উপর ভয়ঙ্কর এক মুদ্গর ছাড়িল, কুমার বজ্র দিয়া সে মুদ্গর কাটিলেন। তারক লোহার ভিন্দিপাল মারিল, কার্ত্তিক সেটাকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে ভীষণ এক গদা দিয়া আঘাত করিলেন—দারুণ আঘাতে দৈত্যরাজের শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং সে বুঝিতে পারিল যে সত্যসত্যই তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে কালনেমি প্রভৃতি দানবগণও আসিয়া কার্ত্তিকের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দানবেরা কত যে মহা মহা অস্ত্র মারিল কিন্তু কুমারের তাহাতে একটুও ব্যথা বোধ হইল না। তিনি এমনই ভয়ঙ্কর বান সকল মারিতে লাগিলেন যে দানবেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া দৈত্যরাজ তারক

ভয়ঙ্কর রাগিয়া দারুণ এক গদা দ্বারা তাঁহার ময়ূরকে আহত করিল। তখন কার্ত্তিক স্বর্ণমণ্ডিত এক অদ্ভুত শক্তি হাতে লইয়া তারককে বলিলেন—"ওরে দুষ্ট দানব! একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও, এই শক্তির আঘাতে তোমার মরণ হইবে। যদি তোমার নিকট কোন দিব্য অস্ত্র থাকে তবে এই বেলা তাহা ছাড়।" এই বলিয়া কুমার সেই মহাশক্তি তারকের উপর ছুড়িয়া মারিলেন। দারুণ শক্তির আঘাতে দৈত্যরাজ তারকের পর্ব্বতের মত কঠিন শরীর চূরমার হইয়া গেল!

দেবতারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

নাক কাটা বুড়ো।

(বোহেমিয়া দেশের গল্প)

পশ্চিমের এক গ্রামে বিদ্‌ঘুটে মেজাজের এক খামখেয়ালি বুড়ো গৃহস্থ ছিলেন। লোকটি প্রসিদ্ধ ধনী আর তাঁর আশ্চর্য্য সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল—তুলসী। ধনী গৃহস্থের একমাত্র কন্যা তায় আবার এমন সুন্দরী,—গ্রামশুদ্ধ সব ছেলেই তাকে বিয়ে কর্‌তে চায়। কিন্তু বুড়োর কাছে সে কথা বল্‌তে গেলে সে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। যাদের উৎসাহ খুব বেশী, তারা তবু ছাড়ে না, তারা গৃহস্থের বাড়ীতে এসে গায়ে পড়ে তাঁর কাজ কর্ম্ম করে দেয়—তাদের ইচ্ছা কোন রকমে বুড়োকে খুসী ক'রে কেহ তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কি না।

চতুর গৃহস্থ যুবকদের মতলব বুঝতে পেরে একদিন তাদের বল্‌লেন—"এখন থেকে যে আমার বাড়ীতে কাজ করবে তাকে পূরো এক বৎসর থাক্‌তে হবে। বছর পূর্ণ হবার আগে যদি অসন্তুষ্ট হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে, তবে যাবার সময় তার নাকের ডগাটি কেটে রাখ্‌ব। আর আমিও যদি সেই সময়ের মধ্যে রাগ করে কাউকে তাড়াতে যাই তবে আমার নাকের ডগাটি কেটে নিও!" এই অদ্ভুত নিয়ম শুনেও অনেকে তাঁর কাজ করতে রাজি হ'ল।

চতুর গৃহস্থ তাদের নিয়ে মজা করতে লাগলেন। ইচ্ছা করে তাদের এমন সব কঠিন কাজ করতে দেন যে বাধ্য হয়ে তারা অসন্তুষ্ট হয়, আর যাই তারা কাজ করবনা ব'লে বেঁকে বসে, অম্‌নি নাকের ডগাটি কেটে একেবারে বিদায়।

এভাবে কিছুদিন চল্‌ল। কারুর নাক কাটা গেল, কেউ বা নাকের দায়ে গ্রাম ছেড়ে পালাল। শেষে কলিন্দ নামে ভারী চালাক এক ছোকরা গৃহস্থের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। গৃহস্থ তাকে কাজ করবার সর্ত্তটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল্‌লেন—"এটা হচ্ছে ফাল্‌গুন মাস। আমার বাড়ী যদি কাজ করতে চাও তবে আগামী বৎসর আবার কোকিল না ডাকা পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে। এর মধ্যে যদি রাগারাগি কর বা কাজ ছাড়্‌তে চাও তবে তোমার নাকের ডগাটি কাটা যাবে। আর আমি যদি রাগ করি বা তাড়াতে চাই তবে আমার নাকের ডগা কেটে নিও"। এই নিয়মে রাজি হয়ে কলিন্দ কাজে বহাল হলো।



সমস্ত দিন কাজের পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রাত্রে কলিন্দ সকলের সঙ্গে খেতে বস্‌ল। বৃদ্ধ তাকে কিছুই খেতে দিলেন না, অথচ নিজেরা খাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন—"বেশ খাচ্ছত? পেট ভরেছেত?" কলিন্দ হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিল—"আজ্ঞে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি।" উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে কলিন্দ গম্ভীর ভাবে উঠে একবাটি ভাত ও খানিকটা তরকারী নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল। গৃহস্থ ত চটে লাল, বল্‌লেন—"তুমি ত ভারী বেয়াদব হে।"

কলিন্দ বল্‌ল—"কি আর করব মশায়! সমস্ত দিন কিছু খাইনি, ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। তা আপনি যদি রাগ করেন, তাহ'লে খোলাখুলি বলুন—আপনার নাকের ডগাটি কেটে নিয়ে যাই।"

গৃহস্থ তাড়াতাড়ি বল্‌লেন—"না না রাগ করব কেন—তা খেয়েছ তাতে আমি বরং সন্তুষ্ট হয়েছি।" সেই অবধি খাবারের সময়ে কলিন্দের আদর যত্নের ত্রুটি হয় না।

এরূপ ভাবে দিন কয়েক গেল। রবিবার বৃদ্ধ কলিন্দকে বল্‌লেন—"দেখ, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, বাড়ী ফিরে এসে মাংসের সুরুয়া খাব—তুমি সুরুয়া রেঁধে রেখো। বাগানে মুলো আছে, খুঁজে এনে সুরুয়াতে দিও—আমি মুলো দিয়ে সুরুয়া বড্ড পছন্দ করি।" এই বলে গৃহস্থ স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন।

কলিন্দ রান্না চড়িয়ে দিয়ে বাগানে গেল মুলো আনতে। বাগানে চারিধারে, ঝোপে ঝোপে কত খুঁজল, রোদে ঘুরে ঘুরে সে হয়রান হয়ে গেল, কিন্তু তবু মুলো দেখ্‌তে পেলনা। তখন কলিন্দের ভারি রাগ হ'ল। সে বুঝতে পারল বুড়ো খামখা ইচ্ছা ক'রে তাকে ঘুরিয়েছে।

বুড়োর দুইটি কুকুর ছিল, "ভুলো "আর" মুলো"। কলিন্দের মাথায় হঠাৎ এক ফন্দি এসে গেল, সে মুলো কুকুরটাকে মেরে, কেটে কুটে রান্নার হাঁড়িতে ফেলে দিল।

যথাসময়ে গৃহস্থ বাড়ী ফিরলেন। মুখে তাঁর হাসি ফুটে বেরুচ্ছে, মনে মনে ভাবছেন—"ছোক্‌রা দেখ্‌তে মন্দ না, কিন্তু একদিন যখন নাগের ডগাটি কেটে দিব তখন আর এ রূপ থাক্‌বে না।" খেতে বস্‌লে পর স্ত্রী যখন তাঁর পাতে সুরুয়া দিচ্ছিলেন তখন গৃহস্থ কলিন্দকে বল্‌লেন—"সুরুয়াটা বোধ করি ভালই রেঁধেছ?" তারপর রান্না মুখে দিয়ে সে কি আর গিলা যায়! একেবারে অখাদ্য জিনিষ! তখন গৃহস্থের যা রাগ হলো তা আর বলে দরকার নাই। কিন্তু নাকের ডগা হারাবার ভয়ে রাগ্‌টা তখনই তাঁকে হজম করে ফেল্‌তে হলো। তারপর এদিক্ সেদিক্ তাকিয়ে তিনি ডাক্‌তে লাগলেন "আয় ভুলো, আয় মুলো, খাবি আয়—এ তোদেরই খাবার উপযুক্ত।"

তখন কলিন্দ বল্‌ল—"মুলো আবার কোত্থেকে আস্‌বে। আপনি ত বল্‌লেন মুলো দিয়ে সুরুয়া রাঁধ্‌তে। আমি ত সেই সকাল বেলাই তাকে কেটে কুটে হাঁড়িতে ফেলেছি।" একথা শুনেই গৃহস্থ কলিন্দকে ভয়ানক গালাগালি দিতে লাগলেন। কলিন্দ বল্‌ল—"মশায়! আপনি যা বলেছিলেন, আমি ঠিক তাই করেছি। এতে যদি আপনি রাগ করেন তবে বরং আমি চলেই যাই—আপনার নাকের ডগাটি দিন্।"

ফঁস্ ফঁস্ ক'রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গৃহস্থ বল্‌লেন—"না না, তা কেন—আমি ত রাগ করিনি!" এ কথা বল্‌লেন বটে কিন্তু রাগে তাঁর চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল। ঘরে অন্য চাকর যারা ছিল, অতি কষ্টে তারা হাসি থামিয়ে রাখল।

পরদিন সকালে গৃহস্থ চল্‌লেন বাজারে। অবশ্যি স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিলেন। যাবার সময় অতি অভদ্র ভাবে কলিন্দকে বল্‌লেন—"ওহে ছোক্‌রা! তুমি ত একেবারে অপদার্থ, কোন কাজ তোমাকে দিয়ে হয় না। যাহোক্‌, আজকে তোমার আর বুদ্ধি খরচ ক'রে দরকার নেই—অন্য চাকরেরা যেমন করবে তোমাকেও তাদের দেখে দেখে সেই কাজ করতে হবে।" এই বলে গৃহস্থ চলে গেলেন।

কলিন্দের ভারি রাগ হয়েছিল। সে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাবছে কি করে গৃহস্থকে জব্দ করবে। খানিক ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে পেল কতগুলি মজুর একটা পুরাণ ঘরের চালে উঠে খোলাগুলি বদলবারজন্য ফেলে দিচ্ছে। এই দেখে কলিন্দর একটা মৈ এনে গৃহস্থের থাক্‌বার ঘরের চালে উঠে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব খোলা টেনে ফেলে দিল—ঘরের চাল একেবারে ফাঁকা!

বাড়ী ফিরে ঘরের অবস্থা দেখে গৃহস্থের চক্ষুস্থির! রাগ ত হবার কথাই, কলিন্দকে যা গালাগালিটা দিলেন! কলিন্দ কিন্তু হাস্‌তে হাস্‌তে সেই একই উত্তর দিল—"তা আপনি যদি রাগ করে থাকেন, তবে নাকের ডগাটা দিন, আমি চলে যাই।" কাজেই গৃহস্থ তখনই ঠাণ্ডা হয়ে মাথা নীচু করে রাগে গর গর করতে করতে চলে গেলেন।

কয়েক সপ্তাহ এরূপ ভাবে চল্‌ল। গৃহস্থ কত চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর সাধ্য কি যে চতুর কলিন্দকে জব্দ করেন! বরং কলিন্দই তাঁকে নানা রকমে জ্বালিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ল। ক্রমে তার দৌরাত্ম্যে একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে গৃহস্থ ভাব্‌লেন, একে না তাড়ালে আর চলে না। অথচ বছর ফুরাতে তখনও অনেক বাকী।

এখন কি করা যায়? তুলসী বল্‌ল—"আচ্ছা বাবা! তুমি যে তাকে বলেছিলে যে আবার কোকিল না ডাকা পর্য্যন্ত সে তোমার কাজ করবে—তা এখন এক কাজ করনা কেন?—তাকে নিয়ে ঐ বাগানের পিছনে যাও। এদিকে আমি একটা ঝোপড়া গাছের পাতার ভিতর লুকিয়ে থেকে কোকিলের ডাক ডাকি।"

কন্যার কথা শুনে মহা খুসী হয়ে গৃহস্থ বল্‌লেন—"আহা আমার মেয়ের কি খাসা বুদ্ধি!" তিনি তখনই কলিন্দকে ডেকে তাকে সেই মাঠে নিয়ে গেলেন। তুলসীও একটা গাছের ঘন পাতার ভিতর লুকিয়ে বসে "কুউ—কুউ" বলে অতি আশ্চর্য্য কোকিলের ডাক ডেকে উঠ্‌ল। ডাক শুনেই গৃহস্থ বলে উঠ্‌লেন—"ঐ যা! কোকিল ডেকেছে—এবারে তোমার ছুটি।"

কলিন্দ বল্‌ল—"তা বেশ। কিন্তু এ কোকিলটা যেন বড় শীগ্‌গির এসে পড়েছে—এটাকে একবার দেখ্‌তে হবে।" এই বলেই কলিন্দ এক দৌড়ে সেই গাছের কাছে গিয়ে উপস্থিত। পাতার ফাঁক দিয়ে তুলসীর কাপড়ের একটু খানি দেখ্‌তে পেয়ে ভীষণ জোরে গাছটাকে নেড়ে দিবামাত্র তুলসী একেবারে কলিন্দের উপরে পড়ে গেল—কলিন্দও তাকে খপ্‌ ক'রে ধ'রে চেঁচাতে লাগ্‌ল "কোকিল ধ'রেছি, কোকিল ধ'রেছি"।

বৃদ্ধ রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "হতভাগা, তুই জেনে শুনে আমার মেয়েকে ফেলে দিয়েছিস্‌—আবার 'কোকিল ধরেছি' বলে তামাসা কর্‌ছিস্‌? আজ তোকে মেরে খুন কর্‌ব"। কলিন্দ বল্‌ল "রাগ কর্‌লেন নাকি?" গৃহস্থ চীৎকার ক'রে বল্‌ল "হাঁ রাগ করেছি—একশো বার রাগ ক'রেছি—ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর!" কলিন্দা বল্‌ল—"আচ্ছা বেশ! তবে নাকের ডগাটি দিন্‌।" গৃহস্থ বেগতিক দেখে বল্‌লেন—"নানা সেটি হ'বে না। তুই এখনই যদি চলে যাস্‌ তবে দশটা ভেড়া দিব।"

মাথা নেড়ে কলিন্দ বল্‌ল—"ভেড়া টেড়া চাই না—যেমন কথা ছিল, আপনার নাকটা দেখি।" গৃহস্থ ভয় পেয়ে বল্‌লেন "থাম থাম! তোকে দশটা গরু দিব।" তখন কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড ছোরা বার করে কলিন্দ বল্‌ল—"গরু টরুতে হবে না মশাই! আমি ঠিক সর্ত্তমত কাজ কর্‌তে চাই—নাকের ডগাটি দিন।" গৃহস্থ বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেলেন। তিনি গরু বাছুর গাড়ী ঘোড়া টাকা কড়ি কত কি দিতে চাইলেন, কলিন্দ কিছুতেই রাজি হল না। তখন বুড়ো কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লেন, "তবে আমার মেয়েকে দিচ্ছি—আমার নাক টাক কাটিস্‌নে বাপু"! কলিন্দ একগাল হেসে বল্‌ল "মশাই! এই কথাটা আগে বল্‌লেই হ'ত"!

তারপর যথাসময়ে কলিন্দের বিয়ে হ'ল। সবাই ভোজ খেয়ে খুসী হ'য়ে বল্‌ল, "নাককাটার জামাই কলিন্দের জয়"।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বুনো মোষ পোষমানা

(হো' জাতির গল্প)

এক গ্রামে এক গরীব বিধবা থাক্‌ত। তার একটিমাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রাখালে কাজ করত, পাড়ার লোকের গরু ছাগল চরাত, তাতেই যা' কিছু পেত কোন গতিকে তাদের অতি কষ্টে দিন কাটত।

এমন করে ত দিন যায়, একদিন রাখাল তার মাকে বল্লে "মা দেখ সকলেরই জায়গাজমী আছে আর গরু বলদ দিয়ে জমী চষে। আমাদের না আছে জমী না আছে গরু বলদ। আমি বলি এক কাজ করলে হয় না? একটা কাঠের ছোটখাট লাঙ্গল তৈরী করে, গাঁয়ের লোকেদের যে সব ছাগল চরাই তাদের জুতে চাষ করলে হয় না?" একথায় মায়ের মত পেয়ে খুসি হ'য়ে সে কোন গতিকে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, সেই কাঠের একটা ছোট্ট লাঙ্গল তৈরী করে, দুটো বেশ বড় বড় দেখে ছাগল বেছে নিয়ে, গ্রাম থেকে অনেক দূরে বনের ধারে একটা পতিত জায়গা খুঁজে বার করলে —যার কোন মালিক নেই; আর সেই জায়গায় লাঙ্গল দিতে লেগে গেল।

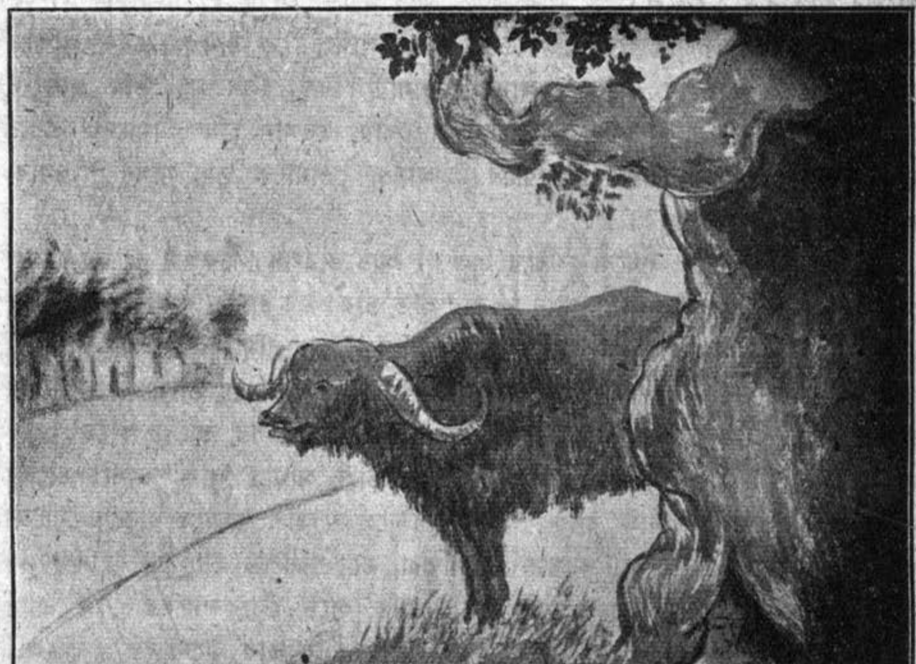
এই রকম করে ত জমী তৈরী হ'ল—এখন বীজ পায় কোথায়? কি করে? তখন, গাঁয়ের চাষীরা ধান ঝাড়া হ'লে কুঁড়ো (পেটেগ-বাবা) গুলো ফেলে দিয়েছিল সেইগুলো সে কুড়িয়ে জড় করে নিয়ে জমীতে ছড়িয়ে দিলে। কুঁড়ো থেকে কি কখন গাছ হয়? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একদিন সে সেই বীজের খোসা থেকেই সুন্দর চারা বেরচ্চে—তখন তার কি আনন্দ! তারপর দু একবার বেশ ভাল করে বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেত ধানে একেবারে ভরে উঠল! তারপর দেখলে ক্রমে ক্রমে ফল ধরতে আরম্ভ হ'য়েচে, দানা বাঁধতে (ডেম্বো) সুরু ক'রেছে! তারপর আবার একদিন দেখলে ফসলে সোণালী রঙ ধরেচে—এবার পাকবে। আর দু এক দিন গেলেই সে সেগুলো কেটে তুল্‌বে মনে করলে।

বেচারা তারপর একদিন সকালে খুব খুসি হ'য়ে ফসল কেটে আন্‌বে বলে কাস্তে নিয়ে গেছে। গিয়ে দেখে—হায়! হায়! তার অত সাধের ফসল অত পরিশ্রমের ফল একদিনে একদল বুনো মোষে খেয়ে গেছে! বেচারা তো রাগে দুঃখে অস্থির! তক্ষুনি সে ঘরে মায়ের কাছে গেল। মাকে বল্লে, "মা, আমাকে কিছু জনারের ময়দা (লুপু) আর চালভাজা দাও, আমি যেখানে পাব তীর ধনুক দিয়ে মোষেদের মেরে তবে ছাড়ব—

আমি তাদের না মেরে ফিরচি না।" মা আর কি করে! ছেলেকে খাবার জিনিষ ঘরে যা' ছিল তা দিলে। সে তীর ধনুক আর একটা একতারা নিয়ে মোষেদের পায়ের দাগ দেখে দেখে তাদের সন্ধান করতে চল্ল।

শেষে, যেতে যেতে গভীর বনে যেখানে জনমনিষ্যির যাতায়াত নেই এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল। সেখানে একদল বাচ্ছা মোষ চরচে আর সমস্ত জায়গাটা একেবারে তাদের গোবরে বিছিয়ে আছে। রাখাল কর্‌লে কি, চুপি চুপি তাদের চোখের আড়ালে থেকে সেই অপরিস্কার জায়গাটা বেশ করে নিকিয়ে চুকিয়ে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে রেখে কাছেই একটা বড় গাছের কোটরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

যখন বিকেল হ'ল, ধাড়ি মোষের পাল তাদের থাকবার যায়গায় ফিরে এল; তখন



তারা সেখানটা হঠাৎ অত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবাক হ'য়ে গেল! কিছুতেই

বুঝে উঠতে পারলে না কি করে এমন অসম্ভবও সম্ভব হ'ল। বাছুরদের জিজ্ঞাসা করলে, "কে এমন ঝেড়ে পুঁছে রেখেছেরে জানিস?" তারা কিছুই বলতে পারলে না।

তারপর দিন তারা একটা ছোট মাদি মোষকে চরতে যাবার সময় 'গোঠপিতে' পাহারায় রেখে গেল—ব্যাপারটা ধরবার জন্যে। রাখাল খুব সাবধানে চালাকি ক'রে যেই সেই মোষটা একটু অন্যমনস্ক হয়েচে অমনি বেরিয়ে এসে, জায়গাটা নিকিয়ে চুকিয়ে তাড়াতাড়ি আবার আপনার কোটরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তার পরদিন একটা মর্দ্দা মোষ পাহারায় রইল কিন্তু তারও চোখে ধূলো দিয়ে রাখাল আপনার কাজ সেরে নিলে। অবশেষে কোন গতিকে ধরবার উপায় না দেখে তারা একটা একচোখ-কাণা মোষকে পাহারায় রেখে গেল। কাণী তার কুত্কুতে একটি চোখেই রাখালের ব্যাপার ধরে ফেল্লে।

তখন, মোষেদের সর্দ্দার রাখালকে ডেকে বলতে লাগল "কে তুমি? এমন লুকিয়ে থেকে আমাদের উপকার করচ? আমরা তোমায় কিছু বলব না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এস। গাঁয়ে যেমন রাখালে গরু ছাগল চরায়, তেমনি তুমি আমাদের এবার থেকে দেখবে শুনবে নাওয়াবে ধোয়াবে। আমরা তোমাকে দুধ, মাখন খাওয়াব, বিপদে আপদেও সহায় হব"।

তখন রাখাল কোটর থেকে বেরিয়ে এল। আর তারপর থেকে সে তাদের রাখাল হ'য়ে মজা করে থাক্তে লাগল। যখন দরকার হ'ত তার একতারাটি বাজালেই মোষেরা যে যেখানেই থাক হাজার বাধা পড়লেও ছুটে-দলে দলে তার সামনে এসে হাজির হ'ত। তার যখন কাপড়ের দরকার, তখন সেই বনের কোন পথ দিয়ে তাঁতিদের কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে যেতে দেখলেই অমনি তাদের ডাক্ত। তারপর, তাদের কাছে বেছে বেছে ভাল কাপড় নিত। পয়সা চাইলে বল্ত "দাঁড়াও, আমার লোক আসচে তাদের কাছে চেও।" অমনি "বানাম" বাজিয়ে দিত আর দলে দলে শিং নাড়তে নাড়তে মোষের পাল সেখানে কোথা থেকে ছুটে আসত। তাঁতিরা ভয়ে কাপড় চোপড় যা কিছু সব ফেলে রেখে প্রাণভয়ে দে ছুট! এমনি করে প্রতি হাটে লোকজনদের কেনাবেচার যা সব জিনিষ পে'ত দরকার বুঝে আদায় করত। এমন কি তার কুমোরের (কুম্ভল) হাঁড়িকুড়িও সে সেই বনে বসে পেয়ে যে'ত।

রাখাল করত কি রোজ একটা ঝরণায় মোষেদের স্নান করাত আর নিজেও করত। একদিন কি হ'য়েছে, সে মাটি দিয়ে খুব ভাল করে মাথাটা লেপেচে, তারপর মোষেদের

নদীতে নিয়ে গেছে। মোষেদের চান হ'য়ে গেলে সে যেমন নিজে চান করবে, অমনি কি করে তার একটি মাথার লম্বা চুল খসে গেল। সেটা পাছে মাছেদের গায়ে জড়িয়ে যায় আর তাদের বিপদ ঘটায় তাই ভেবে সে একটা ডুমুর (লোয়াদারু) পেড়ে তারই ভিতর সেই লম্বা চুল গাছটি পুরে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিলে। ডুমুর ক্রমে ক্রমে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেখানে ঝরণাটা ক্রমে নদী হ'য়ে চওড়া হ'য়ে গেছে সেইখান দিয়ে কতদূর চলে গেল।

এক জায়গায় নদীতে এক রাজকন্যা তাঁর সখীদের সঙ্গে স্নান করছিলেন, হঠাৎ ডুমুরটা তাঁর গায়ে গিয়ে ঠেক্‌ল। তিনি সেটা তুলে দেখেন তার মধ্যে একটি চমৎকার লম্বা চুল রয়েছে। তিনি সেই চুল দেখেই একেবারে মুগ্ধ! প্রতিজ্ঞা করে বস্‌লেন "এই চুল যার মাথার, তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।" ঘরে গিয়ে তিনি দুয়ার বন্ধ করে রইলেন—আহার নিদ্রা সব ছেড়ে দিলেন। রাজার ঐ একটিমাত্র মেয়ে; তিনি সব ব্যাপার জান্‌তে পেরে তক্ষুনি নদীর ধারে ধারে যেখানে গিয়ে নদীটা আরম্ভ হয়েচে সেখান পর্য্যন্ত খুঁজবার জন্য জন পাঠালেন।

লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে যেখানে জঙ্গলী মোষগুলো থাকে সেই আড্ডায় গিয়ে পড়ল। তারপর তারা সেই লম্বা চুলওয়ালা রাখালকে দূর থেকে একটা মোষের পিঠে দেখতে পেলে। কিন্তু বুনো মোষের পালের মধ্যে তার কাছে এগোতে কারু সাহসে কুলাল না। রাজার কাছে খবর যেতেই তিনি ত অনেক টাকা কড়ি বখ্‌শিশ দেবার লোভ দেখালেন কিন্তু তবু কেউ মোষের সামনে এগলো না। রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন।

এমন সময়, কোথা থেকে একটা সেকালের প্রকাণ্ড কাক রাজার কাছে উড়ে এসে বল্লে, "মহারাজ! কিছু ভাববেন না, হুজুরের হুকুম হ'লেই, আর পেট ভ'রে মিঠাই পেলেই, আমি এক্ষুনি তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারি"। তারপর, রাজার হুকুমে খুব খানিক ভোজন ক'রে কাকটা উড়ে, যেখানে রাখাল মোষেদের দলের মাঝে বসে আছে সেইখানে গেল। গিয়েই সে কর্‌লে কি, ফস্‌ করে রাখালের 'বানাম' যন্ত্রটি ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে পালাল। রাখাল বেগতিক বুঝে তাকে ধর্‌বার আশায় মোষের পিঠ থেকে নেবে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। ধূর্ত্ত কাক মাঝে মাঝে একতারাটা পথের মাঝে ফেলে দিতে লাগল আর রাখাল যেই এগিয়ে গিয়ে কুড়োতে যাবে আবার অমনি ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যেতে লাগল। এমনি করে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কাক তাকে

একেবারে পাহাড়, বন, মাঠ ছাড়িয়ে সহরের মধ্যে রাজার প্রাসাদের ভিতরে একেবারে সিপাইপাহারার মাঝখানে এনে ফেল্লে। সিপাইরা তাকে দেখেই একেবারে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

তারপর, রাজার কাছে রাখাল সব জানতে পেরে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হল। কিন্তু বল্লে, তার বিয়ের আগে তার একটা বিশেষ দরকারী কাজ করতে হবে। সে প্রাসাদের প্রকাণ্ড উঠানের এক পাশে একটি মাচা বাঁধতে বল্লে আর তার সামনে এক হাজার খুঁটিতে মোটা মোটা দড়ি বেঁধে পুঁতে রাখতে বল্লে। রাজার হুকুমে তার দরকারমত সব তৈরী হ'য়ে গেল। তখন, রাখাল সেই উঁচু মাচার উপর চড়ে তার সেই বানামটি (একতারা) খুব জোরে জোরে বাজাতে লাগ্‌ল। আর দেখতে না দেখতেই পাহাড় জঙ্গল থেকে দলে দলে বুনো মোষ এসে রাজার সেই প্রকাণ্ড উঠোনটা একেবারে ভরিয়ে তুল্লে। তখন রাখাল লোকজনদের বল্লে, "মোষগুলোকে খুঁটির দড়িতে ধাঁ ধাঁ করে বেঁধে ফেল"। কতকগুলো মোষ সেই গোলমালে আর লোকজন দেখে ভয়ে আবার বনে পালিয়ে গেল। আর বাকি মোষগুলো সেই সব খুঁটোর দড়িতে বাঁধা পড়ে গরু ছাগলের মত মানুষের পোষা হ'য়ে গেল। আর যারা বনে পালাল, তারা বুনো মোষ হ'য়েই থেকে গেল।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

পিরামিড

ইংরাজিতে Seven wonders of the world বা পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য কীর্ত্তির কথা শুনতে পাই। ইজিপ্টের পিরামিড তার মধ্যে একটি। 'একটি' বলিলাম বটে, কিন্তু আসলে পিরামিড একটি নয়, অনেকগুলি। ইজিপ্টের নানা জায়গায় ঘুরিলে হয়ত একশ গণ্ডা পিরামিড খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশই ভাঙা ইঁটপাথরের স্তূপমাত্র। বাস্তবিক দেখিবার মত নামজাদা পিরামিড খুব অল্পই আছে, তাহাদের মধ্যে কাইরো নগরের কাছে যে তিনটি পিরামিড সেইগুলিই সকলের চাইতে আশ্চর্য্য।

আশ্চর্য্য বলি কিসে ? প্রথম আশ্চর্য্য তার বিপুল আয়তন। সব চাইতে বড় যে পিরামিড, যাহাকে চেয়প্‌স্ বা খুফুর পিরামিড বলে, সেটি প্রায় সাড়ে তিনশ হাত উঁচু ! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ীর দশগুণ ! দূর হইতে দেখিলে মনে হয় একটা ইটের

পাঁজা—তার গায়ে কোন কারুকার্য্য নাই, গঠনের কোন বিশেষত্ব নাই। দেখিয়া বিশেষ কোন সম্ভ্রমের উদয় হয় না। কিন্তু একটিবার কাছে গিয়া তাহার নীচে দাঁড়াইয়া দেখ,

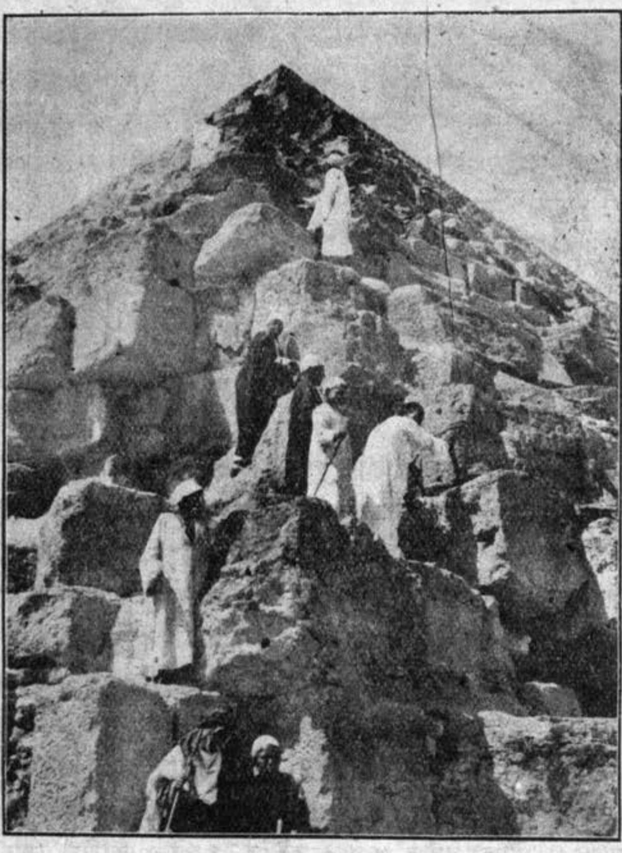


কি বিরাট কাণ্ড! এক একটি 'ইঁট' এক একটি প্রকাণ্ড পাথর—তার মধ্যে নিতান্ত ছোট যেটি, তাহার ওজন ৫০ মনের কম হইবে না! আর খুব বড় বড়গুলা এক একটি হাজার দেড় হাজার মণ।

কত পাথর! চারিদিকে চাহিয়া দেখ কেবল পাথরের উপর পাথর! না জানি কত বৎসর ধরিয়া কত সহস্র লোকের প্রাণপণ পরিশ্রমে এত পাথর একত্র করিয়া এমন স্তূপ গড়িয়াছে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রায় একশত বিঘা জমীর উপরে এই প্রকাণ্ড জিনিষটাকে দাঁড় করান হইয়াছে। এই কলিকাতা সহরের সমস্ত ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া যদি পিরামিড গড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতেও মাল মসলায় কুলাইবে না—সমস্ত সহর স্তূপাকার করিয়াও অত বড় পিরামিড গড়িতে পারিবে না। অথচ এমন অসম্ভব কাজও মানুষে করিয়াছে। নীল নদীর ওপার হইতে পাহাড় কাটিয়া মানুষ পাথর আনিয়াছে, সেই পাথর নৌকায় তুলিয়া নদী পার করিয়াছে, তারপর দুই মাইল পথ সেই পাথর টানিয়া লইয়াছে, আর ধাপে ধাপে সেই পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড পিরামিড গড়িয়াছে।

সে কি আজকার কথা! প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইল, রাজা চেয়প্‌স্‌ ভাবিয়াছিলেন নিজের গোরস্থান বানাইয়া পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, সেই কল্পনাই ত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিরামিডের মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল।

এই ছয় হাজার বৎসরে পিরামিডের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। আগে তাহার উপরে সাদা পাথরের পালিশ করা ঢাকনি ছিল, এখন কেবল দু এক জায়গায় তাহার একটু আধটু চিহ্নমাত্র বাকী আছে। একটা পিরামিডের চূড়ায় এখনও সেকালের সেই সাদা ঢাকনিটি লাগিয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ছয় হাজার বৎসর আগে পিরামিডের চেহারাটা কেমন মোলায়েম ছিল। এখন আর তাহার সে চেহারা নাই; চারিদিকে পাথরের ধাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চেষ্টা করিলে তাহার সাহায্যে পিরামিডের গা বাহিয়া চূড়ায় উঠা যায়। এমন দুরবস্থা না হইবে বা কেন? অন্তত দু তিন হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে এই পিরামিডের পাথর খসাইয়া সেই পাথরে নিজেদের ঘর বাড়ী মসজিদ বানাইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি যত কোঠা দালান তাহার মধ্যে কতগুলা যে এইরূপ চোরাই মালে তৈরী তাহার আর সংখ্যা নাই।



ছয় হাজার বৎসর আগেকার মানুষ, তাহারা কেমন করিয়া এত বড় বড় পাথর সাজাইয়া এমন পিরামিড গড়িল এ কালের মানুষ ভাবিয়া তাহার কিনারা পায় না। তবে সে কালের গ্রীক লেখক হেরোডোটস্ এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পিরামিড বিষয়ে মোটামুটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

তাহাতে দেখা যায় যে নদীর ওপার হইতে পিরামিডের ভিত্তি পর্য্যন্ত পাথর বহিবার জন্য প্রায় ২০০০ হাত লম্বা ৪০ হাত চওড়া, এক রাস্তা বানাইতে হইয়াছিল। রাস্তাটা আগাগোড়া পালিশকরা পাথরের তৈরী, তার একদিক প্রায় ৩২ হাত উঁচু, আর একদিক ক্রমে ঢালু হইয়া নদী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এক লক্ষ লোক ক্রমাগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই রাস্তা বানাইয়াছিল। যতক্ষণ রাস্তা বানান হইতেছিল, ততক্ষণে আর একদল লোকে পাহাড়ে জমী-ভাঙ্গিয়া পিরামিডের ভিত্তি সমান করিতেছিল। সেই ভিত্তির উপর আশ্চর্য্য কৌশলে ঘর বসাইয়া তাহারই চারিদিকে রাজার সমাধি মন্দির তৈরী হইয়াছে।

হেরোডোটস্ বলেন, পিরামিড শেষ করিতে আরও বিশ বৎসর লাগিয়াছিল। কত অসংখ্য ক্রীতদাস কত হাজার হাজার প্রজা মিলিয়া এই কাজে লাগিয়াছিল তাহার আর হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে সে অতি চমৎকার। এক সময়ে পিরামিডের গায়ে আয় ব্যয়ের একটা ফর্দ্দ লেখা ছিল—তারই একটুখানি হেরোডোটাসের সময় পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে মজুরদের খোরাকীর জন্য পেঁয়াজ রসুন আর মূলা এই তিন জিনিষেরই খরচ লাগিয়াছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা! এখন ভাবিয়া দেখ সমস্ত পিরামিডটাতে না জানি কত কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। শোনা যায় রাজা ইহার জন্য তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধন রত্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার সঙ্গে কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার কিছুই বাকী নাই, আছে কেবল শূন্য কবরের কতগুলা ভাঙা পাথর মাত্র। ভিতরে মূল্যবান যাহা কিছু ছিল মানুষে লুট করিয়া তাহার আর কিছু রাখে নাই। পিরামিডের ভিতরটা কিরকম, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না এমন কি উহা বাস্তবিকই সমাধিস্তম্ভ কি না, সে বিষয়েও নানারকম তর্ক শোনা যাইত। কিন্তু এখন মানুষে আবর্জ্জনা সরাইয়া তাহার ভিতরে ঢুকিবার সুরঙ্গ পথ বাহির করিয়াছে। ভিতরের ব্যবস্থাও অতি আশ্চর্য্য।

পিরামিডের গোড়ার কাছেই একটা নীচমুখী স্বরঙ্গ—সেটা খানিক দূরে গিয়া দু-মুখো হইয়া গিয়াছে। একটা মুখ মাটির নীচে একটা খালি ঘর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—আর এক মুখ উপরের দিকে উঠিয়াছে। সে দিকে রাণীর কবরঘর—তার উপর প্রকাণ্ড সিঁড়ি, তার পরে রাজার সমাধি। সমাধির উপরে আবার পাঁচতলা ঘর। তা ছাড়া আরও ছোট খাট ঘর আছে, ঘরের মধ্যে বাতাস আনিবার জন্য বড় বড় লম্বা লম্বা নলের মত স্বরঙ্গ আছে—আর আছে কতগুলা বড় বড় পাথর যাহার কোন অর্থ বোঝা যায় না।

কেবল প্রকাণ্ড জিনিষ বলিয়াই যে পিরামিডের সম্মান করি তাহা নয়—যাহারা পিরামিড গড়িয়াছে, ওস্তাদ কারিকর হিসাবেও তাহারা নমস্কারযোগ্য। বড় বড় পাথরকে অদ্ভুত কৌশলে তাহারা এমন নিখুঁৎ ভাবে জোড়া দিয়াছে, যে আজও সেই জোড়ের মুখে একটি ছুঁচ ঢুকাইবার মতও ফাঁক হয় নাই। যে চতুষ্কোণ জমীর উপরে পিরামিড বানান হইয়াছে, তার প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া সমান করা হইয়াছে, চতুষ্কোণের চারটি দিক এমন নিখুঁৎভাবে সমান, যে নিপুন জরীপের হিসাবে তাহাতে দু আঙ্গুল পরিমাণও তফাৎ পাওয়া যায় না। ঘড়ির কলের মত এমন

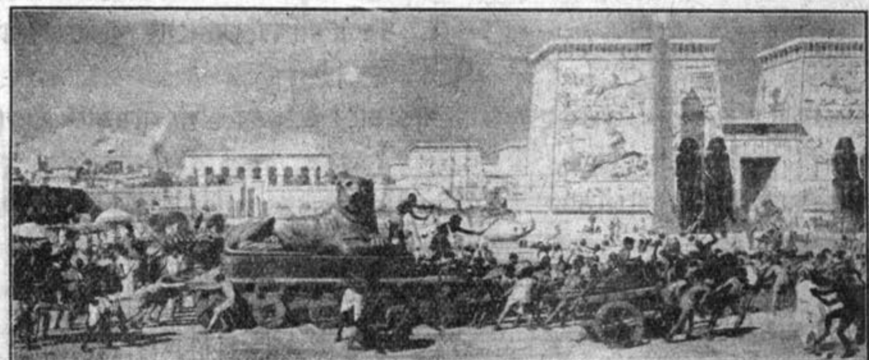


সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া যে জিনিষ খাড়া করা হইল, তাহার ওজন ১৯০,০০০,০০০ উনিশ

কোটি মণ! এই ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক লোককে যদি দাঁড়ি পাল্লায় চাপাও তবে এই রকম একটা ওজন পাইতে পার।

যাহারা পিরামিড বানাইল, তাহারা কিরকম লোক ছিল? তাহাদের চালচলন পোষাক পরিচ্ছদ বাড়ীঘর আচারব্যবহার এসবই বা কি রকম ছিল? জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? যাঁরা পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, কেবল প্রাচীনকালের খবর খুঁজিয়া ফেরেন, তাঁহারা ইজিপ্টের মাটি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে সেই কোন্ কালের ইতিহাসকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। (আগের পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। কত ঘর বাড়ী, কত আসবাবপত্র, কত অদ্ভুত ছবি, কত মোমেআঁটা মৃতদেহ (Mummy)—তাহার আর অন্ত নাই। ইজিপ্টে মৃতদেহ রক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, সে অতি আশ্চর্য্য। মৃতদেহকে পরিষ্কার করিয়া নানারকম মশলা মাখাইয়া মোমজামার ফিতা দিয়া এমন করিয়া মোড়া হইত যে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে দেহ আর পচিতে পারিত না। ফিতার উপর ফিতা, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ! এক একটি রাজার মৃতদেহ মুড়িতে পাঁচদশ মাইল ফিতা অনায়াসেই খরচ হইয়া যাইত। তাহার মধ্যে দেহগুলি শুকাইয়া কাঠ হইয়া থাকিত, কিন্তু পচিত না। এইরূপে, অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসে যে সকল রাজার নাম শোনা যায় তাহাদেরও অনেকরে আস্ত দেহ পাওয়া গিয়াছে!

ইজিপ্টের আর একটি জিনিষ তার "ছবির ভাষা"। তাদের মনের কথাগুলি ভাষার অক্ষরে না লিখিয়া তাহারা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দিত। ইহাতে কত সুবিধা হইয়াছে

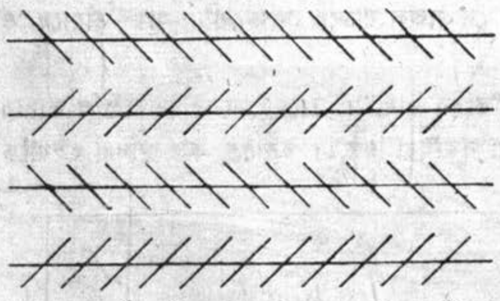


বুঝিতেই পার। "রাজা যুদ্ধ করিতে গেলেন" ইহা ভাষায় না বলিয়া যদি জলজ্যান্ত ছবি

আঁকিয়া দেখাই, তবে এ কথাটুকু ত বলা হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে রাজা কি রকম পোষাক পরিতেন, কি রকম রথে চড়িতেন, কি রকম অস্ত্র লইতেন,তাহাও বোঝাইয়া দেওয়া যায়। বাস্তবিক এই সমস্ত ছবি আর ঘর বাড়ীর চিহ্ণ দেখিয়া সে কালের ইজিপ্টকে কল্পনার চোখে বেশ পরিষ্কার করিয়া দেখা সম্ভব হয়। একজন নামজাদা ইংরাজ চিত্রকর (Poynter) পিরামিডের সময়কার ইজিপ্টের যে ছবি আঁকিয়াছেন আগের পৃষ্ঠায় তাহা দেওয়া হইল।

চোখের ফাঁকি

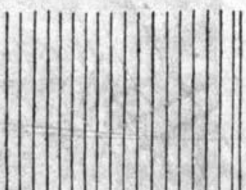
যাহা স্বচক্ষে দেখি তাহা কি আর ভুল হইতে পারে? কিন্তু আমাদের চোখই যে অনেক সময় ভুল দেখায়। যাহা সোজা তাহাকে বাঁকা বোঝায়, যাহা ছোট তাহাকে বড় বলে, যে জিনিষের এক রকম চেহারা তাহাকে অন্য রকম দাঁড় করায়। কাজেই যাহা স্বচক্ষে দেখি তাহাই যে ঠিক, এ কথা সব সময়ে বলা যাইতে পারে না।



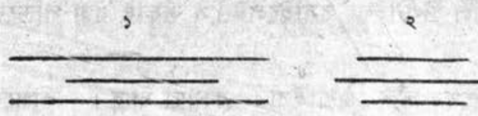
চোখ যে ভুল দেখে তাহার প্রমাণ চাও ত ঐ চারটি লম্বা লাইন দেখ। উহারাসমান্তর (Parallel), কিন্তু চোখে দেখিলে সেরূপ দেখায় না, মনে হয় এক দিকের মুখটা আর একদিকের চাইতে সরু। মাপিয়া দেখিলেই বুঝিবে কথাটা ঠিক কিনা।

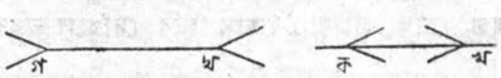
আরেকটি ছবিতে দেখ, কতকগুলি কাঠি খাড়াভাবে ও কতকগুলি আড়ভাবে সাজান রহিয়াছে। খাড়া রেখাগুলি যত লম্বা, আড়ভাবের রেখাগুলি উচ্চতায় তাহা অপেক্ষা বেশী মনে হয়, কিন্তু আসলে দুইই সমান। আড়ভাবে টান-কাটা জামা পড়িলে বেঁটে মানুষকে কিছু লম্বা দেখাইতে পারে।



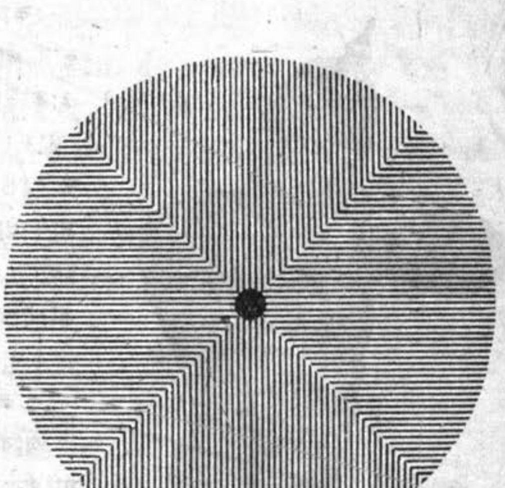


একটি রেখার দু'পাশে লম্বা লম্বা রেখা থাকিলে মাঝের রেখাটিকে ছোট দেখায়, কিন্তু দু'পাশে দুটি ছোট লাইন থাকিলে তাহার চেয়ে লম্বা দেখায়। (১নং ও ২নং ছবি)। তার নীচের ছবিতে দেখ, 'ক খ' চিহ্নিত লাইনটি 'গ ঘ' চিহ্নিত লাইন অপেক্ষা কত ছোট দেখা যাইতেছে; কিন্তু আসলে দুটি লাইনই সমান লম্বা।





এই যে গোল চক্রটি দেখিতেছ, ইহার কতকটাতে খাড়া লাইন ও কতকটাতে আড়ভাবের লাইন। ছবির দিকে চাহিয়া দেখ, প্রায় সকলের চোখেই খাড়া লাইনের অংশটা অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী কালো মনে হইবে; আবার বইখানিকে ঘুরাইয়া পাশ হইতে দেখ, অন্য দুই অংশই বেশী কালো দেখাইবে। বইখানাকে চোখের সামনে কাৎ করিয়া ট্যারচাভাবে দেখিলে এই তফাৎটা আরও স্পষ্ট দেখিবে।



যখন ইংরাজী বইএর ছাপা লেখা পড়ি, তখন মনে হয় যে প্রত্যেক অক্ষরের সমস্তটা অংশই পড়িতেছি; কিন্তু আসলে আমরা কেবল অক্ষরের উপরের অর্দ্ধাংশ পড়ি; নীচেরঅর্দ্ধাংশে নজরই যায় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ যে কোন ইংরেজী বইএর একটি লাইনের উপরের অর্দ্ধাংশ চাপা দিয়া নীচের অর্দ্ধাংশের সাহায্যে লাইনটি পড়িতে চেষ্টা কর,—সম্ভবতঃ একটি কথাও পড়িতে পারিবে না। কিন্তু নীচের অর্দ্ধাংশ চাপা দিয়া উপরের অর্দ্ধাংশ পড়িতে চেষ্টা কর,—দেখিবে কত সহজে পড়া যায়। ইংরাজী

অনেক অক্ষরের উপরের অংশ নীচের অংশের চাইতে ছোট, কিন্তু পড়িবার সময় হঠাৎ উহাছোট বলিয়া মনেই হয় না। অক্ষরগুলি উল্টাইয়া বসাইলেই সে তফাৎ ধরা পড়িবে, যেমন—BKS8, ꓭꓘꓢ8.

চিত্রকরের বিদ্যাও অনেক সময়ে চোখের ভুল জন্মাইবার কায়দা মাত্র। কাগজে আঁকা বাগানের ছবি দেখিলে মনে হইবে যে সত্যিই কতকগুলি গাছ সম্মুখে, কতকগুলি দূরে, কোন রাস্তা যেন সত্যিই বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, দূরে কত গাছপালা, কত পাহাড়, আকাশ, মেঘ দেখা যাইতেছে। একটি কাগজ পাকাইয়া সরু নল তৈয়ার করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া এক চোখে (অন্য চোখ বুজিয়া) কোন ছবি দেখিলে ছবির এই সকল কেরামতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।



কোন মানুষের ফটো তুলিবার সময়ে, অথবা ছবি আঁকিবার সময়ে, সে যদি সম্মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তাহা হইলে বড় মজার ছবি উঠে। সে ছবির দিকে যে দিক হইতেই তাকাও না কেন, মনে হইবে তোমারই দিকে তাকাইয়া আছে। এই যে ছবিটি দেখিতেছ, ইহাতে একজন সৈনিক বন্দুক লইয়া নিশানা করিতেছে। যেদিক হইতেই এই ছবির দিকে দেখ না কেন, মনে হইবে সৈনিক তোমারই দিকে লক্ষ্য করিতেছে।

আকাশে হাউই-বাজি দেখিতে ঠিক প্রকাণ্ড সাপের মত লম্বা দেখায়; কিন্তু আসলে একটি জ্বলন্ত জিনিষ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়ায় ঐরূপ দেখায়। আমাদের চোখ যে সকল জিনিষ দেখে তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেও কিছুক্ষণ অবধি তাহার 'ছাপ' থাকিয়া যায়। জ্বলন্ত হাউই এখান হইতে ওখানে সরিয়া গেল—কিন্তু চোখ তাহাকে একই সঙ্গে ওখানেও দেখিতেছে এখানেও দেখিতেছে —কারণ চোখের মধ্যে এখানকার ছাপটা এখনও দূর হয় নাই। তাই মনে হয় হাউইএর আগুনটা যেন লম্বা সাপের মত একই সময়ে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। বায়স্কোপের ছবিও ঐ রকমেরই জিনিষ,—কোন ঘটনার অনেকগুলি ছবি

পর পর খুব তাড়াতাড়ি তুলিয়া তেমনি তড়াতাড়ি পর পর দেখাইলে মনে হয় একটি জীবন্ত অথবা চলন্ত ছবি দেখিতেছি।

কোন লম্বা সোজা রাস্তার খানিকটা যদি সামান্য ঢালু হয়, তাহা হইলে ঢালু আরম্ভের পূর্ব্বে, চোখে দেখিয়া রাস্তাটিকে খুব বেশী রকম খাড়া মনে হইবে,—বিশেষতঃ যদি রাস্তার দু'ধারে সোজ সোজা গাছের সারি থাকে। রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে বুঝা যাইবে যে, সে রাস্তা মোটেই অত বেশী ঢালু নয়।

কুয়াশার মধ্যে পড়িলে চোখ আমাদের নানা রকমে ফাঁকি দেয়—তখন ছোট জিনিষকে মস্ত বড় বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার ন্যানসেন যখন উত্তর মেরু যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন একদিন তাঁহারা কুয়াশার মধ্যে একটা কি জিনিষকে প্রকাণ্ড ভাল্লুক মনে করিয়া গুলি চালাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গুলিটা ফস্কাইয়া যায়—তাহার পরেই দেখা গেল, সেটা তাঁহাদেরই পোষা একটি কুকুর ছানা! কুয়াশার মধ্যে মানুষ মানুষকে ভূত কি রাক্ষস ভাবিয়া ভয় পাইয়াছে—এ রকম গল্প অনেক শুনা যায়।

চোখের ফাঁকি কত রকম! চেহারার ফাঁকি, রঙের ফাঁকি—তাহার সব কথা বলিতে গেলে প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া যায়। খালি একটা রঙের ফাঁকি দেখাইয়া আজ শেষ করি। রোদে উজ্জ্বল আলোকে একটা টক্‌টকে লাল জিনিষের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া তারপর ঘরের দেয়ালের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখ—মনে হইবে দেয়ালের গায়ে সবুজ রঙে সেই জিনিষটার চেহারা আঁকা! শ্রীসুবিনয় রায়।

শান্তশীলা

কানা ছেলের নাম যেমন অনেক সময় হয় "পদ্মলোচন, আমাদের শান্তশীলারও ঠিক সেই রকম—তার দুরন্তপনার জ্বালায় সকলেই অস্থির—কেউ তার কাছে ঘেঁষতে চাইত না। পুতুল খেলা, রান্নাবান্না খেলা এসব তার পছন্দ হত না; তার মামা মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে তাকে সুন্দর পুতুল পাঠাতেন, সেগুলো সে যাকে তাকে বিলিয়ে দিত। কোথা থেকে যত রাজ্যের কাণা বেড়াল ছানা, মা-মরা কুকুর ছানা, ডানাভাঙ্গা পাখীর ছানা সে কুড়িয়ে আনত আর তাদের খাওয়া দাওয়া ওষুধপত্রের ঘটায় বাড়িশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুলত। সারাদিন গাছে চড়ে পুকুরে ডুব দিয়ে, মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতেই তার ভাল লাগত।

একদিন খবর এল যে শান্তর দাদামশায়ের ভয়ানক অসুখ হয়েছে। শান্তর বাবা মা ব্যস্ত হয়ে সেখানে যাবার উদ্যোগ করলেন—ঠিক হল যে শান্ত ততদিন কলকাতায় তার মামাবাড়িতে থাকবে। খবর পেয়ে মামা তাকে নিতে এলেন। ষ্টেশনে যাবার জন্য যখন গাড়ি এল, তখন শান্ত তার মেনি বেড়াল, ভুলু কুকুর, বিলিতি ইঁদুর, টিয়াপাখী এদের সাজিয়ে গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

তারপর মালীকে বল্ল, "মালী, আমার লক্ষ্মীকে গাড়িতে উঠিয়ে দাও"। মালী বল্ল, "ওমা! বাছুর আবার গাড়ি চড়বে কি, দিদিমনি?" শান্ত ধমক দিয়ে বল্ল, "তা নয়তো কি? ওর পা খোঁড়া, অতদূর হাঁটতে পারবে কেন?" এমন সময়ে তার মামা এসে বল্লেন "আরে করেছিস্ কি? একেবারে চিড়িয়াখানা নিয়ে চল্লি যে? আমার বাড়ীতে এরা থাকবে কোথা?"

"আচ্ছা মামা, ওদের বাগানে ঘর করে দিও"। মামা বল্লেন, সেখানে বাগান টাগান নেই।" "বাগান নেই! আচ্ছা মাঠ পুকুর গোয়ালঘর আছে তো?" "আরে না, না, সে সব কিচ্ছু নাই" "ওমা! তাহলে খেলব কোথায়?" ব'লে শান্তশীলা কাঁদতে লাগ্‌ল। মামা বল্লেন, "আচ্ছা, না হয় বিলাতি ইঁদুর দুটো সঙ্গে নিয়ে চল"। তখন শান্ত চোখ মুছে তার ইঁদুরের খাঁচাটি সঙ্গে নিল। শান্তর মামাত' বোন মণিমালা প্রায় শান্তর সমবয়সী। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় গিয়েই সে তার সঙ্গে খুব ভাব ক'রে ফেল্‌ল।

পরদিন খুব ভোরে উঠে শান্ত জানালার ধারে গিয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—সামনে একটা রাস্তা, আর চারিদিকে কেবল বাড়ির পরে বাড়ি। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, "এত ঘেঁসাঘেঁসি করে লোকে কি করে থাকে!" এর মধ্যে হঠাৎ তার চোখে পড়ল, কয়েকটা বাড়ির পিছন দিয়ে ঐ যে দূরে কেমন সুন্দর গাছপালা আর ঘাসের মাঝখানে জল ঝক্‌ঝক্ করছে! তবে না মামা বলেছিল যে এখানে বাগান পুকুর কিচ্ছু নাই? তাড়াতাড়ি পুকুর দেখবার জন্য শান্ত নীচে নেমে গেল, তারপর গলির দরজা খুলে এক দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে পুকুরটা খুব কাছে মনে হয়েছিল, কিন্তু রাস্তায় নেমে সে পুকুরের খোঁজ পাওয়া তেমন সহজ হ'ল না। অনেক ঘুরে শেষকালে যখন সেখানে পৌঁছাল তখন দেখল, সুন্দর রেলিং ঘেরা একটা বাগান, তার মাঝখানে একটা পুকুর আর চারিদিকে সবুজ ঘাসের মাঝে লাল রাস্তা—কত লোক সেখানে বেড়াচ্ছে, কত ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছে। শান্তও তাদের সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করল। বেলা হলে পরে আর সব ছেলে মেয়েরা যখন যে যার

বাড়ি চলে গেল, শান্তর তখন বাড়ি ফিরবার কথা মনে হ'ল। কিন্তু বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখে, যে রাস্তা তো ভুলে গেছে! কেবল বাড়ির পরে বাড়ি, গলির পরে গলি—ঘুরতে ঘুরতে তার মাথা ঘুরে গেল, খিদেয় পেট শুকিয়ে গেল, ভয়ে হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। তারপর আবার যখন একটা লাল-পাগড়ি ওয়ালা পুলিশ এসে তাকে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল তখন সে "ভ্যাঁ" করে কেঁদে ফেল্ল। যা হোক অনেক কষ্টে পাহারাওয়ালা যখন তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিল ততক্ষণে বাড়ীতে হৈ চৈ বেধে গেছে সবাই ছুটোছুটি করছে, মামা মামীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, মণিমালা কাঁদছে। তাই দেখে শান্তর ভারি লজ্জা হল—সে ঘাড় হেঁট করে, ভাল মানুষটির মত খাওয়াদাওয়া শেষ করল।

দুপুর বেলায় মামী বল্লেন "খোকা ঘুমুবে, তোমরা গোলমাল কোরোনা—পাশের ঘরে বসে চুপচাপ খেলা কর।" মনি বল্ল "চল ভাই পুতুল খেলি"। শান্ত নাক সিঁটকিয়ে বল্ল "পুতুল খেলা আমার ভাল লাগে না—এস যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি। আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, আমারা এখন লড়াই করতে যাব" বল্‌তে বলতেই আলনা থেকে মামার দুটি কোট নিয়ে নিজেও পরল, মণিকেও পরাল, দুটি চাদর দিয়ে কোমর বন্ধ বাঁধল, মণির মাথায় দেবার জন্য মামার টুপী আর নিজের পাগড়ি বাঁধবার জন্য মামীর একখানা বেনারসী শাড়ি টেনে নিল। মণি ব্যস্ত হয়ে বল্ল "না না, ওটা মার ভাল কাপড়"। শান্ত বিজ্ঞের মত বল্ল "তাতে কি হয়েছে? আমি তো আর নষ্ট করব না—খেলা হলেই তুলে রাখব।" খেলতে খেলতে যেই না শান্ত "মার-মার" করে এক লাফ দিয়েছে অমনি মাথা থেকে পাগড়িটা ছিট্‌কিয়ে মামার টেবিলের উপরে পড়ল, আর দোয়াতের যত কালী ছিল, সব পাগড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। মণি বেচারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে খালি বল্‌তে লাগল—"ও ভাই শান্তদি, কি হবে ভাই!" মামী এসে, শান্তর কীর্ত্তি দেখে একেবারে অবাক্! "এই সকালবেলা তো এক কাণ্ড করে বাড়িশুদ্ধ লোককে অস্থির করল, আবার এর মধ্যেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে! কি দস্যি মেয়ে বাপু!" মামীর কাছে খুব ধমক খেয়ে শান্ত চুপচাপ বিছানায় গিয়ে অভিমান ক'রে শুয়ে রইল। কিন্তু চুপ ক'রে কতক্ষণ থাকবে? শুয়ে শুয়ে সে হঠাৎ দেখতে পেল একটা বেড়াল বারান্দায় বসে কি খাচ্ছে। বেড়াল দেখেই চিরকালের অভ্যাস মত শান্ত পা টিপে টিপে গিয়ে খপ্ করে তাকে ধরে ফেল্ল। এ ত আর তার পোষা মেনি নয়—ধরবা মাত্রই 'ম্যাও' করে শান্তর হাতে এক আঁচড় দিয়ে বেড়ালটা এক লাফে বাসনের চৌকির উপরে উঠতে

গেল অমনি ঝন্ ঝন্ করে কয়েকটা গেলাস বাটি গড়িয়ে পড়ল। বারান্দায় বুড়ি ঝী শুয়ে ছিল, সে চোখ না মেলেই "বাবাগো মাগো" করে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল। তাই শুনে চাকরবাকর যে যেখানে ছিল, ছুটে এল।

ঝি চাকর বামুন দারোয়ান মামা মামী সব মার্‌মার ক'রে ছুটে এসে দেখে—যে চোর আর কেউ নয়—শান্তশীলা কাঁদকাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন রাত্রে শোবার সময় শান্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল এবার থেকে সে সত্যিসত্যিই বেশ শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে হবে।

তারপর দিন খুব চমৎকার ভাবে কাটল। এ রকম লক্ষ্মী বোধ হয় শান্ত তার জীবনে আর কোনদিন হয়নি। মামী পর্য্যন্ত তার পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

এর মধ্যে একদিন কারা যেন বেড়াতে এসেছেন—তাঁদের মতন মানুষ শান্ত তাদের পাড়াগাঁয়ে কখনও দেখেনি শান্ত একবার করে বারান্দায় গিয়ে তাঁদের মোটরগাড়ি দেখ্‌তে লাগল, আবার ভিতরে এসে হাঁ করে তাঁদের চমৎকার পোষাক দেখ্‌তে লাগল। তাঁদের সঙ্গে যে খুকী ছিল, মণিমালার সেই নতুন ডলিপুতুলটার চেয়েও চমৎকার তার পোষাক, তার সঙ্গে ভাব কর্‌বার চেষ্টায়, শান্ত লুকিয়ে একটা বিলিতি ইঁদুর এনে তার হাতে দিল। ইঁদুর পেয়ে খুকী তো ভারি খুসী! কিন্তু একটু টিপ্‌তেই যেই ইঁদুরটা চিঁচিঁ করে নড়ে চড়ে উঠল, অমনি সে ভয়ে ছেড়ে দিল। ইঁদুর বেচারাও ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে খুকীর মায়ের গা বেয়ে উঠতে লাগ্‌ল। খুকীর মা তো এক চীৎকার দিয়ে ভয়ে প্রায় অজ্ঞান!

মামীর কাছে আবার খুব তাড়া খেয়ে, শান্ত জানালার ধারে চুপটি করে বসে ভাবতে লাগল যে, কলকাতা সহরটা কি বিশ্রী! বাড়ী থেকে বেরোলেই হারিয়ে যায়, বাড়িতে বসেও ভাল করে ফূর্ত্তি করা যায় না। গাছে চড়তে এত ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু গাছ কোথায় পাবে ? তখনসে কর্‌ল কি, সিঁড়ির রেলিঙের উপর চড়ে রেলিং বেয়ে বেয়ে ওঠানামা কর্‌তে লাগল। তাই দেখে খোকাবাবু হো হো করে হেসে বল্ল, "আমিও কোব্বো"। শান্ত তাকে রেলিংএর উপর তুলে দিয়ে বল্‌ল "শক্ত করে ধর, পড়ো না যেন,—বাস এইবার নামো দেখি—ওয়ান্, টূ, থ্রী—"। শান্ত তো সড় সড় করে নেমে এল, কিন্তু খোকা খানিকটা এসেই উল্টে পড়ে গেল, আর গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল। নীচে পড়ে খোকা আর নড়ে চড়ে না! শান্ত বেচারার হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল! তারপর যখন ঝী এসে "ওগো আমাদের খোকনকে বুঝি মেরে ফেল্লে গো!" করে চেঁচিয়ে উঠল, তখন সে ধপ্ করে বসে পড়ল। সকলে দৌড়ে এল,

মামী কাঁদতে লাগলেন, মামা এসে খোকাকে তুলে নিয়ে গেলেন, ডাক্তার আনা হ'ল। শান্ত কিন্তু সেখানেই বসে বসে কাঁদতে লাগল, ভাবল "আমার মত দুষ্টু মেয়েকে আর কেউ ভালবাসবে না।"

শান্তশীলা ভাব্‌ল, "আমি বাড়ী চ'লে যাই। মা বাবা নাইবা থাকল, বাড়ীতে লছমন ঠাকুর আছে ত? মালী আছে ত"? এই ভেবে সে তার মার-দেওয়া দুটো টাকা সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশন খুঁজতে চল্‌ল। রাস্তায় যত গাড়ী যায় শান্ত কেবলই বলে, "গাড়োয়ান আমায় ষ্টেশনে পেঁ ছে দিবে"? এতটুকু মেয়ে কি না কি বল্‌ছে, কেউ গ্রাহ্যই করে না। শেষটায় একটা দুষ্টু গাড়োয়ান বল্‌ল, "পেঁ ছে দেব—পয়সা আছে"? শান্ত তার টাকা দুটো দেখাল। গাড়োয়ান টাকা দুটো নিয়ে তাকে হাওড়া ষ্টেশনে পেঁ ছে দিল।

সেখানে গিয়ে শান্ত দেখে ষ্টেশনে কত গাড়ী! কোন্‌টা তার গ্রামে যাবে, কি ক'রে সে বুঝবে? সে একে জিজ্ঞাসা করে, ওকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ কিছু শোনেও না, ভাল ক'রে জবাবও দেয় না।

শেষটায় একজন বুড়ো মতন বাবু তার গ্রামের নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "সেখানে যাবে ত এ ষ্টেশানে এসেছ কেন? সে গাড়ী ত এখান থেকে ছাড়ে না—শেয়ালদায় যাও"। এই শুনে ত শান্তশীলার মাথা ঘুরে গেল। টিকিট কিন্‌তে যে টাকা লাগে সে কথা তার খেয়াল নেই, তার টাকা সে খরচ ক'রে ফেলেছে—এখন শেয়ালদা যাবে কি ক'রে? সে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

একটা দুষ্টু মতন লোক তাকে কাঁদ্‌তে দেখে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, "কাঁদ্‌ছ কেন"? শান্ত তাকে সব কথা বল্‌ল। দুষ্টু লোকটা বল্‌ল, "তার জন্য ভাবছ কেন? তোমার হাতের বালা দুটো দাও, আমি টিকিট কিনে তোমায় একেবারে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছি"। এই ব'লে বালা দুটো নিয়ে সে কোথায় চলে গেল। আধ ঘণ্টা যায় এক ঘণ্টা যায়, সে আর ফেরে না দেখে শান্তশীলা একটা বেঞ্চের উপর প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—তার মনে কত রকম ভয় হ'তে লাগ্‌ল—ছেলে ধরার ভয়, পুলিশের ভয়, দুষ্টু গোরার ভয়। তার কান্নাকাটিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানে ভীড় জমে গেল। সবাই বলে, "কি হয়েছে? কি হয়েছে"? ভয়ে আর ক্ষিদেয় শান্তশীলা এমন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে যে তার মুখে আর কথা বেরুচ্ছে না।

লোকজন সব ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কেউ বল্‌ছে "ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাক", কেউ বল্‌ছে ওকে কারও বাড়ীতে নিয়ে রাখ," কেউ বল্‌ছে"থানায় খবর দাও"—শুনে শান্তশীলার

কান্না আরও দশগুন বেড়ে উঠল। এমন সময় কে একজন ভিড় ঠেলে ঢুকে বল্ল, "কি হয়েছে কি ?" তার গলার আওয়াজ শুনেই শান্ত চমকিয়ে দেখে—তার বাবা !

কি আশ্চর্য্য বাবা এলেন কোথা থেকে ? শান্তর দাদামশায়ের অসুখ যে সেরে গেছে, শান্ত ত সে খবর রাখে না। তার বাবা যে মামার কাছে টেলিগ্রাম ক'রে ছিলেন যে তিনি কলকাতায় আসছেন, তাও সে জানে না। শান্ত যতটা আশ্চর্য্য হ'ল, তার বাবা আশ্চর্য্য হ'লেন তার চাইতেও অনেক বেশী।

যা হো'ক্, সমস্ত কথা বুঝতে তাঁর বেশী দেরী হ'ল না। ওদিকে মামার বাড়ীতে কি রকম কাণ্ড চল্‌ছে তাও বুঝতেই পার। খোকার বিশেষ কিছুই হয় নি—সে এতক্ষণে উঠে আবার খুব খেলা লাগিয়েছে। কিন্তু শান্তর জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির হ'য়ে পড়েছে। মামী আর মনিমালা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। এমন সময় শান্তকে নিয়ে তার বাবা এসে হাজির হ'লেন।

সে দিন যে শান্তশীলার লজ্জা হ'ল, সে তার অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল। তার দুমাস পরে যদি শান্তকে দেখতে, চিন্‌তে পারতে কি না সন্দেহ—এমন শান্ত শিষ্ট ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

হেস' না !

রাম গরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে
"হাসব না না—না না"।
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে !
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয় "হাসিস্ যদি
মারব কিন্তু তোকে"!
যায় না বনের কাছে কিম্বা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।

শোয়াস্তি নেই মনে,— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে!
কাণ পেতে তাই শোনে।



ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
লাখ জোনাকির চক্ষুঠারা
হাস্‌তে শেখায় কারে?
হাসির গন্ধ পেয়ে স্বপ্নে তাদের মেয়ে
"হাঁস্‌ছ?" ব'লে চম্‌কে ওঠে
চাঁদের পানে চেয়ে!
হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হ'চ্ছে কেবল সারা
রাম-গরুড়ের লাগছে ব্যাথা
বুঝছেনা কি তারা?

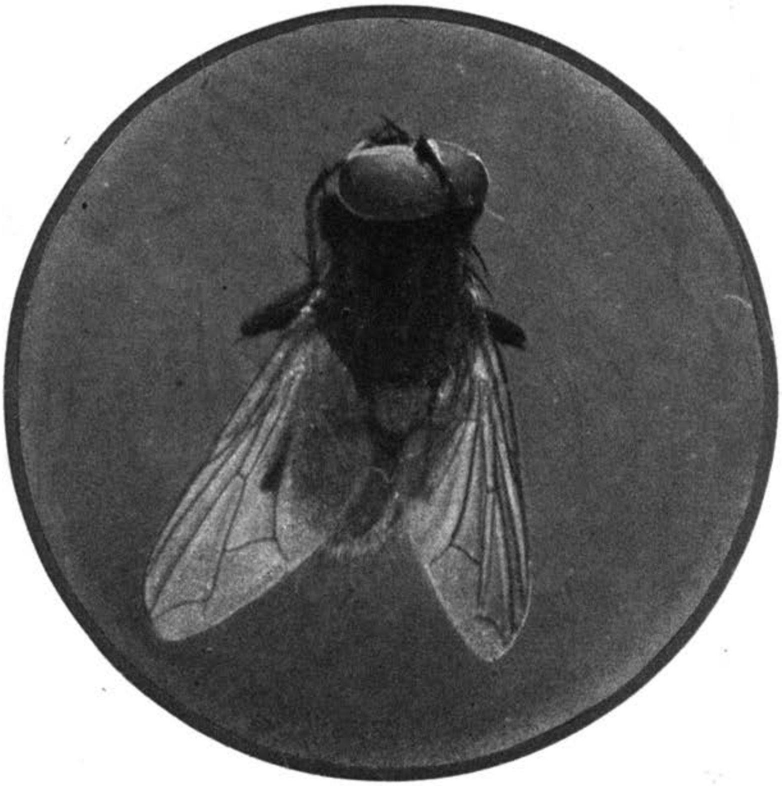
রাম-গরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

এবারের রঙিন ছবিতে আশ্চর্য্য বাগানের ছবি দেখান হইয়াছে। এ"বাগান" যে সমুদ্রের নীচে সেটা বোধ হয় না বলিলেও বোঝা যাইবে। বাস্তবিক সমুদ্রের নীচেকার দৃশ্যটা এক এক জায়গায় এমন চমৎকার যে পৃথিবীর কোন বাগান বাগিচার সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। এক সাহেবের কথা শুনিয়াছি, তিনি জলের নীচে কাচের ঘর বানাইয়া দিনের পর দিন সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতেন। তোমরা অনেকে হয়ত সমুদ্র দেখিয়াছ, কিন্তু সে দেখা কেবল বাহিরের দেখা। দশ বিশ হাত জলের নীচে সূর্য্যের আলো কেমন অদ্ভুত দেখায়—আলোর রং বদলাইয়া নীল সবুজ আভা বাহির হয়। কিন্তু আরও গভীর জলে নামিলে আর কিছুই দেখা যায় না। সেখানে কেবলই অন্ধকার, জল ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো সেখানে পৌঁছায় না। যে সাহেবের কথা বলিলাম তিনি একজন চিত্রকর। ১০।২০ হাত জলের নীচেকার অনেক আশ্চর্য্য ছবি তিনি আঁকিয়াছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ম রা ল	চ শ মা	র চ না	ক ন ক
রা ঘ ব	শ ঠ তা	চ ন্দ ন	ন র ম
ল ব ণ	মা তা ল	না ন ক	ক ম লা

এ ক ম ন	ব রা ব র
ক ল র ব	রা জ র ক্ত
ম র ক ত	ব র রু চি
ন ব ত র	র ক্ত চি হ্ন



মাছি

Micro-Photograph by U. Ray & Sons.

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৫ | তৃতীয় সংখ্যা

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হ'ল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফূর্ত্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্ত্তি।
কোনখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দ্দম—
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ্।

ব্রাহ্মণীর গঙ্গা লাভ

রেবা নদীর পশ্চিম তীরে কর্ণকী নগর। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও দুটি পুত্র ছিল। বৃদ্ধবয়সে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে পুত্র দুটির নিকট রাখিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কাশী গেলেন। সেখানে কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। এদিকে এই সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী পুত্রদিগের দ্বারা স্বামীর শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মৃত্যুর পরের কাজগুলি সম্পন্ন করাইলেন। তারপর পুত্রদিগের বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণী বধূদুটির উপর সংসারের ভার দিলেন আর নিজে পুণ্য কাজে মন দিলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিল। তারপর যথাসময়ে ব্রাহ্মণীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ আর কিছুতেই দেহ ছাড়িতে চাহে না—ব্রাহ্মণী বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। মাতার কষ্ট দেখিয়া একদিন পুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল—"মা! আপনার কোন্ কাজ করিবার বাকি রহিয়াছে, কিসের জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন? বলুন, আমরা নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।" ব্রাহ্মণী বলিলেন—"বাবা! আমার ইচ্ছা ছিল বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস করিব; কিন্তু এখন আমার মৃত্যু উপস্থিত, সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, আমার মৃত্যুর পর তোমরা যদি আমার অস্থি গঙ্গায় নিয়া বিসর্জ্জন কর তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি; আর আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

পুত্র সম্মত হইলে ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট মনে প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকুমারেরা তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিল। তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবাদী মায়ের অস্থি লইয়া একজন চাকরের সহিত গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কোথায় গঙ্গা কত দেশান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে—পথে কত বিপদ আপদ—ব্রাহ্মণ সন্তান তাহাতে বিচলিত হইলেন না।

সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় শুভগ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ছিলেন না, সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া অতিথির আদর যত্নের ত্রুটি করিলেন না। গৃহে ফিরিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন গাভীটিকে দোহান হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি বাছুরটিকে লইয়া আসিলেন। তারপর গাই দোহাইবার সময় বাছুরটিকে খোঁটায় বাঁধিবার জন্য ব্রাহ্মণ যত টানেন ততই বাছুর যাইতে চায় না। শেষে টানের চোটে বাছুর রাগিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে এক লাথি মারিল! যাহা

হউক অতি কষ্টে বাছুরটিকে খোঁটায় বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ গাই দোহাইলেন। আর তাঁহাকে লাথি মারিবার দরুণ রাগিয়া বাছুরকে প্রহারত করিলেনই তাহার উপর খোঁটার বাঁধনও খুলিয়া দিলেন না।

বাছুরের দুর্দ্দশা দেখিয়া গাই দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাছুর বলিল—"মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" গাই বলিল—"বাছা! দুষ্ট ব্রাহ্মণ মিছামিছি তোমাকে প্রহার করিল, তাই মনের দুঃখে কাঁদিতেছি।" বাছুর মাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু গাভীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, সে বলিল—"আমি যেমন দুঃখ পাইলাম তেমন দুঃখ যখন দুষ্ট ব্রাহ্মণ পাইবে তখনই আমার শান্তি। কাল আমি গুঁতাইয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে বধ করিব; তখন সে আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবে এবং আমার মনেও তখন সান্ত্বনা পাইব।" বাছুর ভয় পাইয়া বলিল—"মা! এরূপ অন্যায় কাজ আপনি কখন করিবেন না। ব্রহ্মহত্যায় গুরুতর পাপ—সে পাপ নাকি দূর হয় না।" গাভী বলিল—"তাহার জন্য চিন্তা কি? যেখানে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয় সে স্থান আমি জানি—ব্রাহ্মণকুমারকে বধ করিয়া আমি সেখানে যাইব। একটি কথা মনে রাখিও—ব্রাহ্মণ পুত্রকে বধ করিবামাত্র আমার এই সাদা রং কাল হইয়া যাইবে। আবার পাপ দূর হইলে দেখিতে পাইবে আমার পূর্ব্বের ন্যায় সাদা রং হইয়াছে।" এই অদ্ভুত কথাবার্ত্তা শুনিয়া পথিক ব্রাহ্মণ সুবাদী ভাবিলেন—"কাল প্রাতঃকালে এই ব্যাপার না দেখিয়া এখান হইতে যাইব না।"

পরদিন প্রাতঃকালে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ জাগিয়া অতিথিকে বলিলেন—"আপনি এখনও শুইয়া আছেন? বেলা হইল যে—যাইবেন কখন?" সুবাদী বলিলেন—"মহাশয়! আমার চাকরের শরীরে বেদনা হইয়াছে, খানিক পরে যাইব।" এইরূপে ফাঁকি দিয়া সুবাদী শুইয়া রহিলেন।

এদিকে গৃহস্বামী কাজে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"আমি কাজে যাইতেছি, তুমি গাইটাকে দোহাইও।" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে তাঁহার পুত্র বাছুরের বাঁধন খুলিয়া গাই লইয়া আসিল। তারপর বাছুরকে পুনরায় বাঁধিবার জন্য খোঁটার নিকটে উপুড় হইবামাত্র ক্রুদ্ধ গাই শিং দিয়া তাহাকে এমনই গুঁতা মারিল যে সে মাটিতে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান! অমনি "গরুতে ছেলে মারিয়াছে, গরুতে ছেলে মারিয়াছে" বলিয়া চারিদিক্ হইতে চীৎকার শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে লোক জড় হইয়া গেল। কেহ জল ছিটাইয়া দিল, কেহ ছেলেকে বাতাস

করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই আর সে চোখ্ মেলিয়া চাহিল না ; এক আঘাতেই তাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ! সকলের চক্ষু স্থির ! ব্রাহ্মণের চাকর তখন মোটা লাঠি লইয়া গাইটাকে প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেখা গেল—সাদা ধপ্‌ধপে গরুর রং হঠাৎ কেমন কাল হইয়া গিয়াছে ! এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

এদিকে প্রহার খাইয়া গাভী লেজ তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল ; ব্রাহ্মণ সুবাদীও তাহার পিছন পিছন চলিলেন। নর্ম্মদা নদীর তীরে নন্দিকেশ তীর্থ ছিল, গাই সেখানে গিয়া নর্ম্মদার জলে তিনবার স্নান করিল। স্নান করিয়া তীরে উঠিবামাত্র সুবাদী দেখিলেন গাভীর রং পূর্ব্বের ন্যায় সাদা হইয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য ! এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করে ?" তখন তিনি এবং তাঁহার চাকর উভয়ে সেই তীর্থে স্নান করিলেন।

নর্ম্মদাস্নানে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করিয়া গাভী পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছিল। সুবাদীও স্নানের পর তীর্থের প্রশংসা করিতে করিতে ফিরিয়া চলিলেন। এমন সময় পথে পরম সুন্দরী এক কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রাহ্মণ ! তুমি কোথায় যাইতেছ —সত্য করিয়া বল।" সুবাদী আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলে রমণী পুনরায় বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ ! তুমি ক্ষান্ত হও। যেখানে স্নান করিয়াছ সেইখানে তোমার মাতার অস্থি বিসর্জ্জন কর—তিনি স্বর্গে যাইবেন। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী দিনে গঙ্গাদেবী এইখানে আসেন। আজ সপ্তমী ; আর আমিই গঙ্গা, আমি সেখানে যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুবাদী নন্দিকেশ তীর্থে ফিরিয়া গিয়া নর্ম্মদার জলে মাতার অস্থি ফেলিবামাত্র তাঁহার মাতা দিব্য শরীর ধরিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"হে পুত্র ! তুমি ধন্য, তুমি আমাদের কুল পবিত্র করিয়াছ। তোমার ধন মান বাড়ুক—তুমি দীর্ঘায়ু হও।" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ভাল্লুক কেন শীতকালে ঘুমায় ?

(নিগ্রোদের গল্প)

সে বহুদিনের কথা, পৃথিবীর তখন কাঁচা বয়স। সেই সময়ে ভাল্লুক ভায়া এখনকার মত আর শীতকালে ঘুমাত না। ঠাণ্ডা হোক্ গরম হোক্, সারাটি দিন সে অন্য জন্তুদের উপর উৎপাত করে বেড়াত।

তার প্রকাণ্ড শরীর, গায়ে শক্তি ও খুব; সেই যেন জন্তুর রাজা! তার মেজাজ মত সে অন্য জন্তুদের উপর হুকুম করে বেড়ায়। সকলে ভয়ে ভয়ে থাকে; কেউ কিছু বলে না পাছে ভাল্লুক মশায় চটে যান্।

তখন শরৎকাল, একদিন ভাল্লুক শিকারে বেরিয়েছেন। সেই ফাঁকে অন্য সব জন্তু মিলে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌ল যে তারা আর ভাল্লুকের অত্যাচার সহ্য করবে না। কাঠ্ বিড়ালী বল্‌ল—"ভাল্লুকটা বেজায় কুঁড়ে হয়েছে—এরটা ওরটা কেড়ে খায়; নিজে খাবার সংগ্রহের কোন চেষ্টাই করে না। সেদিন আমার সঙ্গে কি ছোট লোকের মত ব্যবহারটাই না করলে! শীতকালে খাবার জন্য আমি কিছু বাদাম টাদাম সংগ্রহ করে রেখেছিলাম আর হতভাগা এসে সব চিবিয়ে নষ্ট করে দিলে। তার উপর আবার হাসি কত! যেন কতই বাহাদুরী হলো!"

শেয়াল বল্‌ল—"হাঁ ভাই, ঠিক বলেছ। ওটা বড় অভদ্র ছোট লোক। সে দিন আমার খোকাটার সঙ্গে খেলা করতে করতে আহ্লাদ ক'রে বেচারির উপর গড়িয়েই পড়ল—তাকে প্রায় আধ মরা করে দিয়েছিল আর কি!"

নেকড়ে বাঘ বল্‌ল—"ও যখন ঘুমায় তখনই একটু যা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ও যদি ভাই আরও লম্বা ঘুম দিত তবেই সুখে থাক্‌তে পারতাম্। কিন্তু জেগে থাক্‌তে আমাদের আর সোয়াস্তি নেই।"

খরগোস বল্ল—"একটা কাজ কর—ও অন্ধকারে ঘুমাতে খুব ভালবাসে; প্রায়ই দেখি অন্ধকার হওয়া মাত্র ঘুম দেয় আর সূর্য্য না উঠা পর্য্যন্ত জাগে না। চল এক কাজ করা যাক্—এর পর যখন সে তার কোটরের মধ্যে ঘুমাতে যাবে তখন কোটরের মুখটা আমরা বন্ধ করে দিব। তারপর ঘুম ভাঙ্গলে সে যখন দেখ্‌বে অন্ধকার তখন ভাব্‌বে যে রাত শেষ হয়নি—কাজেই আবার ঘুমাবে। আমরাও তাহলে বেশ সুখ শান্তিতে থাক্‌ব।"

এ পরামর্শটা সকলেরই বেশ পছন্দ হলো। পরদিন রাত্রে সকলে লুকিয়ে দেখ্‌তে লাগল ভাল্লুক কখন গর্ত্তে ঢুকে। তারপর ক্রমে ভাল্লুক ভায়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুক্‌লেন।



আর তখনই খরগোস সঙ্কেত করবামাত্র সব জন্তু এসে পাথর, কাদা, মাটি, ডাল, পালা দিয়ে আচ্ছা করে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করে দিল।

এ দিকে সকাল হলে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে ভাল্লুক গড়াগড়ি দিয়ে ঘুমের ঘোরে বল্‌ল—"ওঃ, এখনও ভোর হয়নি আর একটু ঘুমাই।" খানিক পরে আবার জেগে দেখে তখনও সেই অন্ধকার। সে ভাবল, "দূর ছাই! এখনই জাগ্‌তে যাচ্ছি কেন?" তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুম দিল। দিনের পর দিন এ রকম করে ভাল্লুক সারাটা শীত ঘুমাল। তখন অন্য জন্তুরা যদি তাকে গর্ত্ত থেকে বেরুবার ব্যবস্থা না করে দিত তবে আজ পর্য্যন্তও সে নিশ্চয় ঘুমিয়ে থাকত।

যাহোক্ শেয়াল বল্ল—"আমরা অনেক দিন সুখে শান্তিতে কাটিয়েছি—এখন চল গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করে দেখি; তা না হলে বেচারি না খেয়ে মরে যাবে!" এই বলে শেয়াল আর খরগোস্ চুপি চুপি গর্ত্তের মুখ থেকে কাঠ পাথর সরিয়ে দিয়েই দে ছুট্!—পাছে ভাল্লুক জেগে জান্‌তে পারে—কে তাকে বন্ধ করেছিল।

এ দিকে গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার হতেই একেবারে ভাল্লুকের মুখে গিয়ে রোদ পড়েছে আর তখনই সে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে চোখ্ মেলে চেয়ে বল্ল—"না, ঢের ঘুমিয়েছি, আর এখানে গরমে টেকা যায় না—এখনই বেরিয়ে পড়ি।" বাইরে এসে ভাল্লুক ত একেবারে অবাক্! গাছগুলিতে কেমন সবুজ পাতা হয়েছে, সুন্দর ফুলে সব ভর্ত্তি—কি মিষ্টি

বাতাস !—এ যে একেবারে বসন্তকাল ! তখন ভাল্লুক বল্ল—"বাঃ. বাঃ, আমি তাহলে সারাটা শীতই ঘুমিয়েছি, আর ঘুমটা দেখ্‌ছি খুব আরামেই হয়েছে। এখন থেকে তাহলে শীতকালটা ঘুমিয়েই কাটাব।"

তখন থেকে নাকি শীত পড়্‌তেই ভাল্লুক ভায়া নিরিবিলি একটি গর্ত্ত খুঁজে নিয়ে আরাম ক'রে ঘুম দেয়, বসন্তের বাতাস গায়ে না লাগ্‌লে আর জাগে না।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

যমজ রাজা

রাজ্যে মড়ক এল, রাজা মরে গেলেন, রাণীও মরে গেলেন। থাক্‌লো কেবল তাঁদের মানুষ করবার জন্য রাজার আমলের এক বুড়ো চাকর।

সে বেচারির বড়ই মুস্কিল—একে বুড়ো মানুষ চোখে ভাল দেখে না, তাতে আবার যমজ ভাই দুটোর চেহারা একেবারে একই রকম, ১॥০ হাত উঁচু, পিট্‌পিটে ক্ষুদে চোখ, বড় বড় দাঁত আর কুচ্‌কুচে কাল। রাজ্যের লোকেরাও তাদের দুজনের চেহারায় কোনই তফাৎ বুঝতে পেত না। স্বভাব ও দুভাই এর সমান। দুরন্ত, অবাধ্য আর ভয়ানক দুষ্টু। কাজেই সবটাতে গোলমাল উল্টো পাল্টা হতে লাগল ! একজনকে হয়ত আপত্তি সত্ত্বেও ঠেসে ঠেসে দুবার খাওয়ান হ'ল। আর অন্য ভাই বেচারা ক্ষীদেয় চোঁ চোঁ। একজনের অসুখ করেছে, আরেকজনকে ধ'রে তিতো ওষুধ খাওয়ান হ'ল। এই রকমে আর দিন চলে না। শেষে সবাই মিলে পরামর্শ করে, উল্কি দিয়ে একজনের কপালে চাঁদ আরেকজনের কপালে সূর্য্য এঁকে দিল। কিন্তু বুড়ো চাকর মরে যেতেই তারা নিজের নিজের কপালের উল্কি তুলে ফেল্‌ল। কেননা কপাল জুড়ে দাগ কাটাতে তাদের সুন্দর মুখ নাকি খারাপ দেখাত। উল্কি তুলে কিন্তু তারা আরই কুৎসিত হল—ঐ চেহারার উপর তাদের কপালের মাংসও উবড়ো খাবড়া হয়ে গেল। শাসন না পেয়ে তারা লেখা পড়াত শিখলই না, বরং দিন দিন একগুঁয়ে, রাগী আর দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠ্‌লো। তাদের নামে রাজ্যের লোকে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকত। সবাই বল্‌ত সূর্য্যিরাজ আর চান্দুরাজ, কিন্তু কে যে সূর্য্যি আর কে যে চাঁদ সেটা বুঝবার যো ছিল না।

বনের ধারে এক সুন্দর সহর। সেখানে এক বুড়ী তার ঘর-আলোকরা নাতনীকে নিয়ে সুখে থাকতো। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। একদিন সেই বনে দুই

ভাই শিকার করতে ঢুকেছে। বনের ধারে সূর্য্যি ভাই মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ভারী খুসী হ'য়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে বল্‌ল, "হ্যাঁগা তোমার নামটি কিগা ?" তার ঢাকের মত আওয়াজ শুনে আর ভূতের মত চেহারা দেখে, মেয়েটি"বাপ্‌রে মারে" বলে চীৎকার ক'রে এক্কেবারে তার দিদিমার কাছে গিয়ে হাজির। সূর্য্যিরাজা ও ছাড়বার পাত্র নয়; সে ও তার পিছন পিছন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে উপস্থিত। বুড়ীকে দেখেই সে এক গাল হেসে বল্‌ল "বুড়ী তোর নাতনীকে বিয়ে করব।" সে ভাবল বুড়ী তাই শুনে কৃতার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু বুড়ী কিছুতেই রাজী হল না হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল, আর বল্‌ল যে তার চেয়ে বরং তার নাত্‌নী মরে যাক্, সেও ভাল। তখন সূর্য্যিরাজা বুড়ীকে শাসিয়ে বল্‌ল "আমি তিন দিন সময় দিলাম। ঠিক তৃতীয় দিন ভোরে এসে তোর নাত্‌নীকে নিয়ে যাবো, কিন্তু খবরদার যদি কোন রকম ফাঁকি দিস্ কিম্বা পালিয়ে যাস্ তবে এই কুড়ুল দিয়ে তোদের মাথা ভেঙ্গে দিবো।" এই বলে সে গ্যাঁট্ গ্যাঁট্ ক'রে বাড়ী চলে গেল। ওদিকে চান্দু ভাই ঘুরে ঘুরে শিকার করছে, এমন সময় দেখল আকাশ একেবারে মেঘে ঢেকে গিয়েছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কড় কড় করে বাজ পড়ুছে। তখন সেও তাড়া তাড়ি বৃষ্টির ভয়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। এখন হয়েছে কি, সেই বুড়ীও তার নাত্‌নীর হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়েছে। কপালে যা থাকে, দেশ ছেড়ে তারা পালিয়ে যাবে। পথ চলতে চলতে তারাও গুহায় আশ্রয় নিল। গুহায় ঢুকেই তারা দেখে সেখানেও সেই বিকট মূর্ত্তি, যার ভয়ে তারা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। ভয়ে তারা আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল, মুখ দিয়ে একটি শব্দও করল না, দ্বিতীয় বার আর ফিরে তাকালও না। পালাতে গেলে আরোই বিপদ। তারা এত ভয় পেয়েছিল যে বৃষ্টি থেমে যেতেই যখন চান্দু রাজা তাকে জানাল যে সে তার সঙ্গের মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে রাণী করবে, তখন বুড়ী আর আপত্তি ও করতে পারল না। চান্দুরাজা মেয়েটিকে বাড়ীতে নিয়ে এল। বাড়ী আসতেই আবার আরেক বিপদ! দুই রাজার এম্‌নি ঝগড়া লাগল্! এ বলে "আমি বুড়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে এলাম, আর মাঝখান থেকে তুই হতভাগা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লি কেন ?" ও বলে "বাঃ! আমি বুড়ীকে ব'লে সেই কোন্ জঙ্গল থেকে ওকে নিয়ে এলুম, এখন উনি এলেন সর্দ্দারি করতে।" বিচারের জন্য তারা মেয়েটির কাছে গেল, মেয়ে বল্‌ল "আমি চিনতে পারছিনা, তোমাদের কাউকেই আমি বিয়ে করবো না।" তখন ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে দুভাইএ লাগল যুদ্ধ, খটাখট্ খটাং খটাং—ঠাস্ ঠাস্! হঠাৎ চান্দুরাজ সূর্য্যিরাজের মাথায় নাগরাই জুতো দিয়ে এমনি এক ঘা বসাল যে মাথাটা

ফুলে ঢোল। সে বাড়ী ছেড়ে সহর ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে কোথায় চম্পট দিল। রাজ্য শুদ্ধ সবাই বল্‌ল "একটা রাজা পালিয়েছে—আপদ গেছে"।

চান্দুরাজা বীরের মত বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগ্‌ল, কিন্তু মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে রাজী হ'ল না। তখন রাজামশাই ভয়ানক চটে গিয়ে তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিল। আর দাসীদের শিখিয়ে দিল "খবরদার! ওকে ছাড়বিনে, সারাদিন কষ্ট দিবি, আর খুব অল্প অল্প খেতে দিবি।" দাসীরা রাজার সামনে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করত, কিন্তু লুকিয়ে তাকে খেতে দিত, সোণার পাখার বাতাস দিয়ে রূপোর খাটে শুইয়ে রাখ্‌ত।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, মেয়ের মন আর বদলায় না, রাজারও রাগ যায় না। একদিন রাজা বাগানে বেড়াচ্ছে আর ভাব্‌ছে "এইবারে রাজি না হয়ত ওটাকে মেরে ফেলবো"। এই রকম যত ভাবছে ততই তার রাগ বেড়ে যাচ্ছে—শেষে রেগে হঠাৎ সে এমনি জোরে দাঁত কড়মড় করে উঠেছে যে, এক বেচারা গোক্ষুরো সাপ ঝোপের মধ্যে কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঝিমোচ্ছিল, সে চম্‌কে উঠে ফোঁস করে ছোব্‌ল মারবিত মার একেবারে চান্দুরাজার ঠ্যাঙে। তারপর কি হল? হবে আর কি—রাজগোখুরো কামড়ালে কি আর মানুষ বাঁচে? রাজ্যের লোক বাইরে গিয়ে চোখ রগ্‌ড়ে কেঁদে আস্‌ল; ঘরে এসে ফূর্ত্তি ক'রে ভোজ দিল। দাসীরা ছুটে এসে বল্‌ল "ও বুড়ীর নাতনী—আর কেঁদোনা। পেট ভরে খেয়ে নেও, গহনা নেও, টাকা নেও, তোমায় বুড়ীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

এক ভাইত মরল, আরেক ভাই মরেনি তা মনে আছেত? সে দেশে দেশে ঘুরছে আর ক্রমাগত ভাবছে, চান্দুটাকে এর প্রতিশোধ না দিলেই নয়।

ঘুরতে ঘুরতে যখন তার মাথার ফোলাটা সেরে গেল, তখন সে ঠিক করল, ভাল মানুষের মত গিয়ে ভাইটার সঙ্গে ভাব করি। তারপর সুবিধামত একদিন গলার টুঁটি টিপে ধরলেই সূয্যিদাদা টের পাবেন।

এই ভেবে সে একদিন সন্ধ্যার সময় ঝোপেঝাপে আড়ালে অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ী ফিরছে—এমন সময় রাজবাড়ীর এক সেপাই তাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। সেপাই ভাবল, "এই রে! চোর আস্‌ছে নাকি?" সে তলোয়ার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্য্যিরাজা এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে সাহস ক'রে যেই না মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেছে অমনি সেপাইজীও "চোর" ব'লে ঘ্যাঁচ্‌ ক'রে এক কোপ মেরেছে আর রাজা মশাইয়ের নাকটি বেমালুম খ'সে পড়েছে। রাজামশাই হাঁউ মাঁউ ক'রে ঝোপের মধ্যে ছুটে গিয়ে,

একটা গাছের উপর চ'ড়ে লুকিয়ে বস্‌ল, আর শুনতে পেল চারিদিকে একটা গোল উঠেছে "কৈ রে ? চোরটা গেল কোথায় ?" "আরে এই দিকে—ঐ ঝোপের মধ্যে" "আলো আন আলো আন্।" সবাইত কাস্তে কুড়ুল লাঠি সোটা নিয়ে বাতি হাতে গাছের তলায় হাজির। বিপদ দেখে গাছের উপর থেকে রাজামশাই বলতে লাগল "আমায় মেরোনা বাপু আমি বাঁদরও নই চোরও নই, আমায় মেরোনা।" নাক কেটে গিয়ে গলার আওয়াজটা নাকী নাকী হয়েছে। তাই শুনে সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল "আরে এটা ভূত! নিশ্চয় ভূত! দেখছিস্ না কেমন নাকে নাকে কথা বলছে"? তখন রাজবাড়ীর ওঝা এসে ধমকাতে লাগল "শিগ্গির বল্ তুই কে—না হলে মজা দেখিয়ে দিবো—শিগ্গির্ বল্।" কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, রাজা বল্‌ল "আমি—আ মি—তো দের—রা—জা—" এই বলেই সে ধুপ করে গাছ থেকে পড়ে গেল। তখন একজন বল্‌ল—"হ্যাঁরে, হ্যাঁ, রাজার ভূত রে! রাজার ভূত! এই ত ঠিক্



মিলে গেছে! আমাদের রাজাই ত! দেখছিস্ না—?" ওঝা পণ্ডিত বল্‌ল "আরে তোরা দেরী কচ্ছিস্ কেন ওটাকে বেঁধে ফেল—আমি সর্ষে দিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ভূত মারছি।" তখন হাতজোড় করে রাজা বল্‌ল "আমি তোমাদের কিচ্ছু করবো না আমাকে ছেড়ে দেও।" বলতেই সবাই বলে উঠ্‌ল "না—করবে না বৈকি! বাবা, বেঁচে থাকতেই যা জ্বালিয়েছিলে, আবার ভূত হয়ে গোর ঠেলে উঠে এসেছ! এখন আর গোর টোর নয় একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দিব।" যখন সব ঠিক্ ঠাক্, কাঠ আগুন সমস্ত হাজির, তখন প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টায় হেঁচ্‌কাটানে দড়ি ছিঁড়ে রাজা মশাই ঊৰ্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্। সবাই "ধর্—ধর্—পালাল পালাল" বলে পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল বটে কিন্তু সে কোথায় যে গা ঢাকা দিল—তার কোন খবরই পাওয়া গেল না। সহর জঙ্গল মাঠঘাট পাহাড় পর্ব্বত পার হ'য়ে রাজামশাই ছুটছেই ছুটছেই।

এদিকে মেয়েটি অনেক ধন দৌলত নিয়ে তার বুড়ী দিদিমার কাছে ফিরে গিয়ে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

শান্তিলতা চৌধুরী।

পোষা বাঘ

অনেক দিন আগে একবার একজন পথিক আফ্রিকার এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লেন যে দুটি মা-হারা চিতাবাঘের ছানা পড়ে রয়েছে। খেতে না পেয়ে ছানা দুটি মারা যাবে দেখে পথিকের দয়া হল, তিনি তাদের তুলে এনে সেই দেশের রাজাকে উপহার দিলেন। রাজবাড়িতে ছানাদুটি পরম আদরে ও যত্নে দিন কাটাচ্ছিল, এর মধ্যে একদিন বড় ছানাটি তার ছোট ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ এমনিই আদর কর্‌ল যে আদরের চোটে সে দম বন্ধ হয়ে মরেই গেল। তখন রাজামশাই ভাব্‌লেন যে, "এমন জানোয়ার পোষা তো নিরাপদ নয়—কোনদিন হয়তো আমাকেই ধরে ওরকম আদর করবে।" তিনি একজন ইংরাজ ভদ্রলোককে বাঘের ছানাটি দিয়ে দিলেন। ছানাটির নাম ছিল "সাই"। সাহেবের সঙ্গে "সাই"র খুব ভাব হয়ে গেল। সাহেব যখন খেতে বস্‌তেন, তখন সাই কুকুরের মত তাঁর পাশে গিয়ে বস্‌ত আর তিনি পাত থেকে যা দিতেন তাই খেত। যে দিন তার বেশী খিদে পেত, কিম্বা কোন খাবার দেখে লোভ হত, তখন মাঝে মাঝে খপ্ করে টেবিল থেকেই খাবার নিয়ে নিত। সাহেব কিন্তু তাকে আদব-

কায়দা শিখাবার জন্য, তখনই তার কাছ থেকে সে খাবার কেড়ে নিতেন। সাহেবের ছেলেমেয়েরা প্রথমে বাঘ দেখে খুবই ভয় পেত, কিন্তু ক্রমে তাদের সঙ্গে "সাই"র খুব ভাব হয়ে গেল। খেলা কর্‌তে কর্‌তে যাতে ছেলেদের কোনরকমে আঁচড় কামড় না লাগ্‌তে পারে সেই জন্য "সাই"র দাঁত নখ ঘষে ভোঁতা করে দেওয়া হ'ল। সাইর চেহারাটি যেমন সুন্দর ছিল, স্বভাবটিও তেমনি মোলায়েম ছিল, তাই তাকে সকলেই ভাল বাসত। ছেলেপিলেদের উপরে সে কখনও রাগ কর্‌ত না। তার মনিব যখন কোথাও যেতেন, তখন সাই জানালার উপরে উঠে তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকত। তার মস্ত শরীরটি জানালা জুড়ে থাক্‌ত, ছেলেরা আড়ালে পড়ে কিছুই দেখ্‌তে পেত না। তাই তাদের বড় বিরক্ত বোধ হত। অনেক সাধাসাধি করে, বকে, ভয় দেখিয়ে যখন কিছু ফল হত না, তখন তারা তিনটি ভাই বোনে মিলে তার লেজ ধরে হিড় হিড় ক'রে টান্‌ত—তখন বেচারা আস্তে আস্তে নেমে পড়্‌ত।

একদিন একটা ছোকরা চাকর কাজের সময়ে ঘুমাচ্ছে দেখে সাই তার মাথায় এমন এক চাঁটি মার্‌ল যে সেই থেকে চাকর খুব হুঁসিয়ার হয়ে গেল। আরেক দিন বাড়ির একটি বুড়ী ঝী উপুড় হয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে সাই এসে আহ্লাদ ক'রে তার ঘাড়ে চেপে বসল। বুড়ী তো ভয়েই আধমরা, আর অন্য যারা সেখানে ছিল তারাও "বাপরে মারে" করে ছুটে পালাল। গোলমাল শুনে যেই সাহেব নিজে দেখ্‌তে এলেন, অমনি সাই বুড়িকে ছেড়ে ভালমানুষটির মত সাহেবের কাছে গেল। এই রকমে মাঝে মাঝে লোককে ভয় দেখিয়ে সে তামাসা দেখ্‌ত, কিন্তু কখনও কারও অনিষ্ট করে নি।

Duchess of york (ডাচেস্ অফ্ ইয়র্ক্) জানোয়ার পুষতে খুব ভালবাস্‌তেন; "সাই"র মত জন্তু পেলে তিনি খুব খুসী হবেন মনে করে, সাহেব ঠিক কর্‌লেন যে "সাই"কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এই সময়ে একটি ইংরাজমহিলা বিলাতে যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাইকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হল। এই মেমটি কদিনেই সাইর সঙ্গে খুব ভাব করে নিলেন। মস্ত একটা খাঁচায় ভরে সাইকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বড় নদীতে এসে নৌকা থেকে জাহাজে তুলবার সময়ে কুলিরা ভয়ে ভয়ে খাঁচাটাকে এমনি আলগোছে ধরেছিল যে হঠাৎ খাঁচাশুদ্ধ 'সাই' জলে পড়ে গেল। জাহাজের খালাসীরা অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার কর্‌ল। এই ঘটনার পরে কয়দিন ধরে সাই কিছুই খেত না, খেলা কর্‌ত না, কারো দিকে চেয়েও দেখ্‌ত না—তার জন্য মেমসাহেবের বড়ই ভাবনা হ'ল। হঠাৎ একদিন তাঁর গলায়

আওয়াজ শুনেই সাই কান খাড়া করল, তারপর তিনি কাছে যেতেই আহ্লাদে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আগের মত খেলা করতে আরম্ভ করল।

বনের পশু হলেও "সাই" বেশ সৌখীন ছিল। লাভেণ্ডারের গন্ধ পেলে সে আনন্দে অস্থির হ'ত। রুমালে ল্যাভেণ্ডার দিয়ে খাঁচার কাছে গেলেই সে রুমালটা খপ্ করে ছিনিয়ে নিত। কাগজে করে একটু এসেন্স দিলে, খাওয়াদওয়া ভুলে, তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

সাহেব মেমের সঙ্গেই 'সাই'র বেশী ভাব ছিল, দেশী লোককে সে বড় একটা পছন্দ করত না। শুয়োর দেখলেও ভারি বিরক্ত হ'ত। কিন্তু একবার এক বেচারা ওরাংওটাংকে দেখে সাই যেমন রাগে পাগলের মত হয়ে উঠেছিল, তেমন রাগ বোধ হয় তার জীবনে কখনও হয়নি। ওরাং ওটাং ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে জাহাজের অন্য ধারে পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত 'সাই' সামান্য কোন শব্দ পেলেই ওরাং ওটাং আসছে ভেবে লেজ ফুলিয়ে গর্জ্জন করে উঠত।

পথে এক জায়গায় জাহাজ কি করে আটকিয়ে গেল, ডাকাতের দল ক্রমে টাকা



বাঘকে ঔষধ খাওয়ান।

পয়সা ও ভাল খাবার সব লুট করে নিয়ে গেল, সাইর ভাগ্যে তখন রোজ একটি করে মরা টিয়া পাখী ছাড়া আর খাবার জুটত না। মরা পাখী খেয়ে খেয়ে 'সাইর' এমন

অসুখ করল যে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে, মুখ গুঁজে পড়ে রইল—খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলেও সে চুপ করে মেমের পায়ে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল। তার নাকে হাত দিয়ে মেমসাহেব দেখ্‌লেন যে, নিশ্বাস খুব গরম। তখন তিনি জ্বরের ওষুধ দিয়ে তিনটি বড় বড় গুলি পাকালেন। সাইর সেবা করার জন্য যে ছোক্‌রা খালাসীটি ছিল, সে সাইর মুখ ধরে হাঁ করিয়ে দিল, আর মেমসাহেব ওষুধের গুলি তিনটি গলার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। এর পরে যখন ভাল খাবারের জোগাড় হ'ল, 'সাই'ও ক্রমে ভাল হয়ে উঠল।

জাহাজ বিলাতে পৌঁছালে পরে, 'সাই'র নতুন মনিব তার চেহারা ও স্বভাব দেখে ভারি খুসী হলেন। তাঁর এক বাগানবাড়িতে 'সাই'র থাকবার জন্য ঘর তৈরী হচ্ছিল, যতদিন ঘর শেষ না হয় ততদিন অন্য একজন লোকের বাড়িতে তার থাকবার বন্দোবস্ত হল। এই লোকটি জানোয়ার ভালবাসত, সাইকে খুব যত্নেই রেখেছিল, কিন্তু যেদিন ঘর তৈরী হয়ে গেল সেদিন ডাচেসের লোক সাইকে নিতে এসে দেখল যে হঠাৎ অসুখ করে সাই মারা গিয়েছে। বেচারার আর নতুন বাড়িতে যাওয়া হল না।

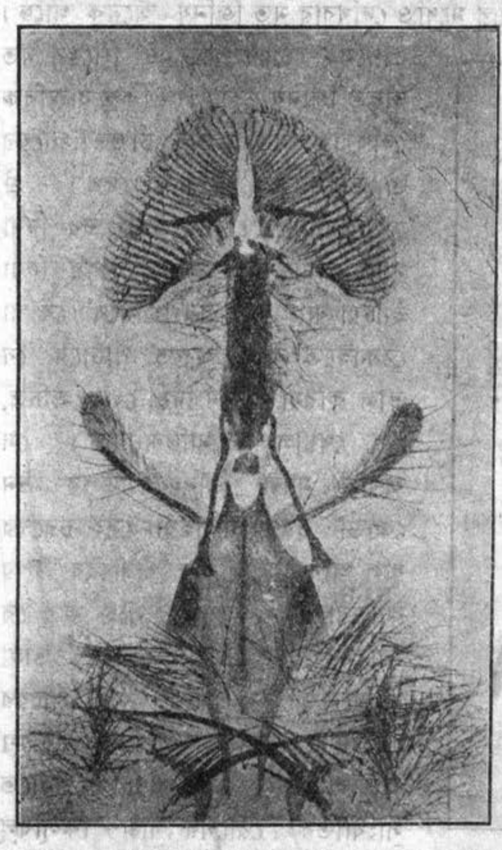
শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুক্‌রা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া আছে, মনে হয় সে ভারি একটা ভাবনায় পড়িয়া হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে সে এখন আহারে ব্যস্ত। তাহার মুখের তলায় শুঁড়ের মত কি একটা জিনিষ বারবার ওঠানামা করিতেছে। একবার চকিতে চিনির উপর ঠেকিয়া আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় ঢুকিয়া যাইতেছে। কাজটা এত চট্‌পট্ তাড়াতাড়ি চলিতেছে যে ভাল করিয়া না দেখিলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবিলাম এইবেলা মাছিটাকে ধরিয়া ফেলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেকখানি চট্‌পটে, আমার হাত একটু নড়িতেই সে ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া গেল।

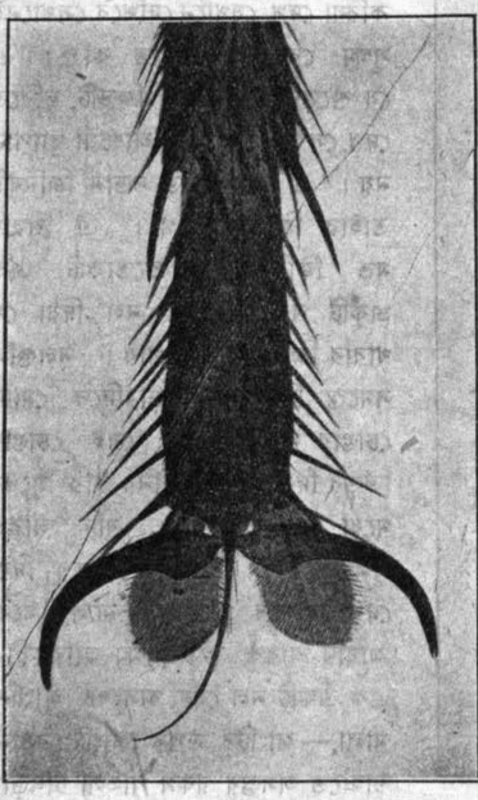
বাস্তবিক, মাছির চোখ এড়ান খুবই শক্ত। ঐ যে তাহার লালমত মাথাটি দেখিতে পাও ঐ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ! একটি নয় দুটি নয়, হাজার হাজার চোখ। অণুবীক্ষণ দিয়া বেশ বড় করিয়া দেখিলে মনে হয়, মাথাটি যেন অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়া মোড়া। আরও বড় করিয়া দেখিলে দেখা যায় সেই জালের প্রত্যেকটি ফোকর এক একটি আস্ত চোখ। প্রত্যেকটি চোখের ভিতর এক একটি পর্দ্দা—প্রত্যেকটি পর্দ্দার উপর বাহিরের জিনিযের এক একটি অতি ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে। এই রকম হাজার হাজার চক্ষু মেলিয়া না জানি সে জগৎটাকে কি রকম দেখে।



অনুবীক্ষণ দিয়া মাছিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানে দেখিবে সেখানেই সূক্ষ্ম কৌশলের অদ্ভুত কাণ্ড। ঐ যে শুঁড়ের মত তাহার জিভটি, ছবিতে দেখ সেও একটা কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। ঐ পাখার মত ছড়ান জিনিষটি তাহার জিভের আগা। ঐ শিরার মত জিনিষগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নল। সেই নল দিয়া সে খাবার জিনিষ চুষিয়া খায়। নলগুলি সমস্তে মিলিয়া গোড়ারদিকে মোটা চোঙার মত হইয়াছে, সেই চোঙার ভিতর দিয়া খাবার জিনিষ তার মুখের মধ্যে ঢুকিতে পায়। যদি আরও সূক্ষ্মভাবে খুব ভাল অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে আবার আরও কত সূক্ষ্ম কারিকরী। এক একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা,—আংটির উপর আংটি বসান, তাহাতে অসম্ভব রকম পাৎলা চামড়ার ছাউনি। ঐ নলগুলার গায়ে দুপাশে যে দুইটা কাল দাঁড়ার মত দেখিতেছ, ঐ দুইটা

গুটাইলে সমস্ত জিভটি ছাতার মত গুটাইয়া যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাহাকে এমনি ভাবে গুটাইয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়, আবার আহারের সময় দাঁড়া দুটি নাড়া দিলেই নলগুলা মুহূর্ত্তের মধ্যে ছড়াইয়া ঝাড়ের মত ঝুলিয়া বাহির হয়। গরু বা ঘোড়ার গায়ে এক রকম বড় মাছি বসে, তাহাদের ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, সুতরাং তাহাদের জিভের সঙ্গে একজোড়া করিয়া হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চাইতে অনেকখানি সরু—দেখিতে কতকটা বোতলের মত। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুঁটা করিয়া সেই ফুঁটার মধ্যে ইহারা জিভের আগাটুকু ঢুকাইয়া রক্তপান করে।

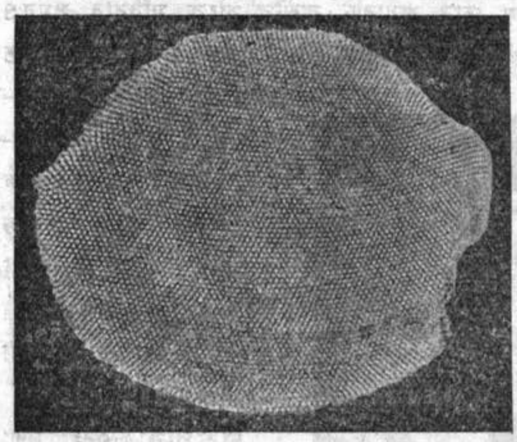
তারপর দেখ মাছির চরণখানি। ইহার মধ্যেও দেখিবার মত জিনিষ অনেক আছে।



প্রথমেই চোখে পড়ে ঐ শিঙের মত অদ্ভুত জিনিষ দুইটা। কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার মত জিনিষ চাওত পায়ের ঐ উঁচু ঢিবুলি দুইটাকে দেখ। ঐ দুইটা নরম তেলোর উপর ভর দিয়া মাছি আমাদের খাবারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। খাবার জিনিষে যে পা ঠেকাইতে নাই, অন্তত পাটাকে যে ভাল করিয়া সাবান দিয়া ধোয়া উচিত, সে খেয়াল ত মাছির নাই। সে অখাদ্য ময়লা জিনিষের উপর তিন জোড়া চরণ চাপাইয়া সেই চরণের ধূলি আবার আমাদের খাবারের উপর ঝাড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গে কত যে রোগের বীজ চলিয়া আসে, তাহা ভাবিলেও ভয় করে। ঐ পায়ের তেলোটিকে অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক সময় দেখা যায় উহাতে সাংঘাতিক রোগের বীজ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সেই জন্য লোকে বলে যে মাছিকে খাবারের উপর বসিতে দিওনা।

পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মত অসমান—তাহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ফুঁটা দিয়া সে যে-কোন জিনিষকে চুষিয়া ধরিতে পারে। তাই কাচের মত পালিশ জিনিষের উপরেও চলাফেরা করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। দরকার হইলে ঐ ফুঁটাগুলির ভিতর হইতে সে এক রকম আঠাল রস বাহির করিতে পারে—তাহাতে পা আরও মজবুত ভাবে আঁটিয়া বসাইবার সাহায্য হয়।

মাছি উড়িবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ছয়শত বার ডানা ঝাপটায়! খুব ব্যস্ত হইলে এক সেকেণ্ডে সে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত উড়িয়া যাইতে পারে। অতটুকু প্রাণীর পক্ষে ইহা বড় সামান্য কথা নয়। মাছিটাকে যদি একটা ঘোড়ার মত বড় কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দৌড়টি হয় যেন কামানের গোলার মত।



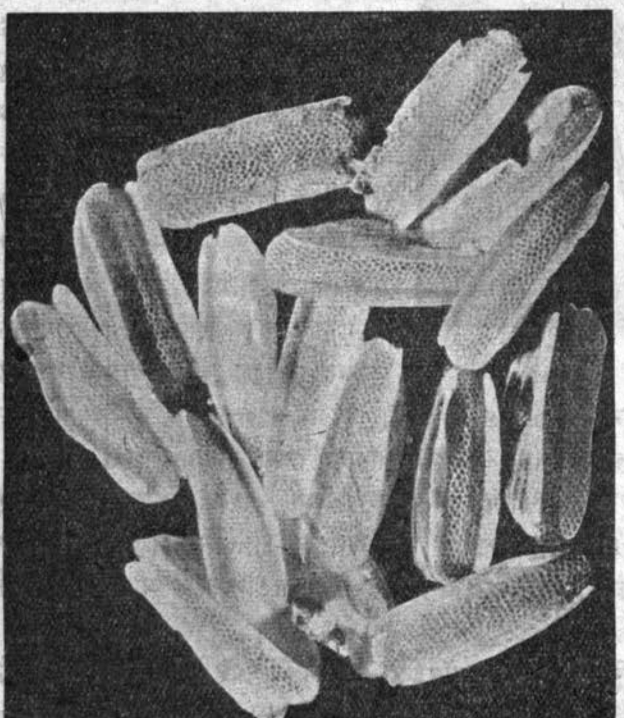
মাছির চোখ।

বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না—মাছিরও তেমনি নিশ্বাস না লইলে চলে না। আমরা নিশ্বাস লই ফুস্‌ফুসে বাতাস পাইবার জন্য। আমাদের বুকের দুপাশে দুটি হাপরের মত যন্ত্র আছে, তাহারই নাম ফুস্‌ফুস্ বা lungs। ঐ ফুস্‌ফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া শরীরের রক্তকে তাজা করিয়া তোলে। মাছির সমস্ত শরীরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড ফুস্‌ফুস্। তাহার শরীরের দুপাশে ছোট ছোট ফুঁটা থাকে—সেই গুলিই তাহার নিশ্বাস লইবার ছিদ্র বা নাক। শরীরের ভিতরে সরু সরু শিরার মত অসংখ্য প্যাঁচান নল তাহার গায়ের রক্তের মধ্যে ডুবান রহিয়াছে। সেই নলের ভিতর দিয়া বাতাস চলে আর রক্ত তাজা হইয়া ওঠে।

আমাদের যেমন অসুখ বিসুখ আছে, মাছিরও তেমনি। এই এখন আম কাঁঠালের সময়ে এত মাছি দেখিতেছ, আর কিছুদিন পরেই তাহারা কমিতে আরম্ভ করিবে। এক রকম ছাতাপড়া ব্যারামে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মাছি মারা যায়।

মাছির কথা বলিতে গেলে তাহার জন্মের কথাও বলিতে হয়। আঁস্তাকুড়ের

ময়লার মধ্যে বা গোবরের গাদার মধ্যে মাছিরা ডিম পাড়িয়া যায়। খুব ছোট সাদা সাদা চালের মত ডিমগুলি—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে এক রকম পোকা বাহির হয়। সপ্তাহখানেক ধরিয়া এই পোকাগুলা অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে আর বার বার খোলস বদলায়। তারপর পোকাটা শুকাইয়া কেমন গুটি পাকাইয়া যায়—তাহাতে তামাটে রং ধরিয়া আসে। এই ভাবে আরও কয়েক দিন থাকিলেই সেই গুটির ভিতর হইতে আস্ত মাছিটা বাহির হইয়া আসে। তারপর তাহার চেহারার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মিবার সময় তার শরীরটি যতটুকু থাকে মরিবার সময়ও ঠিক ততটুকু। সাধারণত আমরা যেসব মাছি দেখি, তাহাদের ডিমগুলি দেখিতে নিতান্তই সাদাসিধা—তাহার গায়ে কোন কারিকরী নাই। কিন্তু এক এক রকম মাছি আছে তাহারা অতি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর ডিম পাড়ে। এইখানে তাহার একটু নমুনা দেওয়া হইল!



ছারপোকা এবং মশা কামড়াইতে জানে, মাছির সে বিদ্যা নাই। সেই জন্য মানুষে ছারপোকা ও মশা তাড়াইতে যতটা ব্যস্ত হয়, মাছির ভয়ে ততটা ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত হিসাবে মাছিকে কাহারও চাইতে কম বলা যায় না। মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজদের সহিত তুর্কীদের লড়াই চলিতেছে, সেখানে গ্রীষ্মকাল আসিলেই মাছির উপদ্রব এমন

সাংঘাতিক হইয়া উঠে—যে কেবল মাছি মারিবার জন্যই হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া নানারকম কল কৌশল খাটাইতে হয়। মাছি যেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেখানে কেবল হাতে মারিয়া তাহাদের কত শেষ করিবে? নানারকম ফাঁদ পাতিয়া, বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখাইয়া, একেবারে দলেদলে তাহাদের বংশকেবংশ উজাড় করিতে হয়। তা না হইলে সে দেশে মানুষের তিষ্ঠান দায় হয়।

কালাচাঁদের ছবি

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাষ্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ"? কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মার্‌ব কেন? কাণ ম'লে দিয়েছিলাম, গালে খামচিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি চুল ধ'রে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।" হেডমাষ্টার বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে"? কালাচাঁদ খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি খালি আমায় চটাচ্ছিল"। হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল"? "না"। "তোমায় গাল দিয়েছিল?" "না"। "ধমকিয়েছিল"? "না"। "তবে"? "বার বার ঘ্যান্‌ঘ্যান্ ক'রে বোকার মত কথা বল্‌ছিল, তাই আমার রাগ হ'য়ে গেল"। মাষ্টার মহাশয় তাহার কাণ ধরিয়া বেশ ভাল রকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন হইতে একটু সংশোধন করিতে চেষ্টা কর"।

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামখা ঐ নিধেটাকে মার্‌তে গেলি কেন"? কালাচাঁদ বলিল, "খামখা মার্‌ব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞেসা কর না।" নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামখা নয় ত কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস্—তার কথা আমায় জিজ্ঞেসা কর্‌তে গেলি কেন? আর যদি জিজ্ঞেস্ কর্‌লি, তাহ'লে তাই নিয়ে আবার মারামারি কর্‌তে এলি কেন"? আমরা বলিলাম, "আরে কি হ'য়েছে খুলেই বল্‌না কেন"।

নিধিরাম বলিল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে—ছবির নাম 'খাণ্ডব দাহন'। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'কেমন হয়েছে'? আমি বল্লাম 'এটা কি

এঁকেছ ? মন্দিরের সাম্‌নে শেয়াল ছুটছে' ? কালাচাঁদ বল্‌ল "না না মন্দির কোথায় ? ওটা হ'ল রথ। আর এ গুলোত শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া'। আমি বল্লাম 'সূর্য্যটাকে কালো ক'রে এঁকেছ কেন ? আর তালগাছের উপরে পদ্মফুল ফুটেছে কেন ? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন' ? কালাচাঁদ বল্‌ল, 'আহা তা কেন ? ওটা ত সূর্য্য নয় সুদর্শন চক্র। দেখছ না কৃষ্ণের হাতে রয়েছে ? আর তাল গাছ কোথায় দেখ্‌লে ? ওটাত অর্জ্জুনের পতাকা ! আর ঐ গুলোকে বুঝি পদ্মফুল বল্‌ছ ? ওগুলো দেবতা—খুব দূরে আছেন কি না তাই ওরকম ছোট ছোট দেখাচ্ছে। আর এইটা বুঝি চামচিকে হ'ল—এটাত গরুড় পাখী ! একটা সাপকে তাড়া ক'রেছে'। আমি বল্লাম 'তা হবে ! আমি ও সব বুঝি টুঝি না। আচ্ছা ঐ কালো কাপড় পরা মেয়ে মানুষটি যে ওদের মারতে আস্‌ছে, ওটি কে' ? কালাচাঁদ বল্‌ল 'তুমিত আচ্ছা মুখ্যু হে ! ওটা গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পাচ্ছ না ? অবাক করলে যে !"

তখন আমি বল্লাম "আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডবদাহন না ক'রে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন ? ঐ গাছটাকে সাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও। কৃষ্ণ অর্জ্জুন আছেন তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হাত পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হ'য়ে যাবে। তারপর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানাদুটো মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন'। কালাচাঁদ বল্‌ল 'হনুমানও হ'তে পারে, নিধিরামও হ'তে পারে'।

আমি বল্লাম, 'তাহ'লে ভাই আর এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল বধ ক'রে দাও। তাহ'লে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছে। অর্জ্জুনের মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম ক'রে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিও। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল ত আছেই— ঐ গাছটাতে একটু নাক মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তারপর রাজসূয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই—বাস !' কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হ'ল না, তাই আমি অনেক ভেবে চিন্তে আবার বল্‌লাম 'তাহ'লে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর না কেন ? ঐ রথটা হবে জনমেজয় আর কৃষ্ণকে জটা দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে

ঘীয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘী ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া! একটা সাপ আছে, আরও কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জ্জুনকে কর আস্তীক—সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। আর ঐ চামচিকেটা—মানে গরুড়টা—ওটাকে মুনিটুনি কিছু একটা বানিয়ে দিও'। পতাকাটাকে কি রকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় এক ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল, 'থাক থাক আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই। সব দেখি।'

আমি বল্লাম 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি ত আর বলছি না যে আমার পরামর্শমত, তোমাকে চলতেই হবে। পছন্দ হয় ক'রো, না হয়ত ক'রো না—বাস্‌। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামত না ক'রে অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্রমন্থন করে দিলেও ত হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড় গাছটা মন্দরপর্ব্বত, রথটা ধন্বন্তরি কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হ'তে পারবে অর্জ্জুনের পিছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলা অসুর—" কথাটা ভাল ক'রে বল্‌তে না বল্‌তেই কালাচাঁদ আমার কাণ ধ'রে মার্‌তে লাগ্‌ল। আচ্ছা দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধু-ভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয়নি বলেই আমায় মার্‌বে? যা বলেছি সব শুন্‌লে ত, এর মধ্যে এত রাগ কর্‌বার কি হ'ল বাপু?"—

বাস্তবিক, কালাচাঁদের এ বড় অন্যায়—সে রাগ করিল কিসের জন্য। নিধিরাম তাহাকে মারে নাই ধরে নাই, বকে নাই গাল দেয় নাই, চোখরাঙায় নাই মুখভ্যাংচায় নাই—তবে তার রাগ করিবার কারণটা কি?

ব্যাপারটা কি বোঝা গেল না, তাই সন্ধ্যায় সবাই মিলিয়া কালাচাঁদের বাড়ীতে গেলাম! আমি বলিলাম "ভাই কালাচাঁদ, আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখ্‌তে চাই। সেই যে সমুদ্র লঙ্ঘন না কি যেন?" রমাপ্রসাদ বলিল "দূৎ, সমুদ্র লঙ্ঘন কিসের? অগ্নি পরীক্ষা"। আর একজন কে যেন বলিল "না না কি একটা বধ"। কেন জানি না, কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "যাও যাও ইয়ার্কি কর্‌তে হবে না," বলিয়া সে তাহার ছবির খাতাখানি ফড়্‌ ফড়্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—আর রাগে গজ্‌রাইতে লাগিল। আমরা হতভম্ব হইয়া রহিলাম। সকলেই বলিলাম "কালাচাঁদের মাথায় বোধ হয় একটু পাগ্‌লামির ছিট্‌ আছে। নইলে সে খামখা এত রাগ করে কেন"?



বাবু—চোর ভাগা কেঁউ?
দ্বারবান—মেরা এক হাতমে ঢার ছুসরে মে তরোয়ার
পক্‌ড়ে ক্যয়সে!

গাড়ী

'গাড়ী' বল্‌লেই ঘোড়ার কিম্বা গরুর গাড়ীর কথাই মনে হয়, কারণ আমরা সচরাচর ঘোড়ার গাড়ী আর গরুর গাড়ীই দেখি। এক্কা, টঙ্গা, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, আপিস গাড়ী, টম্‌টম—গাড়ী যে কত রকমের, তার আর অন্ত নাই! কোনটা দু'চাকার, কোনটা তিন চাকার, কোনটা চার চাকার, কোনটার বা চাকাই নাই; কোনটা ঘোড়ায় টানে, কোনটা গরুতে টানে, কোনটা মানুষে টানে, কোনটা গাধায় টানে, কোনটা



ছাগলে টানে, কোনটা উটে টানে, কোনটা "লামা"য় টানে, কোনটা কুকুরে টানে, কোনটা হরিণে টানে। হাতী জেব্রা চমরী উটপাখীকেও ঐ কাজে লাগিয়ে দেখা হয়েছে।

আমাদের দেশে ঘোড়া, গরু, আর মানুষটানা গাড়ীরই চল্ বেশী। গরুর গাড়ী যে কেবল মালচালানের জন্যই ব্যবহার করা হয় তা' নয়। অনেক জায়গায় মানুষেও গরুর গাড়ী চড়ে। সচরাচর এক জোড়া ঘোড়া বা গরুতেই গাড়ী টানে; মাঝে মাঝে একটা কিম্বা তিনটা গরুতেও গাড়ী টেনে থাকে। বেনারসে আমি তিন গরুর গাড়ী দেখেছি। দুটো গরুর সাম্‌নে আরেকটা গরু জোতা হয়। রুশিয়ায় একরকম তিন-ঘোড়ার গাড়ী আছে তার নাম ট্রয়কা।

ঘোড়ার গাড়ী অনেক রকমের হয়। বড় বড় সহরে কত রকম ঘোড়ার-গাড়ী ব্যবহার করা হয়, কিন্তু পাহাড়ে' জায়গায় এক্কা বা টঙ্গা না হ'লে তো চলেই না। সেখানে ল্যাণ্ডো হাঁকাতে গেলে মুস্কিলে পড়তে হবে। এক্কাগাড়ীর এক বদ্‌নাম আছে, যে তার ঝাঁকানি বড় বেশী। চড়্‌লে পরে সাম্‌লে থাকা দায় হয়। সেটা কিন্তু সব জায়গার এক্কার পক্ষে খাটে না। বেনারসে যাঁরা এক্কা চড়েছেন, তাঁরা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবেন যে, এক্কার ব্যবহারটা সব সময়ে খুব অভদ্র নয়। গাধার গাড়ীও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে প্রায়ই মানুষ চড়্‌তে দেখা যায় না; বোধ হয় লোকেরা তাতে চড়তে অপমান বোধ করে। ইউরোপের সিসিলি দ্বীপে একরকম গাধা-টানা গাড়ী আছে; সেটা অনেকটা এক্কারই মত। ওরকম এক একটা গাড়ীতে আট দশজন লোক চড়ে! আমাদের দেশের এক্কায় যদি ঐরকম লোক চাপাতে চাও, তবে এক্কাওয়ালা লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।



এস্কিমো কুকুর। বরফের দেশে উত্তর মেরুর কাছে এই রকম কুকুরে স্লেজ টানে।

মানুষে টানা গাড়ীর মধ্যে আমাদের দেশ 'পুশ্‌পুশ্‌'ই প্রধান। বাংলা দেশে পুশ্‌পুশের চলন বেশী নাই; কিন্তু হাজারিবাগ, গিরিডি, রাঁচি, এসব জায়গায় পুশ্‌পুশ্‌

অনেক দেখা যায়। পুশ্‌পুশ্‌ দু'চাকারও হয়, চার চাকারও হয়। তা'ছাড়া আজকাল অনেক জায়গায় 'রিক্‌শ'র চলন হয়েছে। জাপান থেকে 'রিক্‌শ'র আমদানি হয়। একজন লোকে একটা রিক্‌শ বেশ তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে।

ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় উটে-টানা গাড়ী দেখা যায়। যে সব দেশে গ্রীষ্ম বেশী হয়, আর যে সব দেশের মাটিতে বালী বেশী, সেই সব দেশেই উটের গাড়ীর ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে। উট বেশ জোরে যেতে পারে, আর অনেক দূরও যেতে পারে। তবে, ক্ষেপে গেলে তাকে কেমন ক'রে থামাতে হবে, তা' বল্‌তে পারি না। ভূপালের বেগমের অনেকগুলি উটের গাড়ী আছে। তার মধ্যে দোতালা গাড়ীও আছে।

চাকা-হীন গাড়ী তোমরা কি কেউ দেখেছ? আফ্রিকায় ঐ রকম গাড়ীর চল আছে। গরুতে সে গাড়ী টানে। রুষিয়া 'স্লে' বা স্লেজ্‌ গাড়ীরও চাকা নাই; ঘোড়ায় সে গাড়ী



টানে। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের স্লেজগাড়ী কুকুরে কিম্বা হরিণে টানে।

শীতপ্রধান দেশে বরফের উপর চাকাওয়ালা গাড়ী নিয়ে চলা ফিরা করতে গেলে বরফে চাকা বসে যায়। তাহার চাইতে গাড়ীর তলাটা নৌকার মত ঢালু করে বরফের উপর দিয়ে পিছলিয়ে চালালে অনেকটা সহজ হয়। সেই জন্য সেখানে চাকাওয়ালা গাড়ীর ব্যবহার নাই।

এঞ্জিন আর মোটর হবার পর থেকে জন্তু-টানা গাড়ীর ব্যবহার হয়তো কিছু ক'মে গেছে ; কিন্তু মোটর আর ইঞ্জিনের ব্যবহার বোধ হয় কোনদিনই এত বেশী চল্‌ হবে না যে জন্তুটানা গাড়ী একেবারেই উঠে যাবে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

দক্ষিণ দেশ

কলম্বসের আগে লোকে আমেরিকার কথা জানিত না—সে সময়ে লোকে তিনটি-মাত্র মহাদেশের কথা জানিত। আমেরিকা আবিষ্কারের পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত আর কোন নূতন মহাদেশের কথা শুনা যায় নাই। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে এক পর্টুগীজ নাবিক আসিয়া বলে যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে সে এক প্রকাণ্ড নূতন দেশ দেখিয়াছে। তার পাঁচ বৎসর পরে স্পেন দেশের এক জাহাজের কাপ্তান বলে সেও নাকি ঐ দেশের কাছ দিয়া আসিয়াছে। তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত ওলন্দাজ নাবিকদের মুখে ঐ দেশের কথা মাঝে মাঝে শুনা যাইত। কেহ কেহ সেই নতুন দেশে যাইবার চেষ্টায় জাহাজডুবি হইয়া মারা যায়। দু একজন দেশে ফিরিয়া বলে, "দেশটা একেবারে ফাঁকা—দেখিবার কিছু নাই।"

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে টাস্‌মান্‌ নামে এক সাহসী ওলন্দাজ নাবিক এই নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হ'ন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে একটা দ্বীপে গিয়া জাহাজ ভিড়াইলেন, তাঁহারই নামে সেই দ্বীপের নাম হইয়াছে টাসমানিয়া। দ্বীপটাকে তিনি দ্বীপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই—তিনি ভাবিলেন, এই সেই প্রকাণ্ড নূতন দেশ। দুঃখের বিষয় দ্বীপটা তাঁহার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। একদল নাবিক লইয়া তীরে নামিতেই তাঁহারা দেখিলেন একটা গাছের গায়ে কতগুলা খাঁজ কাটা রহিয়াছে। অস্ত্রের দাগ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন এখানে মানুষ আছে। তিন হাত সাড়ে তিন হাত অন্তর এক একটি খাঁজ দেখিয়া নাবিকেরা ভাবিল ঐ খাঁজে খাঁজে পা দিয়া যাহারা গাছে চড়ে, তাহাদের পা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লম্বা, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষস। রাক্ষসের ভয়ে তাহাদের আর নূতন দেশ দেখা হইল না। টাসমানের পর যাহারা নূতন দেশ দেখিতে আসে তাহারা সকলেই হল্যাণ্ড দেশের লোক—তাহারা সে দেশের নাম দিল "নূতন হল্যাণ্ড"। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে ড্যাম্পিয়ার নামক এক ইংরাজ অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে জহাজ লাগাইলেন। সে এক আশ্চর্য্য সুন্দর জায়গা। তীরে নামিতেই

তাজা ফুলের গন্ধে তাঁহাদের মনটা খুসী হইয়া উঠিল। সবুজ গাছগুলি ফুলে ফুলে রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে রংবেরঙের নানান্ পাখী উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে। তাঁহারা ডাঙ্গায় নামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া কত অদ্ভুত দৃশ্য আর তাহার চাইতেও কত অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইলেন। একটা জন্তু, তার ইঁদুরের মত মুখ, প্রায় মানুষের মত বড়—সে দুই পায়ে ভর দিয়া বিশ হাত লম্বা লাফ দেয়! তোমরা জান সে জন্তুর নাম কাঙ্গারু, কিন্তু সে সময়ে অমন জন্তু কেহ দেখে নাই। সে দেশের মানুষদের তিনি দেখিলেন—রোগা লম্বা, সরু সরু হাত পা আর কুচকুচে কালো। তাহারা কাপড় পরিতে জানে না গাছের ছাল পরিয়া থাকে।

ড্যাম্পিয়ারের পর আরও প্রায় আশি বৎসর কেহ সে দেশের বড় একটা খবর লয় নাই। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার আর একজন ইংরাজ নাবিক তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। ইঁহার নাম কাপ্তান কূক্। কাপ্তান কূকের মত অমন সাহসী নাবিক সেকালে খুব কমই ছিল। তিনি জাহাজে করিয়া কত যে নূতন দেশের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিতে গেলেও প্রকাণ্ড পুথি হইয়া যায়। কাপ্তান কূক প্রথম যেখানে গেলেন সেটা অষ্ট্রেলিয়া নয়, সেটাকে এখন নিউজীল্যাণ্ড বলা হয়। নিউজীল্যাণ্ডের চারিদিক ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন এটা একটা দ্বীপ—আসল মহাদেশটা আরও পশ্চিমে। তারপর নিউজীল্যাণ্ড ছাড়িয়া উনিশ দিন পরে তিনি "নূতন হল্যাণ্ডে" উপস্থিত হইলেন। অনেক ঘুরিয়া একটা সুবিধামত জায়গায় জাহাজ ঠেকাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলা কাদা-মাখা অদ্ভুত লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তারপর নাবিকেরা যখন জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিবার চেষ্টা করিল, তখন তাহারা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। জাহাজ হইতে কতগুলা ফাঁকা আওয়াজ করিতে তাহারা একটু ভয় পাইল কিন্তু তাহাতে কেহ মরিল না দেখিয়া আবার তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তখন একটা লোকের পায়ে ছর্‌রা মারিতেই, তাহারা ভয় পাইয়া পলাইল।

জাহাজ মেরামতের জন্য কাপ্তান কূক্‌কে কিছু দিন সেখানে থাকিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে নাবিকেরা সে দেশী লোকেদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল। জাহাজ মেরামত হইলে কাপ্তান কূক্ তীর ধরিয়া ধরিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। নূতন দেশের সমস্ত পুর্ব্ব দিকটাতে ইংরাজের অধিকার ঘোষণা করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন "নিউ সাউথ ওয়েলস্"। তারপর কথা উঠিল, এই নূতন দেশটাকে লইয়া কি করা যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, "যে সকল কয়েদী অপরাধীদের দ্বীপান্তরে

তাড়ান আবশ্যক, তাহাদের ঐখানে চালান করিয়া দাও"। তখন এগারটি জাহাজ বোঝাই করিয়া কয়েদী পাঠান হইল। তাহাদের পাহারার জন্য সৈন্য গেল, শাসনব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী গেল, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া দলে দলে ডাক্তার নাবিক মজুর গেল। কাপ্তান ফিলিপ হইলেন এই দলের গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা। তাঁহারা সুবিধামত জায়গা খুঁজিয়া সেইখানে কাঠের ঘর বাড়ী বসাইয়া বেশ ছোট খাট একটি সহর পত্তন করিলেন।

কাপ্তান ফিলিপ সে দেশী লোকদের মনে সদ্ভাব জাগাইবার জন্য নানারকমে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভয় ও সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই। ভাল ভাল বখ্‌সিস দিয়া, নানারকমে লোভ দেখাইয়া তিনি দুই একজনকে অনেকটা বশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বেন্নিলনি নামে একজন ছোকরাকে তিনি নিজের বাড়ীতে আনিয়া কয়েকদিন খুব আমোদে রাখিয়াছিলেন। বেন্নিলনি যখন তাহার লোকদের কাছে ফিরিয়া গেল, তখন তিনি একদিন অনেক রকম উপহার লইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুঃখের বিষয় একজন সে-দেশী লোকের সঙ্গে "হ্যাণ্ডশেক্" করিতে যাওয়ায়, সে হঠাৎ কেমন ভুল বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কাঁধের কাছে বল্লম বিঁধাইয়া দেয়! বেন্নিলনির যত্নে ও সাহায্যে সেবার তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে বেন্নিলনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে সে দেশী লোকেদের সঙ্গে তাঁহার অনেকটা বনিবনাও হইয়া গেল।

এমনি করিয়া নূতন দেশে ইংরাজের উপনিবেশ আরম্ভ হইল। কথা ছিল, মাঝে মাঝে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া রসদ আসিবে, তাহাতে তাহাদের খাওয়ার কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে অসম্ভব রকম বিলম্ব হইয়া গেল। সহরের চাল ময়দা শাক সবজী গরু ছাগল সব ফুরাইয়া আসিল। গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক লোকেই দিনে তিন ছটাক ময়দার রুটি, দুই ছটাক মাংস আর এক ছটাক চালের ভাত খাইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোন রকমে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাতেও যখন খাদ্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন তিন জাহাজ বোঝাই করিয়া রসদ আসিয়া হাজির হইল। এই রকম কষ্টের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ রাজ্যের পত্তন হইল। তাহার পর আরও কত লোক সে দেশে আসিতে আরম্ভ করিল, কেহ চাষবাসের জন্য, কেহ খনি খুঁড়িবার জন্য, কেহ দেশ আবিষ্কারের জন্য, কেহ কেবলমাত্র চাকুরী খুঁজিবার জন্য। একটা সহর ছিল, দেখিতে দেখিতে দুই চার দশটা সহর জাগিয়া উঠিল। ততদিনে তাহার "নিউ হল্যাণ্ড" নাম ঘুচিয়া নূতন নাম হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া বা "দক্ষিণ দেশ"।

অষ্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অনেকটাই সে সময়ে অজানা দেশ ছিল। বড় বড় মরুভূমি, সেখানে কি আছে তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। ওই সকল অজানা দেশে যাইবার জন্য অনেক লোকে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল ভ্রমণবীরের বীরত্ব কাহিনী শুনিলে অবাক হইতে হয়। ফ্লিণ্ডার্স্ আর বাস্ নামক দুই ইংরাজ ছোকরা নানা জায়গায় ঘুরিয়া অনেক নূতন স্থানের সংবাদ আনিয়াছিল। একটা সামান্য রকমের নৌকায় চড়িয়া তাহারা নদীতে ও সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ফিরিত। ফ্লিণ্ডার্স্ ভারি আমুদে লোক ছিল, সে একবার কতগুলা সে-দেশী লোকের হাতে পড়ে। তাহাদের ভাবগতিক মোটেই সুবিধামত ছিল না, তাই তাহাদের খুসী রাখিবার জন্য সে নানারকম কাণ্ড করিয়াছিল, এমন কি শেষটায় রসিকতা করিয়া তাহাদের কয়েকজনের দাড়ি পর্য্যন্ত কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সেই লোকেরা নাকি ভারি খুসী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়!

অষ্ট্রেলিয়ার অজানা দেশে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা। লোকের অত্যাচার আর মরুভূমি ত আছেই, তার উপর মাঝে মাঝে এমন চোরা মাটি, যে তাহার উপর চলিতে গেলে পাঁকে ডুবিয়া মরিতে হয়। সে দেশের নদীগুলাও কেমন বেয়াড়া তাহাদের মতি গতির যেন কিছুই স্থির নাই। লেফ্‌টেনাণ্ট অক্স্‌লি এক জায়গায় প্রকাণ্ড নদী দেখিয়াছিলেন, সেই নদীতে বান আসিয়া তাঁহাকে অনেকবার নাকাল করিয়াছিল। ছয় বৎসর পরে কাপ্তান ষ্টার্ট্ সেইখানে গিয়া দেখেন খট্‌খটে শুক্‌না ডাঙ্গা, তাহার মাঝে মাঝে ছোটখাট বিলের মত—নদীর চিহ্নমাত্র নাই!

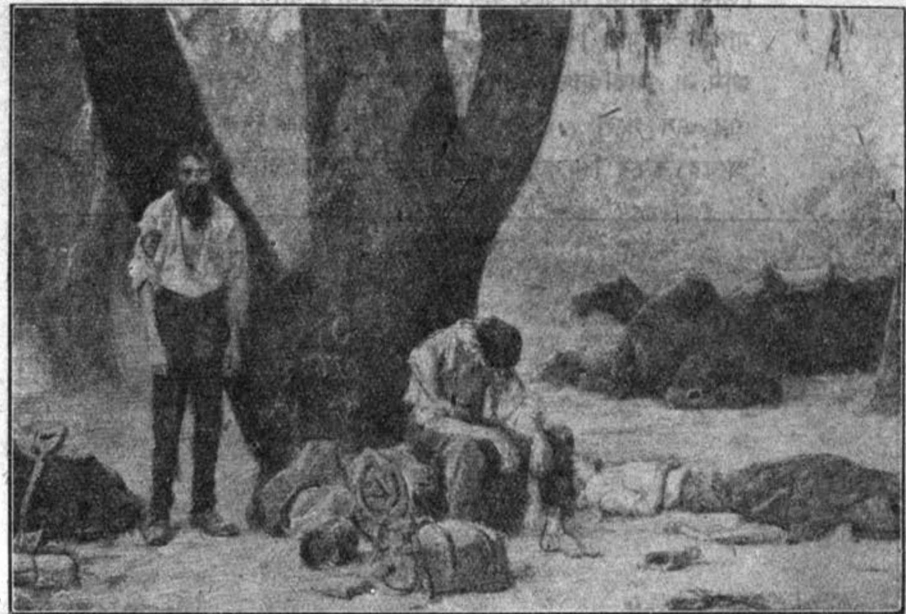
১৮৪০ খৃস্টাব্দে আয়ার নামে এক সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার মাঝখানের অজানা দেশটা দেখিবার জন্য বাহির হন। তিনি দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিতেছিলেন—দিনের পর দিন চলিয়া কেবল লাল বালি আর শুক্‌না হ্রদ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তারপর তিনি পশ্চিম মুখে গিয়া সেদিকেও সামান্য কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কোন গাছ পাইলেন না। জলের কষ্ট এত বেশী যে চল্লিশ দিনে তিনি দেড়শত মাইল পথও যাইতে পারেন নাই—বার বার জলের জন্য ফিরিতে হইত। অন্য কোন লোক হইলে সেইখানেই উৎসাহ নিভিয়া যাইত, কিন্তু আয়ার বলিলেন, সমুদ্র না পাওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চলিব, না হয় মরিব। লোকজন সকলে বিদায় লইল, সঙ্গে রহিল কেবল ব্যাক্স্‌টার নামে এক সাহেব আর তিনটি সে-দেশী লোক। চলিতে চলিতে মরুভূমির ধূলায় তাঁহাদের চোখ অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল, জলের কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের ঘোড়াগুলি একে একে পড়িয়া মরিল, সঙ্গের ছাগল ভেড়াগুলিও দুর্ব্বল হইয়া মরিতে

লাগিল, তার উপর কোথা হইতে একরকম মাছি আসিয়া দেখা দিল, তাহার কামড়ের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকে। খাবার জিনিষ যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন সঙ্গের দুটি লোক ব্যাক্স্টারকে মারিয়া খাবার চুরি করিয়া পলাইল। একজন মাত্র দেশী লোক সঙ্গে লইয়া আয়ার চলিতে লাগিলেন। একটি ঘোড়া তখনও বাঁচিয়াছিল, তাঁহারা সেইটিকে মারিয়া তার কাঁচা মাংস খাইলেন। সেই মাংসও যখন পচিয়া উঠিল তখন কেবল এক এক মুটা ময়দা জলে গুলিয়া তাহতেই একদিনের আহার চালাইতে লাগিলেন। শেষটায় এমন দিন আসিল যখন ময়দাও ফুরাইয়া গেল। সেদিন খালি পেটে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা এক অজানা সমুদ্রের ধারে আসিয়া দেখেন কোথা হইতে এক জাহাজ আসিয়াছে, আর কতগুলি ফরাসী নাবিক নৌকায় করিয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছে! আয়ার অবাক, নাবিকেরাও অবাক! এমনি করিয়া মরিতে মরিতে আয়ার বাঁচিয়া গেলেন।

আয়ারের পর ডাক্তার লাইক্‌হার্ড ঐ মরুভূমি পার হইতে গিয়া দলে বলে মারা পড়েন। কাপ্তান ষ্টার্ট আরেকবার চেষ্টা করিতে গিয়া অন্ধ হইয়া যান। ম্যাক্‌ডুয়াল ষ্টুয়ার্ট দুইবার চেষ্টা কয়িয়া দুই বারই মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আসেন। আরও অনেকে আধপথ সিকিপথ গিয়া আর যাইতে পারে নাই। তারপর বার্ক্ আর উইলস্ এক প্রকাণ্ড দল লইয়া বাহির হ'ন। মরুভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়া তাহার ধারে আড্ডা বসান হইল এবং বার্ক আর উলইস্ আর দুইজন ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাঁহারা গিয়াছিলেন ভালই কিন্তু ফিরিবার সময় খাবার ফুরাইয়া গিয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিল। তাঁহারা যতদিনের হিসাব করিয়াছিলেন, পথে নানা গোলমাল হইয়া তাহার তিন চারগুণ সময় লাগিয়া গেল।

আড্ডায় ফিরিতে যখন আর চার দিন মাত্র বাকী তখন ঐ চার জনের মধ্যে একজন অবসন্ন হইয়া মারা গেল। বাকী তিন জন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে কবর দিতে তাহাদের সমস্ত দিন লাগিল। এই দেরীতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। চার দিন পরে কোন রকমে পথ পার হইয়া যখন আড্ডায় পৌঁছিল, তখন দেখিল সেখানকার লোকজন তার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া সে আড্ডা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আর কয়েক ঘণ্টা আগে আসিলেই তাহাদের এ সর্ব্বনাশ হইত না। তিন জনেই তখন অবসন্ন—আর চলিবার শক্তি নাই। তাহারা কোন রকমে উঠিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল—যদি দলের দেখা পায়। এরকম করিয়া আর কতদিন চলা যায়। খানিক পথ গিয়া উইল্‌স্ এক

গাছতলায় শুইয়া পড়িল। সেই তার শেষ শোয়া। একে নিজেদের কষ্ট, তার উপর



বন্ধুর এই অবস্থা—বার্ক আর কিং পাগলের মত হইয়া আহার খুঁজিতে বাহির হইল। কোন রকমে দুই মাইল গিয়া বার্কও পথের পাশেই মরিয়া পড়িল। তারপর কিং একাই ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় সে-দেশী খাবারের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। পরে যখন আড্ডার লোকেরা তাহাদের উদ্ধারের জন্য লোক পাঠাইল, তখন তাহারা দেখিল একটা নদীর ধারে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা, পাগলের মত চেহারা, ধূলামাখা জটাচুল একটি লোক বসিয়া আছে—অনেক কষ্টে তাহারা চিনিতে পারিল, এই লোকটিই কিং!

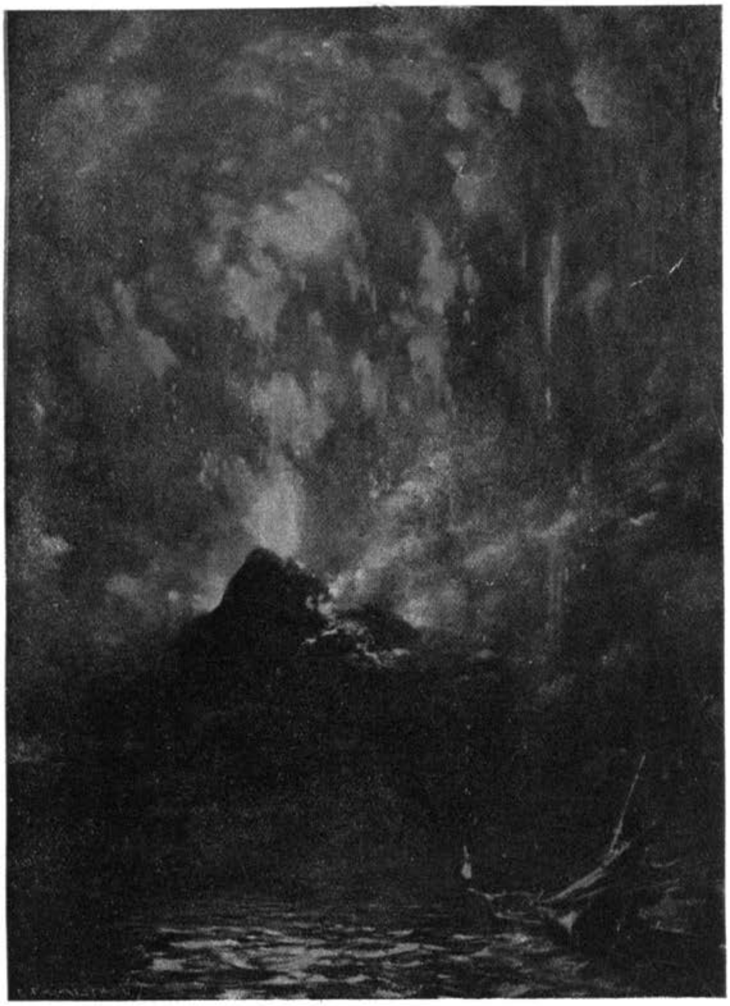
ভয় কিসের?

ভয় পেয়োনা ভয় পেয়োনা—আমি তোমায় মারব না,
সত্যি বল্‌ছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পার্‌ব না!

মনটা আমার বড্ড ভাল, হাড়ে আমার রাগটি নেই—
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না,
জান না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্ত্তে এস, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখ্‌ব তোমায় রাত্রি দিন!



হাতে আমার মুগুর আছে, তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?
এ মুগুর যে বড্ড নরম, মার্‌লে তোমার লাগ্‌বে না!
অভয় দিচ্ছি শুন্‌ছ না যে? ধর্‌ব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বস্‌লে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝ্‌বে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।



ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ড।



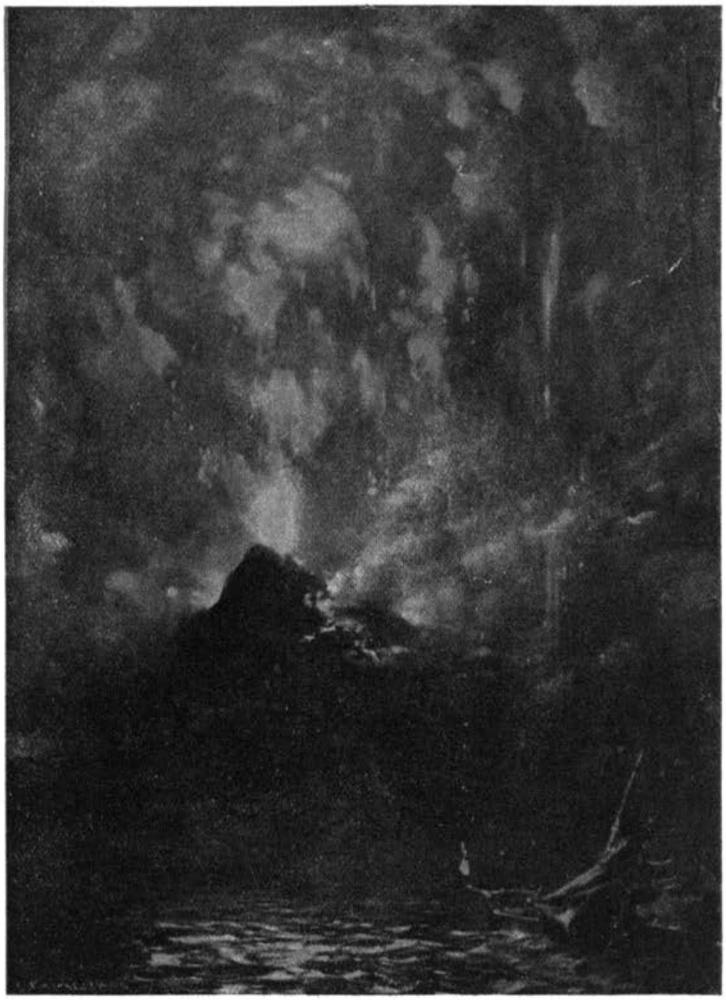
ষষ্ঠ বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩২৫   চতুর্থ সংখ্যা

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে ক'ন "বল্‌তে পারিস্ সূর্য্যি কেন ওঠে ?
"চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হ'য়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

খানিক বাদে কহেন বাবু "বল্‌ত দেখি ভেবে
"নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হ'তে নেবে ?
"বল্‌ত কেন লবনপোরা সাগরভরা পানি ?"
মাঝি সে কয় "আরে মশাই অত কি আর জানি ?"
বাবু বলেন "এই বয়সে জানিসনেও তাকি ?
"জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি"।

আবার ভেবে কহেন বাবু "বল্‌ত ওরে বুড়ো,
"কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো ?



ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ড।

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৫ | চতুর্থ সংখ্যা

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে ক'ন "বল্‌তে পারিস্ সূর্য্যি কেন ওঠে?
"চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হ'য়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

খানিক বাদে কহেন বাবু "বল্‌ত দেখি ভেবে
"নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হ'তে নেবে?
"বল্‌ত কেন লবনপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি সে কয় "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন "এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
"জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি"।

আবার ভেবে কহেন বাবু "বল্‌ত ওরে বুড়ো,
"কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?

"বল্‌ত দেখি সূর্য্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে "আমায় কেন লজ্জা দে'ছেন হেন?"
বাবু বলেন "বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকো খানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে ক'ন "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
"ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মর্‌ব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায় "সাঁতার জান?" মাথা নাড়েন বাবু,—
মূর্খ মাঝি বলে "মশাই, এখন কেন কাবু?
"বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব ক'রো পিছে,
"তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

বীরক।

(মৎস্য পুরাণ)

সেকালে একদিন মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতে মন্দিরের মেঝেতে বসিয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভারি একটা কোলাহল শুনিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কিসের শব্দ?" মহাদেব বলিলেন—"ও কিছু নয়। আমার গণেরা পর্ব্বতে খেলা করিতে করিতে কোলাহল করিতেছে—ইহা তাহারই শব্দ।" এই কথা শুনিয়া দেবীর অতিশয় কৌতূহল হইল, তিনি জানালায় গিয়া গণদিগের খেলা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গণদিগের মধ্যে একটি নিতান্ত বালক—লাল টুকটুকে তাহার মুখখানি, চেহারাটি ভারি সুন্দর, দেখিলেই স্নেহ হয়। তিনি মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ বালক গণটি কে, উহার নাম কি?" মহাদেব বলিলেন—"এই বালকের নাম বীরক, আমি ইহাকে বড় ভালবাসি। এই বালকের অনেক গুণ আছে, অন্য সব গণেরা ইহাকে খুব সম্মান করে।"

বীরককে দেখিয়াই তাহার প্রতি পার্ব্বতীর স্নেহ হইয়াছিল; তখন তিনি বলিলেন—"এই বালক আমার পুত্র হইলে সুখী হইতাম।" মহাদেব বলিলেন—"তবে বীরক

তোমার পুত্রই হউক—বীরকও তোমার মত মা পাইয়া কৃতার্থ হইবে"। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তখনই সখী বিজয়াকে পাঠাইয়া বীরককে ডাকিয়া আনিলেন। বীরক আসিলে দেবী তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর করিলেন আর বলিলেন—"বাছা! মহাদেব তোমাকে আমায় দান করিয়াছে। এখন হইতে আমি তোমার মা হইলাম।" তখন হইতে দেবী বীরককে ভারি আদর যত্ন করেন, সর্ব্বদা তাহাকে নিকটে রাখেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারেন না। বীরকও দিনে দিনে তাঁহার নিতান্ত বশ হইয়া পড়িল।

এই ভাবে কিছু দিন গেলে পর হঠাৎ এক দিন এক দুর্ঘটনা উপস্থিত! পার্ব্বতী পূর্ব্বে ছিলেন শ্যামবর্ণা; একদিন আমোদ করিতে করিতে মহাদেব তামাসা করিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—"তুমি অসিতবর্ণা" (কাল)। একথায় দেবীর কিন্তু ভারি রাগ হইল। তিনি বলিলেন—"বটে! তোমার জন্য কত তপস্যা করিয়াছিলাম আর তুমি বুঝি এখন তাহার এই পুরস্কার দিলে? যাহা হউক আমার এই শ্যামবর্ণ শরীর এখনই বিসর্জ্জন করিব!"

দেবীর অভিমান দেখিয়া মহাদেব ভাবনায় পড়িলেন। তিনি কত মিনতি করিলেন, কত ক্ষমা চাহিলেন কিন্তু তবু দেবীর রাগ গেল না। তখন মহাদেবও একটু গরম হইয়া বলিলেন—"অন্যায় স্বীকার করিলাম, এত সাধাসাধি করিলাম, তবু তোমার রাগ গেল না? তা ত হবেই! পর্ব্বতের মেয়ে কি না, তাই মনটা একেবারে পাথরের মত কঠিন! আর সেই জন্যই শরীরের রংটাও পাথরেরই মত! হিমালয়ের সব গুণগুলিই পাইয়াছ দেখিতেছি!" তখন দেবী আরও রাগিয়া বলিলেন—"বৃথা কেন গুরুজনদিগের নিন্দা করিতেছ? তোমার নিজের কি কোন দোষ নাই? সাপ লইয়া থাক, তাই সাপের মত তোমার কুটিল মন। শরীরে ভস্ম মাখ তাই মনে স্নেহ মমতা নাই। বলদ তোমার বাহন, সেজন্য তোমার বুদ্ধিও জড় পদার্থের মত হইয়া গিয়াছে! যাহা হউক, তোমার সঙ্গে আর বেশী তর্ক করিয়া কোন ফল নাই।" এই বলিয়া দেবী রাগে গর গর করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

এমন সময় বীরক আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল—"মা! কি হইয়াছে? আপনি রাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনি চলিয়া গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আর তাহা না হইলে এই পর্ব্বত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব তাহা নিশ্চিত জানিবেন।" দেবী বীরকের মুখখানি ধরিয়া আদর করিয়া

বলিলেন—"বাবা! তুমি দুঃখ করিও না। আমার সঙ্গে যাইবার কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার দরকার নাই। মহাদেব মিছামিছি আমাকে 'কাল' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব আমি বনে গিয়া তপস্যা করিয়া গৌরবর্ণ হইব। তুমি এখানে থাকিয়া সর্ব্বদা পাহারা দিবে, যেন অন্য কেহ মহাদেবের নিকটে না যায় আর তাঁহার কোন অনিষ্ট না করে। কেহ ভিতরে গেলে তখনই আমাকে সংবাদ দিবে।" এই বলিয়া পার্ব্বতী তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে অন্ধক নামক এক মহা বলবান দৈত্যকে মহাদেব বধ করিয়াছিলেন। অন্ধকের পুত্র আড়ি দৈত্য পার্ব্বতীর তপস্যার কথা জানিতে পারিয়া, পিতৃশত্রু মহাদেবের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় কৈলাস পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত! আসিয়াই দেখিল মন্দিরের দরজায় বীরক প্রহরী। দেখিয়া তাহার মনে ভাবনা হইল। পুর্ব্বে অন্ধক দৈত্যকে মহাদেব বধ করিলে, এই আড়ি দৈত্য ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে অমর হইবার বর প্রার্থনা করে। কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে সে বর দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন আড়ি দৈত্য বলিল—"আচ্ছা প্রভু! তবে আমার রূপ না বদলাইলে যেন আমার মরণ না হয়—আমাকে এই বর দিন।" ব্রহ্মা তাহাকে সেই বরই দিলেন। আড়ি দৈত্যও তখন ঐরূপ বরই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল। এখন বীরককে দরজায় প্রহরী দেখিয়া সে মনে করিল সাপের রূপ ধরিয়া ঘরে ঢুকিবে, আর এই রূপ বদ্‌লাইতে হইবে ভাবিয়াই তাহার মনে চিন্তা হইয়াছিল। যাহা হউক সাপের বেশে বীরককে ফাঁকি দিয়া দুষ্ট দৈত্য মহাদেবের পুরীতে ঢুকিল! বীরক বেচারি এই ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এদিকে পুরীতে প্রবেশ করিয়াই দুষ্ট দানব ঠিক পার্ব্বতীর মত রূপ ধরিল। দানবী মায়ার বলে সে অবিকল পার্ব্বতীই সাজিল কিন্তু মুখের মধ্যে ভারি শক্ত এবং ধারাল কয়েকটা দাঁত রাখিয়া দিল—মহাদেবকে কামড়াইয়া মারিবে। তারপর যখন মহাদেবের নিকটে গেল তখন তিনি মনে করিলেন সত্য সত্যই পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর ভারি খুসী হইয়া বলিলেন—"এত দিনে বুঝিলাম তুমি বাস্তবিকই আমাকে ভালবাস। তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল।" ইহা শুনিয়া দুষ্ট দানব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি গৌরবর্ণ পাইবার জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কথা মনে করিয়া সেখানে আমার আর ভাল লাগিল না। তাই ফিরিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া মহাদেবের মনে কেমন জানি সন্দেহ হইল! তিনি ভাবিলেন—"এ বড় আশ্চর্য্য কথা! পার্ব্বতী তপস্যার জন্য গেলেন আর তাহা শেষ না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার মন ত এরূপ দুর্ব্বল নয়।" এই চিন্তা করিয়া মহাদেব পার্ব্বতীরূপী দৈত্যের বাঁ পাশে চাহিলেন। পার্ব্বতীর বাঁ পাশে পদ্মচিহ্ন ছিল কিন্তু দেখিলেন—এ পার্ব্বতীর সে চিহ্ন তাই। তখন ছদ্মবেশী দানবের মায়া বুঝিতে পারিয়া বজ্রাস্ত্র দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিলেন।

মহাদেব স্ত্রীবেশী দানবকে মারিলে পর, সমস্ত ঘটনা না জানিয়াই পবনদেব দূত পাঠাইয়া এই সংবাদ পার্ব্বতীকে জানাইলেন। শুনিয়া দেবীর রাগ হইবার ত কথাই, আর দুঃখও হইল যথেষ্ট। তিনি বীরককে গুরুতর শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে গিয়া, রুক্ষা, বৃদ্ধা এবং পাথরের মত কঠিন—এমন মায়ের পুত্র হও।" তারপর ব্রহ্মার বরে গৌরবর্ণ পাইয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন বীরক তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিল না এবং পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে তুমি? শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিব। পার্ব্বতীর রূপ ধরিয়া এক দুষ্ট দানব ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, মহাদেব জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিয়াছেন। তারপর অত্যন্ত রাগিয়া আমাকে বলিয়াছেন—'পাহারায়, তোমার মনোযোগ নাই—যে ইচ্ছা সে ভিতরে চলিয়া আসে। সাবধান! এরূপ করিলে দরজায় থাকিতে দিব না।' মহাদেবের এই কথায় আমি সাবধান হইয়াছি। অতএব তোমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিব না, শীঘ্র চলিয়া যাও। আমার মা পার্ব্বতীই শুধু এখানে প্রবেশ করিতে পারেন, অন্যের অধিকার নাই।"

ইহা শুনিয়া দেবীর যা দুঃখ! তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বায়ু তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন এবং তিনি মিছামিছি বীরককে শাপ দিয়াছেন। যাহা হউক তিনি ভারি লজ্জিত হইয়া বীরককে বলিলেন—"বাছা বীরক! আমার গৌরবর্ণ দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছ না—আমি যে তোমার মা 'পার্ব্বতী'—ব্রহ্মার বরে গৌরবর্ণা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আর 'মহাদেবের মন্দিরে বাহিরের স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়াছে' এই ভুল সংবাদ পাইয়াই তোমাকে শাপ দিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমার সে শাপ বেশী দিন থাকিবে না।" তখন দেবী পার্ব্বতীকে চিনিতে পারিয়া বীরকের আনন্দ দেখে কে! সে দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ঘটক ও বাঘ

(সাঁওতালী গল্প)

এক ঘটক একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কিছুদিন দুই গ্রামের মধ্যে যাওয়া আসা কর্‌ছিল। সে যে পথে যেতো তার খানিকটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। একদিন সে কনের বাড়ী যাচ্ছে, সঙ্গে করে একটা মস্ত থলে নিয়েছে, সেখান থেকে কিছু ধান চাল নিয়ে আস্‌বে। যেতে যেতে সেই জঙ্গলের মধ্যে যখন এসেছে, তখন হঠাৎ তার সাম্‌নে একটা বাঘ এসে উপস্থিত! ঘটকের ত চক্ষুস্থির! যাহোক্ সে তবু খুব ভরসা করে বল্‌ল—"বাঘ ভাই, দোহাই তোমার! আমাকে খেয়ো না। আমার হাতে বড্ড জরুরি একটা কাজ আছে—আমি এক জায়গায় ঘটকালি কর্‌তে যাচ্ছি"। বাঘ বল্‌ল—"সে কি রকম?" ঘটক বল্‌ল—"তাও জান না? একজন মানুষকে দুজন করতে যাচ্ছি"।

ঘটকের কথায় বাঘ ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—"সে রকম হয় নাকি? আচ্ছা তাহ'লে আমাকেও যদি দুজন করে দিতে পার তবে তোমাকে খাব না।" ঘটক বল্‌ল—"এটা আর কত বড় কথা! গ্রামশুদ্ধ কত লোককে জোড়া বানিয়ে দিয়েছি, তোমাকে আর পার্‌ব না? তবে কি না, তোমাকে একটা কাজ কর্‌তে হবে—আমার এই থলেটার মধ্যে একবার ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাক্‌তে হবে। নড়া চড়া কর্‌লে কিন্তু মন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে।"

বাঘ বল্‌ল—"আচ্ছা, এখনই ঢুক্‌ছি আর চুপ করেও থাক্‌ব। আর যদি কথামত কাজ কর্‌তে পার তবে সব বাঘেদের বলে দিব—তারা কোন ঘটককে কোন দিন খাবে না।" এই বলেই বাঘ থলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। অমনি ঘটকও আচ্ছা করে কসে থলের মুখটি বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর সেটাকে কাঁধে করে একটা নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত! সেখানে থলেটাকে খুব করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল।

থলে নদীর জলে স্রোতে ভেসে চলেছে। খানিক দূরে নদীর ধারে এক বাঘিনী বসে ছিল্। থলেটা ভাস্‌তে ভাস্‌তে যখন তার সমুখ দিয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে দেখে বাঘিনী মনে কর্‌ল—ওটা বুঝি মরা গরু ভেসে যাচ্ছে। অমনি জলে লাফিয়ে পড়ে সেটাকে ডাঙ্গায় তুলে আন্‌ল। পরে দাঁত দিয়ে তাঁর বাঁধন ছিঁড়বা মাত্র দেখ্‌ল ভিতরে একটা বাঘ। বাঘটাও বেরিয়ে এসে বাঘিনীকে দেখেই ত অবাক! সে ভাবল,

ঘটক ত ঠিক বলেছে! তখন সে বাঘিনীকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌ল—"দেখ্‌লে ঘটকের



মন্ত্রের জোর। এই ত আমি একা ছিলাম, আর এই দেখ তোমায় নিয়ে দুজন হ'লাম!" বাঘিনী তখন খুসী হয়ে বাঘকে বিয়ে কর্‌ল। তারপর বনের সব বাঘকে ডেকে তারা সমস্ত ঘটনা বলে বুঝিয়ে দিল ঘটকঠাকুরের কি আশ্চর্য্য শক্তি! তখন থেকে নাকি সত্যি সত্যি বাঘেরা ঘটকদের কোন অনিষ্ট করে না। কোন ঘটককে কোন দিন বাঘে খেয়েছে একথা কেউ শুনেছ কি?

এ দিকে বাঘের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ঘটক মহা খুসী হয়ে গিয়ে তার কাজ শেষ কর্‌ল। কিন্তু পরের বছর যখন সে আর একটা ঘট্‌কালি কর্‌তে গিয়ে একদিন সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন ঠিক সেই বাঘটাই হঠাৎ তার সাম্‌নে পড়ে গিয়েছে! ঘটক জানত, বাঘ নদীর জলে ডুবে মরেছে। এখন সেটাকে হঠাৎ আবার সাম্‌নে দেখে সে ভয়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্! বাঘও "আরে ঠাকুর পালিও না, ভয় নাই, একটা কথা শুনে যাও" বলে অনেক ডাকাডাকি করতে লাগ্‌ল। তাই শুনে ঘটক থেমে দাঁড়াল। তখন বাঘ জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি ভাই! আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না?" ঘটক একেবারে অস্বীকার করে বল্‌ল—"না, তোমাকে কোন দিন দেখেছি বলেও ত মনে পড়ে না!" বাঘ বলিল—"আরে আমি যে সেই বাঘ—তুমি যাকে গেল বছরে দুজন বানিয়ে দিয়েছিলে—তোমার মন্ত্রের খুব জোর বটে! যাহোক্, তার দরুণ তোমাকেত দক্ষিণা

দেওয়া হয় নি। আচ্ছা, তুমি কি চাও বল দেখি। গরু হরিণ মহিষ হাতী কিংবা অন্য কোন জন্তু—তুমি যা চাও তাই একটা মেরে এনে দিব।"

তখন ঘটক ভারি খুসী হয়ে ভাব্‌ল—এত মন্দ নয়! সে বল্‌ল—"আচ্ছা তবে আমাকে একটা নীলগাই হরিণ দাও।" বাঘ বল্‌ল—" বেশ কথা! কাল বিকেলে ঐ গাছটার তলায় এলেই দেখ্‌তে পাবে একটা নীলগাই রয়েছে।"

পরদিন বিকালে সেই গাছের তলায় এসে ঘটক দেখ্‌ল বাস্তবিকই একটা সুন্দর নীলগাই রয়েছে। সেটাকে বাড়ী এনে সকলে মিলে কত যে ফূর্ত্তি করে হরিণের মাংস খেল, আর বাঘকে কত যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ল, তা কি বল্‌ব!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

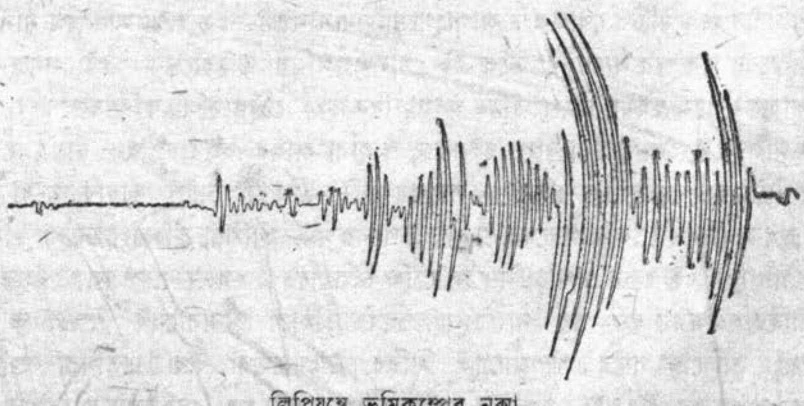
ভূমিকম্প

দুপুর বেলায় দিব্য আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দুরদুর দুরদুর করিয়া ঘর বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন পাখা সব দুলিতে লাগিল, তার পর খাট চৌকি সবশুদ্ধ খটাখট্‌ করিয়া এমন ঝাঁকানি লাগাইয়া দিল যে আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। ততক্ষণে চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, শাঁখ কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছে আর সকলেই বলিতেছে "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প"। পরের দিন কাগজে ভূমিকম্পের নানারকম বর্ণনা বাহির হইল—কেমন করিয়া বড় বড় গির্জ্জার চূড়াগুলি দুলিতে দুলিতে পড়' পড়' হইয়াছিল, কেমন করিয়া হাইকোর্টের জজসাহেব হইতে উকীল বারিষ্টার পেয়াদা পর্য্যন্ত সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া দোকানের বাবুরা আর আফিসের বড় বড় সাহেবেরা দোকানপাট কাগজপত্র সব ফেলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল—ইত্যাদি অনেক কথা। আর জানা গেল এই যে, কেবল যে কলিকাতেই ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা নয়, বাংলার নীচুজমি হইতে আসামের পাহাড় পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই সেই এক কাঁপুনি!

শাস্ত্রে যে বলে পৃথিবীটা স্থির আর 'অচলা,' পণ্ডিতেরা সে কথা অনেক দিনই মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবী যে শূন্যের মধ্যে প্রকাণ্ড চক্র আঁকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ছুটিয়া চলে, এবং চলিতে চলিতে লাটিমের মত ঘূরপাক খায়, এসকল কথা আমরা সকলেই জানি। সে চলুক আর ঘুরুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কারণ সেটা

আমরা টের পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আবার গা-ঝাড়া দেয় কেন? পাহাড় পর্ব্বত কাঁপাইয়া, জমি জাঙ্গাল ফাটাইয়া, বাড়ী ঘর দোর উল্টাইয়া, এ আবার কেমন উপদ্রব? সেদিন যে ভূমিকম্প হইল, সে ত নেহাৎ সামান্য রকমের। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে অনিষ্ট করিয়াছিল আরও অনেক বেশী। সেবারে পূর্ব্ব বাংলায় আর আসামে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল, এবং কলিকাতা সহরেও বড় বড় কোঠা দালান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর রেলপুল টেলিগ্রাফের থাম কত যে নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

"ভূমিকম্প" মানে মাটির কাঁপুনি। এ কাঁপুনি ত বলিতে গেলে রোজই কতবার করিয়া হইতেছে। রাস্তা দিয়া দমকল ছুটিয়া গেল, ঘোড়সোয়ার পল্টন গেল, মাটি গুম্ গুম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমন কি একজন মোটা লোক যদি সিঁড়ি দিয়া উৎসাহ করিয়া নামিতে যায়, তাহাতেও বাড়ীর ভিতরে ছোট খাট রকমের "ভূমিকম্প" হয়। যদি বেশ সূক্ষ্ম রকম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে পাশের ঘরে বিড়াল হাঁটিয়া গেলে এই ঘরে তাহার চলাফিরার সাড়া পাইবে। কিন্তু ভূমিকম্প বলিতে আমরা এরকম কাঁপুনি বুঝি না। মাটির ভিতর হইতে যে ধাক্কা আসে, মাটির তলে তলে যাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই নাম ভূমিকম্প। কোথায় খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে মাটির নীচে কোন্ গভীর তলে একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে আর সমস্ত বাংলা দেশটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সিমলা পাহাড়ে আর লঙ্কা দ্বীপে পর্য্যন্ত



লিপিযন্ত্রে ভূমিকম্পের নক্সা

(Seismograph) কম্পনলিপি যন্ত্রে তার স্পষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক,

যাঁরা এই সকল সূক্ষ্মযন্ত্রের হিসাব লইয়া কারবার করেন, তাঁহারা বলেন প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে ছোট বড় নানা রকমের ভূমিকম্প চলিতেছে। কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্‌কো নগরে বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল, তখন এখানকার যন্ত্রে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কম্পনলিপিযন্ত্রের কাঠি একটা কাগজের উপর সাদা আঁচড় কাটিয়া চলে। যতক্ষণ ভূমিকম্পের গোলমাল না থাকে, ততক্ষণ সে বরাবার সোজা রকমের রেখা টানিয়া যায়, কিন্তু মাটির তলায় কোথাও যদি ভূমিকম্পের ছোঁয়া লাগে, অমনি কলের কাঠি বিগড়াইয়া হিজিবিজি আঁচড় কাটিতে আরম্ভ করে।

বাহির হইতে এই মাটির দিকে চাহিয়া দেখ, মনে হয় তাহার মত অটল স্থির আর কিছুই নাই। চারিদিকে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ খ্যাপার মত লাফালাফি করিতেছে, মাথার উপরে চঞ্চল বাতাস দিনরাত ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু পৃথিবী—সে ধীর গম্ভীর নিশ্চল। বড় বড় গাছপালা হইতে সামান্য ঘাসটা পর্য্যন্ত তাহার গায়ে শিকড় বসাইয়া তাহার বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে—পৃথিবী তাহাতে আপত্তিও করে না বাধাও দেয় না। কিন্তু, কেবল বাহিরের মূর্ত্তি না দেখিয়া যদি একবার গভীর মাটির নীচে ঢুকিতে পার তবে বুঝিবে তার ভিতরটায় কেমন তোলপাড় চলিতেছে। সেখানে গেলে মনে হইবে পৃথিবীর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে, যতই তার ভিতরে ঢুকি ততই গরম। সেই গরমে পাথর পর্য্যন্ত গলিয়া যায়, তুমি আমি ত এক মুহূর্ত্তেই ঝামা হইয়া পুড়িয়া যাইব।

পৃথিবীর এই মাটির খোলসটি আগাগোড়া সমান নয়। কত লক্ষ লক্ষ যুগ নানা রকম পাথর স্তরের পর স্তর সাজাইয়া তবে এই খোলস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কঠিন স্তর আগুনে গরম হইয়া, চাপে কঠিন হইয়া, দিনরাত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোথাও পাথর গলিয়াছে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়াছে, তাহারা বাহির হইবার পথ চায়; কোথাও মাটির নীচে বড় বড় ফাটল রহিয়াছে, পাশের মাটি উপরের চাপে তাহার মধ্যে ধসিয়া পড়ে; কোথাও নীচেকার গরমের ঠেলায় উপরের মাটি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। দিনরাত যুগের পর যুগ এই রকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। গরম বাষ্প আর গলিত পাথর যদি বাহির হইবার সহজ পথ না পায় তবে তাহারা অনায়াসেই একটা ভূমিকম্প বাধাইয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয় গিরির উৎপাতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এইসব পাহাড়ের উৎপাত সকলের চাইতে সাংঘাতিক হয় সেই সময়ে, যখন পাথর জমিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভিতরের আগুন আর বাহির হইবার

পথ পায় না, কেবল তাহার চাপ জমিয়া জমিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। ভিস্থভিয়াসের অত্যাচারে পম্পিয়াই সহর ধ্বংস হইবার আগে এই রকম একটা কাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে পাহাড় দেখিতে বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কয়েকবৎসর ধরিয়া গুম্ গুম্ শব্দ শুনা যাইত, মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মাটি কাঁপিয়া উঠিত, আর ঘন ঘন ভূমিকম্প হইত। কিন্তু সে সময়ে মানুষ বুঝিতে পারে নাই যে এই সমস্তই পাহাড় ফাটাইবার আয়োজন। এইরূপে ভিতরের চাপ জমিয়া জমিয়া এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, যে পাহাড় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—জ্বলন্ত পাথর পাহাড় ভেদ করিয়া ফোয়ারার মত ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

একএকটা আগুনের পাহাড়কে অনেকদিন চুপচাপ থাকিতে দেখিয়া কত সময়ে লোকে মনে করে তাহার ভিতরকার আগুণ মরিয়াছে—কিন্তু আবার যখন সে কুম্ভকর্ণের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠে, তখন মানুষের আতঙ্কের আর সীমা থাকে না। এই রকম যত উৎপাতের কথা শুনা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ডই সকলের চাইতে ভয়ানক। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মাঝামাঝি একটা দ্বীপ আছে তাহারই নাম ক্রাকাতোয়া। সেই দ্বীপের মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড় ছিল—এককালে তাহার মাথায় আগুন দেখা যাইত। দুই শত বৎসর ধরিয়া সেই পাহাড় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এই সুযোগে তাহার চারিদিকে গাছপালা গজাইয়া রীতিমত বন জঙ্গল দেখা দিয়াছিল। এমন সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সে কম্প এক একটি বড় সামান্য নয়, কারণ সমুদ্র পার হইয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তাহার ধাক্কা পৌঁছিত। তিন বৎসর ভূমিকম্পের পর সহস্র কামান গর্জ্জনের মত ভীষণ শব্দে পাহাড় ভেদ করিয়া আগুন আর গরম বাষ্পের প্রকাণ্ড স্তম্ভ বাহির হইল। সেই স্তম্ভ সাত মাইল উঁচু হইয়া চারিদিকে গরম ধূলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে লাগিল। এইরূপে তিন মাস পাথর বৃষ্টি করিয়াও পাহাড়ের তেজ কমিল না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট সন্ধ্যার পরে সমুদ্র হইতে জাহাজের নাবিকেরা দেখিয়াছিল, পাহাড়ের চারিদিকে লাল ধোঁয়ায় আকাশ ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আগুনের গোলা ছুটিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, এবং ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। তাহার পরদিন ভোর বেলা একশত মাইল দূরে বাটাভিয়া সহরে গরম ধূলার বৃষ্টি হইল এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসম্ভব ভয়ঙ্কর শব্দে ক্রাকাতোয়ার প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে উড়িয়া গেল। আট মাইল ডাঙ্গা বেমালুম শূন্যে

মিলাইয়া গেল, গভীর সমুদ্র আসিয়া তাহার স্থান দখল করিল। সেই শব্দের ধাক্কা তিন হাজার মাইল দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, আকাশ তোলপাড় করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় বাতাসের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হাজার হাজার মণ পাথর চূর্ণ হইয়া ধূলার মত আকাশের দিগ্‌দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশে উদয়াস্তের সময় আশ্চর্য্য রঙেরখেলা দেখাইয়াছিল।

এখানেও তাহার শেষ হয় নাই; পাহাড় ফাটিবার সময়ে সমুদ্রের ভিতর পর্য্যন্ত আগুন ঢুকিয়াছিল, এবং ভীষণ ভূমিকম্পে গভীর সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উপর যখন পাহাড় উড়িয়া দূরে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল, তখন সমুদ্র একেবারে প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ফুলিয়া পাহাড়সমান উঁচু হইয়া, ডাঙ্গার উপর ছুটিয়া পড়িল। সহর গ্রাম ঘর বাড়ী গাছপালা চক্ষের পলকে কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ে, অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর সুণ্ডা প্রণালীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ এমন বেগে আসিয়াছিল যে একটা জাহাজকে পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে তিন মাইল দূরে শুক্‌না ডাঙ্গার উপরে! ইহার তুলনায় আমাদের সেদিনকার ভূমিকম্পটাকে অবশ্য নিতান্তই সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। তাহার সঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি, পাহাড় বৃষ্টি, বা সমুদ্রের ঢেউ এসব কোন হাঙ্গামা ছিল না।

পৃথিবীর মাটি কোঁকড়াইয়া বড় বড় পাহাড় পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়। সেই সব পাহাড় উঠিবার সময়ে মাটির স্তরগুলাকে বাঁকাইয়া ফাটাইয়া ভাঙিয়া উলট পালট করিয়া দেয়। যে মাটি সমানভাবে শোয়ান ছিল তাহাকে খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। কঠিন পাথরকে ঠেলিয়া নরম মাটির মধ্যে বসাইয়া দেয়, নরম মাটিকে চাপ দিয়া পাথরের ফাটলে ফোকরে ঢুকাইয়া দেয়, পাথরের গায়ে পাথরকে পিষিয়া ভাঙ্গিতে চায়। এইরূপে সমস্তে মিলিয়া এমন চাপা চাপি করিয়া থাকে যে, কোথাও এতটুকু স্তর খসাইতে গেলে সমস্ত পাহাড়শুদ্ধ টলমল করিয়া উঠে। এই সকল কাণ্ড প্রতি মুহূর্ত্তেই চলিয়াছে। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ পাহাড়ের স্তর সরিয়া সরিয়া একদিন হয়ত একেবারেই বেসামাল হইয়া টলিয়া পড়িল; নরম মাটির ভিতর পাহাড় বসিতে বসিতে একদিন হঠাৎ পিছলাইয়া ধসিয়া গেল; দুইদিকের উল্টাচাপে ফুলিতে ফুলিতে একদিন পাহাড়ের দেমাক ফাটিয়া চৌচির হইল, এই রকমে বহুদিনের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি এক্ এক দিন হঠাৎ ভূমিকম্পের আকারে গাঝাড়া দিয়া বাহির হয়।

ভূমিকম্পের ধাক্কা মাটির ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে কেমন করিয়া পৃথিবী টলমল করিতে থাকে, তাহার সামান্য একটু নমুনা তোমরা দেখিয়াছ। তাহাতে ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে, পথ ঘাট ফাটিয়া যায়, রেলের লাইন মোচড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় কুইটো সহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সহরের কোন কোন জায়গায় মানুষগুলিকে ফুটবলের মত ছুঁড়িয়া দিয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে পোর্টরয়ালের ভূমিকম্পে বাজারের ভিড়কে ছিটাইয়া নীচে বন্দরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পে নদীতে বান ডাকিয়া সহরের অসংখ্য লোককে ডুবাইয়া দিয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে সানফ্রান্সিস্‌কো সহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, সে কেবল বাড়ীঘর ফেলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই গ্যাসের নল আর বিদ্যুতের তার ভাঙ্গিয়া জড়াইয়া সে সহরে আগুন লাগাইয়া দেয়। সে এমন সর্ব্বনেশে আগুন যে সহরের সমস্ত দমকল মিলিয়াও তাহাকে কিছুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই। তার পরে সহরের কর্ত্তারা বোমাবারুদ ফাটাইয়া আগুনের আশে পাশে অনেকগুলা বাড়ী উড়াইয়া দিয়া, মনে করিলেন আগুন আর ছড়াইতে পারিবে না। কিন্তু আগুন প্রায় সিকি মাইল ফাঁকা জমী টপ্‌কাইয়া সহরের আর একদিকে ফুটিয়া বাহির হইল। যাহা হউক খানিক বাদে বাতাসের মুখ ঘুরিয়া গেল তাই রক্ষা, তা না হইলে সহরের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ।



"পথ ঘাট ফাটিয়া যায়"

ভূমিকম্পে অনেক সময়ে পাখীরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে থাকে। ডাঙ্গার জন্তু ভয়ে ছুটাছুটি আর চীৎকার করিতে থাকে। একটা হাতীর কথা শুনিয়াছি, সে ১৮৯৭

খৃষ্টাব্দের বড় ভূমিকম্পের সময়ে প্রথমটা অবাক হইয়া চারিদিক তাকাইতেছিল, তারপর কাঁপুনি যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন সে প্রাণপণে চার পা ছড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। গল্প শুনিয়াছি, একটা বাড়ীর পাঁচিলের উপরে দুইটা বেড়াল মুখামুখি বসিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, এমন সময় ভূমিকম্পের ধাক্কায় দুজনকেই পাঁচিল হইতে ফেলিয়া দেয়। সঙ্গীতচর্চ্চায় হঠাৎ এ রকম বাধা পাইয়া তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতেছিল, এমন সময় পাঁচিল ভাঙ্গিয়া দুচারখানা ইঁট পড়িতেই, তাহাদের যুদ্ধের উৎসাহ থামিয়া গেল। আর এক নাবিকের পোষা টিয়া পাখীর গল্প শুনিয়াছি, সে আশ্চর্য্যরকম কথা বলিতে পারিত। একবার ভূমিকম্পে সে খাঁচাশুদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়াছিল। পরে শোনা গেল ভাঙ্গাঘরের তলা হইতে কে যেন চীৎকার



সান্ ফ্রান্সিস্কোর ভূমিকম্প

করিয়া গালাগালি করিতেছে। তখন ইঁট সরাইয়া দেখা গেল, পাখীটা খাঁচার মধ্যে একজায়গায় কোণঠাসা হইয়া বসিয়া আছে, আর বলিতেছে "বড় গরম, বড় গরম"।

জ্বর আর মাকড়সা

(পণ্ডিত মহাশয়ের গল্প)



জ্বরের সঙ্গে মাকড়সার একদিন রাস্তায় দেখা হ'ল। মাকড়সা বল্‌ল, "কোথায় যাচ্ছ, জ্বর ভাই ?"

জ্বর বল্‌ল "গরিব চাষার বাড়ী। সে কি না ভাল ক'রে খেতে পর্‌তে পায় না; তাই তার ঘাড়ে চাপ্‌লে সে সহজে কাবু হয়ে যাবে। তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই ?"

মাকড়সা বল্‌ল, "বড়লোকের বাড়ী। তাদের বাড়ীর পোকা মাছি পিপ্‌ড়েরা ভাল ক'রে খেতে পায় কিনা, তাই সেখানে শিকার করলে খুব ভাল ভাল খাবার জুট্‌বে।" এই ব'লে যে যার আপনার পথে চ'লে গেল।

জ্বর তো গিয়ে চাষার ঘাড়ে চেপেছে। চাষা ভাব্‌ছে, "তাই তো, জ্বর নিয়ে বিছানায় প'ড়ে থাক্‌লে আর চল্‌বে কি ক'রে ? না খাট্‌লে তো রোজগারও হবে না।" অমনি সে কোদাল নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ মাটি কোপাবার ফলে তার গা' দিয়ে খুব ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌ল, আর সেই ঘামের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও ত্রাহি ত্রাহি ক'রে তাকে ছেড়ে পালাল।

জ্বর বেচারা আর করে কি ? সে বিষণ্ণ মনে বাড়ীর মুখে রওয়ানা হ'লো।

এদিকে মাকড়সাও বড়লোকের বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌ছে। সেখানে তার মোটেও সুবিধা হয় নি। দশগণ্ডা চাকর আছে—তারা রাতদিন বাড়ীটাকে ঝাড়ে মোছে। সে বেচারা যেখানে জাল বোনে, অমনি তারা এসে সে জাল ঝেড়ে ফেলে দেয়;—বাড়ীতে কোথাও জাল-ঝুল থাক্‌বার জো নাই।

ফির্‌বার পথে দু'জনের দেখা হ'ল। জ্বর বল্‌ল, "গরিব লোকের বাড়ী আমার পোষাবে না ভাই।" মাকড়সা বল্‌ল, "বড়লোকের বাড়ী আমার পোষাবে না ভাই।" তখন জ্বর বল্‌ল, "চল ভাই এক কাজ করি। তুমি যাও গরিব চাষার বাড়ী; আমি যাই বড়লোকের বাড়ী। দেখি পোষায় কিনা।"

তখন মাকড়সা গেল গরিব চাষার বাড়ী আর জ্বর গেল বড় লোকের বাড়ী।

এবার দু'জনেরই বড় মজা। মাকড়সা গিয়ে চাষার ঘরের চালের এক কোণায় জাল বুনেছে; সেখানে কোন দিনই কেউ ঝুল ঝাড়ে না; পোকা, মাছি, পিঁপ্‌ড়েরও অভাব হয় না। মাকড়সা তাদের ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে, আর ফুলে ফুলে মোটা হ'চ্ছে।

জ্বরও গিয়ে বড়লোকের ঘাড়ে চেপেছে। সে বেচারার নরম শরীর, আরাম ক'রে আদুরে গোপাল হ'য়ে প'ড়ে থাকাই তার অভ্যাস। জ্বর আস্‌তেই বেচারা একেবারে কাবু হ'য়ে পড়ল। জ্বরও দিব্যি আরামে অনেক দিন তার ঘাড়ে চেপে মনের সাধ মিটিয়ে নিল।

শ্রীসুবিনয় রায়।

নদী

কে হে তুমি ঢেউয়ে ঢেউয়ে করিছ বন্দন।
ভক্তিভরে কার দুটি অভয় চরণ॥
তব স্নিগ্ধ ক্রোড়ে কত লোক করে স্নান।
দেখিয়া তোমার শোভা মুগ্ধ মোর প্রাণ॥
তোমার উপর দিয়া চলে কত তরী।
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি॥

শ্রীঅজয়নাথ রায়চৌধুরী
(বয়স ৮ বৎসর)

আশ্চর্য্য ছবি

জাপান দেশে সেকালের এক চাষা ছিল, তার নাম কিকিৎসুম। ভারি গরিব চাষা, আর যেমন গরিব তেমনি মূর্খ। দুনিয়ার সে কোন খবরই জানত না; জানত কেবল চাষবাসের কথা, গ্রামের লোকেদের কথা, আর গ্রামের যে বুড়ো "বঞ্জে" (পুরোহিত) তার ভাল ভাল উপদেশের কথা। চাষার যে স্ত্রী, তার নাম লিলিৎসী। লিলিৎসী চমৎকার ঘরকন্না করে, বাড়ীর ভিতর সব তক্‌তকে ঝরঝরে করে গুছিয়ে রাখে, আর রান্না করে এমন সুন্দর যে চাষার মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। কিকিৎসুম কেবলই বলে "এত আমার বয়স হ'ল, এত আমি দেখলাম শুনলাম, কিন্তু রূপেগুণে এর মত আর একটি কোথাও দেখতে পাইনি।" লিলিৎসী সে কথা যত শোনে ততই খুসী হয়।

একদিন হ'য়েছে কি, কোথাকার এক সহুরে বড় মানুষ এসেছেন সেই গ্রাম দেখতে; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটি, আর মেয়েটির ছিল একটি ছোট্ট আয়না। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে আয়নাটা সেই মেয়ের হাত থেকে কখন প'ড়ে গেছে, কেউ তা দেখ্‌তে পায়নি। কিকিৎসুম যখন চাষ করে বাড়ী ফিরছে তখন সে দেখতে পেল, রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে কি একটা চক্‌চক্ করছে। সে তুলে দেখ্‌ল, একটা অদ্ভুত চ্যাপ্টা চৌকোনা জিনিষ! সে কিনা কখনও আয়না দেখেনি, তাই সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগল, এটা আবার কিরে! নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে গিয়ে হঠাৎ সেই আরসির ভিতরে নিজের ছায়ার দিকে তার চোখ পড়ল। সে দেখল কে একজন অচেনা লোক তার দিকে গম্ভীর হ'য়ে তাকিয়ে আছে। দেখে সে এমন চমকিয়ে উঠল, যে আরএকটু হ'লেই আয়নাটা তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল, এটা নিশ্চয় আমার বাবার ছবি—দেবতারা আমার উপর খুসী হ'য়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বাবা মারা গিয়েছেন সে অনেক দিনকার কথা, কিন্তু তবু তার মনে হ'ল, হ্যাঁ এই রকমইত তাঁর চেহারা ছিল। তারপর—কি আশ্চর্য্য! সে চেয়ে দেখ্‌ল তার নিজের গলায় যেমন একটা রূপার মাদুলি, ছবির গলায়ও ঠিক তেমনি! এ মাদুলিত তার বাবারই ছিল, তিনিত সর্ব্বদাই এটা গলায় দিতেন,—তবেত এটা তার বাবারই ছবি।

তখন কিকিৎসু করল কি, আয়নাটাকে যত্ন করে কাগজ দিয়ে মুড়ে বাড়ী নিয়ে এল। বাড়ী এসে তার ভাবনা হ'ল, ছবিটাকে রাখে কোথায়? তার স্ত্রীর কাছে যদি রেখে

দেয়, তবে সে হয়ত পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করবে, আর গ্রামশুদ্ধ সবাই এসে ছবি দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়বে। গ্রামের মুর্খগুলো ত সে ছবির মর্য্যাদা বুঝবে না, তারা আসবে কেবল "তামাসা" দেখবার জন্য! তা হবে না—তার বাবার ছবি নিয়ে ছেলেবুড়ো সবাই এসে নোংরা হাতে নাড়বে চাড়বে তা কিছুতেই হতে পারবে না। এ ছবি কাউকে দেখান হবে না, লিলিৎসীকেও তার কথা বলা হবে না।

কিকিৎসুম বাড়ীতে এসে একটা বহুকালের পুরান ফুলদানির মধ্যে আরসিটাকে লুকিয়ে রাখ্‌ল। কিন্তু তার মনটা আর কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না। খানিকক্ষণ পরে পরেই সে একবার করে দেখে যায় ছবিটা আছে কি না। তার পরের দিন সে মাঠে কাজ করছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হ'ল, "ছবিটা আছে ত"? অমনি সে কাজকর্ম্ম ফেলে দৌড়ে দেখ্‌তে এল। দেখে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাইরে যাবে, এমন সময় লিলিৎসী সেই ঘরে এসে পড়েছে। লিলিৎসী বল্‌ল, "একি! তুমি দুপুর বেলায় ফিরে এলে যে? অসুখ করেনি ত"? কিকিৎসুম থতমত খেয়ে বল্‌ল "না না, হঠাৎ তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ল তাই বাড়ী এলাম।" শুনে লিলিৎসী ভারি খুসী হ'য়ে গেল। তার পর আর একদিন এই রকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি দেখতে এসে কিকিৎসুম আবার তার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ুল। সেদিনও সে বল্‌ল, "তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা বার বার মনে হ'চ্ছিল, তাই একবার ছুটে দেখতে এলাম।" সে দিন কিন্তু লিলিৎসীর মনে একটু কেমন খট্‌কা লাগল। সে ভাবল, "কই, এতদিনত কাজ করতে করতে একবারও আমায় দেখতে আসেনি, আজকাল এরকম হচ্ছে কেন?"

তারপর আর একদিন কিকিৎসুম এসেছে ছবি দেখ্‌তে। সে দিন লিলিৎসী টের পেয়েও দেখা দিল না—চুপি চুপি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগ্‌ল—কিকিৎসুম সেই ফুলদানির ভিতর থেকে কি একটা জিনিষ বা'র ক'রে দেখ্‌ল, তারপর খুব খুসী হয়ে যত্ন ক'রে আবার রেখে দিল। কিকিৎসুম চলে যেতেই লিলিৎসী দৌড়ে এসে ফুলদানির ভিতর থেকে কাগজে মোড়া আরসিটাকে টেনে বার কর্‌ল। তারপর তার মধ্যে তাকিয়ে দেখে অতি সুন্দর এক মেয়ের ছবি!

তখন যে তার রাগটা হ'ল—সে রাগে গজগজ ক'রে বল্‌তে লাগল, "এই জন্যে রোজ রোজ বাড়ীতে আসা হয়—আবার আমায় বলেন, 'তোমার মুখখানা দেখতে এলাম' 'তোমার মত সুন্দর আর হয়ই না'। মাগো! কি বিশ্রী মেয়েটা! হোঁৎকা মুখ, থ্যাবড়া নাক, ট্যারচা চোখ,—আবার আমার মত ক'রে চুল বাঁধা হ'য়েছে! দেখনা কি

রকম হিংসুটে চেহারা! এই ছবি আবার আদর করে তুলে রেখেছেন—আর রোজ রোজ আহ্লাদ ক'রে দেখ্‌তে আসেন!" লিলিৎসীর চোখ ফেটে জল আস্‌ল, সে মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। তার পর চোখমুছে আর একবার আরসির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "মেয়েটার কি ছিচ্‌কাঁদুনে চেহারা—এমন চেহারাও কেউ পছন্দ করে!" সে তখন আয়নাটাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখল।

সন্ধ্যার সময় কিকিৎসুম বাড়ী এসে দেখ্‌ল, লিলিৎসী মুখ ভার ক'রে মেঝের উপর ব'সে রয়েছে। সে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল "কি হ'য়েছে?" লিলিৎসী বল্‌ল "থাক থাক, আদর দেখাতে হবে না—নাও তোমার সাধের ছবিখানা নাও। ওকে নিয়েই আদর ক'র, যত্ন ক'র, মাথায় ক'রে তুলে রাখো'। তখন কিকিৎসুম গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ল, "তুমি যে আমার ছবিকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছ—জান ওটা আমার বাবার ছবি"? লিলিৎসী আরও রেগে বল্‌ল "হ্যাঁ, তোমার বাবার ছবি! আমি কচি খুকী কিনা, একটা বলে দিলেই হ'ল! তোমার বাবার কি অম্‌নি আহ্লাদী মেয়ের মত চেহারা ছিল,? তিনি কি আমাদের মত ক'রে খোঁপা বাধ্‌তেন"—কথাটা শেষ না হ'তেই কিকিৎসুম বল্‌ল "তুমি না দেখেই রাগ করছ কেন? একবার ভাল ক'রে দেখই না।" এই ব'লে কিকিৎসুম নিজে আবার দেখল, আরসির মধ্যে সেই মুখ।



তখন দুজনের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল। কিকিৎসুম বলে ওটা তার বাবার ছবি, লিলিৎসী বলে ওটা একটা হিঁসুকুটি মেয়ের ছবি। এই রকম তর্ক চল্‌ছে, এমন সময়ে গ্রামের যে বুড়ো "বঞ্জে," সে তাদের গলার আওয়াজ শুনে দেখ্‌তে এল ব্যাপারখানা কি! পুরুত ঠাকুরকে দেখে দুজনেই নমস্কার করে তার কাছে নালিশ লাগিয়ে দিল। কিকিৎসুম বল্‌ল "দেখুন, আমার বাবার ছবি, সেদিন আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম, আর ও কিনা বলে যে ওটা

কোন্ এক মেয়ের ছবি"। লিলিৎসী বল্ল "দেখলেন কি অন্যায়! এনেছেন একটা গোমরামুখী মেয়ের ছবি, আর আমায় বোঝাচ্ছেন, ঐ নাকি তাঁর বাবা!"

তখন "বঞ্চে" ঠাকুর বল্লেন "দাওত দেখি ছবিখানা"। তিনি আরসি নিয়ে মিনিট পাঁচেক খুব গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে রইলেন। তার পর আয়নাটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বল্‌লেন "তোমরা ভুল বুঝেছ। এ হ'চ্ছে অতি প্রাচীন এক মহাপুরুষের ছবি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইনি একজন যে-সে লোক নন। দেখছ না, মুখে কি গম্ভীর তেজ, কি রকম বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য, আর কি সুন্দর প্রশান্ত অমায়িক ভাব। এ ছবিটাত এমন ক'রে রাখলে চলবেনা; বড় মন্দির গ'ড়ে, তার মধ্যে পাথরের বেদী বানিয়ে, তার মধ্যে ছবিখানাকে রাখতে হবে—আর ফুলচন্দন ধূপ ধুনা দিয়ে তার সম্মান করতে হবে।"

এই বলে "বঞ্চে" ঠাকুর আরসি নিয়ে চলে গেলেন। আর কিকিৎসুম আর লিলিৎসীও ঝগড়া টগড়া ভুলে খুসী হ'য়ে খেতে বল্‌ল।

খোঁড়া মুচির পাঠশালা

পোর্টস্‌মাউথের বন্দরে এক খোঁড়া মুচি থাকিত, তাহার নাম জন পাউণ্ড্‌স্। ছেলেবেলায় জন তার বাবার সঙ্গে জাহাজের কারখানায় কাজ করিত। সেইখানে পনের বৎসর বয়সে এক গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার উরু ভাঙ্গিয়া যায়। সেই অবধি সে খোঁড়া হইয়াই থাকে, এবং কোন ভারি কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গরীবের ছেলে, তাহার ত অলস হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে না—কাজেই জন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বুড়া মুচির কাছে জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখিতে গেল। তারপর সহরের একটা গলির ভিতরে ছোট একটি পুরাতন ঘর ভাড়া করিয়া সে একটা মুচির দোকান খুলিল।

জনের রোজগার বেশী ছিল না, কিন্তু সে মানুষটি ছিল নিতান্তই সাদাসিধা; সামান্য রকম খাইয়া পরিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। এমন কি, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে কিছু টাকাও জমাইয়া ফেলিল। তখন সে ভাবিল, "এখন আমার উচিত আমার ভাইদের কিছু সাহায্য করা"। তাহার দাদার এক ছেলে ছিল, সে ছেলেটি জন্মকাল হইতেই খোঁড়ামতন, তার পা দুইটা বাঁকা। জন দাদাকে বলিল, "এই

ছেলেটির ভার আমি লইলাম"। ছেলেটিকে লইয়া জন ডাক্তারকে দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন উহার হাড় নরম আছে, এখন হইতে যদি পায়ে 'লাস্' বাঁধিয়া রাখ, তবে হয়ত সারিতেও পারে"। সামান্য মুচি, 'লাস্' কিনিবার পয়সা সে কোথায় পাইবে? সে রাত জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতে লাস্ বানাইল এবং সেই লাস্ পরাইয়া, যত্ন ও শুশ্রূষার জোরে, অসহায় শিশুটিকে ক্রমে সবল করিয়া তাহার খোঁড়ামি দূর করিল।

ততদিনে ছেলের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে। পাউণ্ড্স্ নিজেই তাহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার প্রথম ভাবনা হইল এই যে, একা একা লেখাপড়া শিখিলে শিশুর মনে হয়ত ফূর্ত্তি আসিবে না, তাহার দুএকজন সঙ্গী দরকার। এই ভাবিয়া সে পাড়ার দুএকটি ছেলে মেয়েকে আনিয়া তাহার ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিল। দুটি একটি হইতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাতটি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও খোঁড়া মুচির মন উঠিল না—সে ভাবিতে লাগিল, "আহা, ইহারা কেমন আনন্দে উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে; কিন্তু এই সহরের মধ্যে এমন কতশত শিশু আছে, যাহাদের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না"। তখন সে আরও ছাত্র আনিয়া তাহার ছোট্ট ক্লাসটিকে একটি রীতিমত পাঠশালা করিয়া তুলিল।



যেদিন তাহার একটু অবসর জুটিত, সেই দিনই দেখা যাইত জন্ পাউণ্ড্স্ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় রাস্তায় ছেলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যত্নরাজ্যের অসহায় শিশু, যাদের বাপ নাই, মা নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া সে

তাহার পাঠশালায় ভর্ত্তি করিত। ছেলে ধরিবার জন্য তাহার প্রধান অস্ত্র ছিল আলুভাজা! প্রথমে এই আলুভাজা খাওয়াইয়া পাউণ্ড্‌স্ রাস্তার শিশুদের ভুলাইয়া আনিত। আলুভাজার লোভে তাহারা পাঠশালায় আসিত, কিন্তু যে আসিত সে আর ফিরিত না। মাষ্টার মহাশয়ের কি যে আকর্ষণ শক্তি ছিল, আর ঐ অন্ধকার পাঠশালার মধ্যে কি যে মধু ছেলেরা পাইত, তাহা কেহই বুঝিত না; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

চার হাত চওড়া, বারো হাত লম্বা, সরু বারান্দার মত ঘর; তাহার মাঝখানে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় জুতা সেলাই করিতেছেন আর পড়া বলিয়া দিতেছেন, আর চারিদিকে প্রায় চল্লিশটি ছাত্রের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। কেহ সিঁড়ির উপর, কেহ মেঝের উপর, কেহ চৌকিতে কেহ বাক্সে—আর নিতান্ত ছোটদের কেহ কেহ হয়ত মাষ্টারের কোলে—এই রকম করিয়া মহা উৎসাহে লেখা পড়া চলিয়াছে। বাহিরের লোকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিত।

গরীব মাষ্টার ছাত্রদের কাছে একপয়সাও বেতন লইত না—এতগুলি ছাত্রকে সে বই জোগাইবে কোথা হইতে? তাহাকে সহরে ঘুরিয়া পুরান পুঁথি ছেঁড়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহাতেই ছেলেদের পড়ার কাজ কোন রকমে চলিয়া যাইত। কয়েক খানা স্লেট ছিল, তাহাতেই সকলে পালা করিয়া লিখিত। পাঠশালায় সামান্য যোগ বিয়োগ হইতে ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক শিখান হইত। কেবল তাহাই নয়, এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা তাহার কাছে কাপড় সেলাই করিতে এবং জুতা মেরামত করিতেও শিখিত। সকলে মিলিয়া তীর ধনুক ব্যাট বল ঘুড়ি লাটাই খেলনা পুতুল প্রভৃতি নানারকম জিনিষ নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহাদের খাওয়া পরার সমস্ত অভাবের কথাও গরীব মাষ্টারকেই ভাবিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জন পাউণ্ডসের উপর কোন কোন লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মাঝে মাঝে গরম কাপড় চোপড় পাঠাইয়া দিত। সেই সব কাপড় পরিয়া ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহে খোঁড়া মাষ্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন মাষ্টার মহাশয়ের মুখে আনন্দ আর ধরিত না।

এমন করিয়া কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, জন পাউণ্ড্‌স্ বুড়া হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার পাঠশালা চলিতে লাগিল। আগে যাহারা ছাত্র ছিল, তাহারা ততদিনে বড় হইয়া উঠিয়াছে কত জনে নাবিক হইয়া কত দেশ বিদেশে ঘুরিতেছে কতজনে

সৈন্যদলে ঢুকিয়া যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতেছে। নূতন ছাত্রদের পড়াইবার সময়ে এই সব অতি পুরাতন ছাত্রেরা তাদের বৃদ্ধ গুরুকে দেখিবার জন্য পাঠশালায় হাজির হইত। তাহারই ছাত্রেরা যে সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জন করিয়া খাইতেছে, এবং এখনও যে তাহারা তাহাদের খোঁড়া মাষ্টারকে ভোলে নাই, এই ভাবিয়া গৌরবে আনন্দে বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের দিনে ৭২ বৎসর বয়সে পাঠশালার কাজ করিতে করিতে বৃদ্ধ হঠাৎ শুইয়া পড়িল। বন্ধু বান্ধব উঠাইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। হয়ত তখনও লোকে ভাল করিয়া বোঝে নাই যে কত বড় মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন ইংলণ্ডের সহরে সহরে অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা কত আয়োজন; কিন্তু এ সমস্তের মূলে ঐ খোঁড়া মুচির পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাহারা পড়িতে আসিত, কেবল তাহারাই যে জন পাউণ্ডসের ছাত্র, তাহা নয়—যাঁহারা নিজেদের অর্থ দিয়া, দেহের শক্তি দিয়া, একাগ্র মন দিয়া, অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই গৌরবের সঙ্গে এই খোঁড়া মুচিকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আমরাও আচার্য্য জন পাউণ্ডসের শিষ্য"।

এই খোঁড়া মুচির নাম সকলের কাছে স্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া তাহার একটি পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে তাহারই ছবি দেখান হইল।

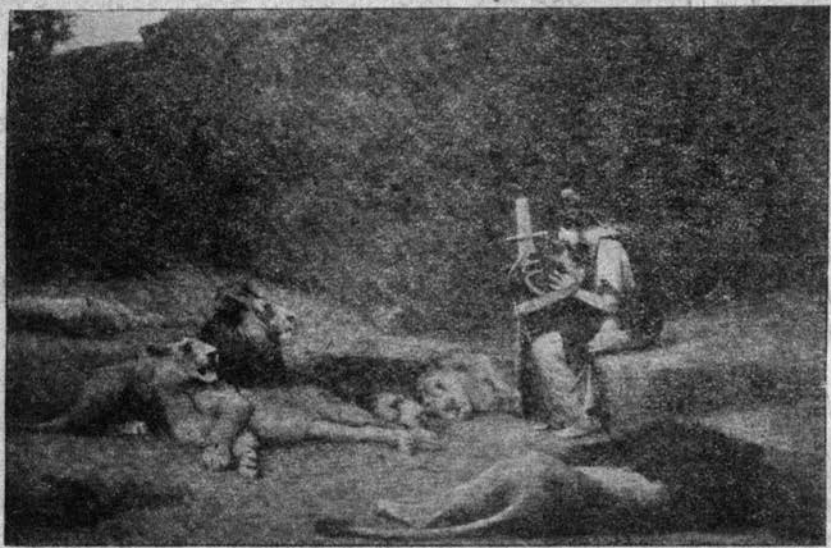
অর্ফিয়ুস্

নয়টি বোন ছিলেন, তাঁহারা ছন্দের দেবী। গানের ছন্দ, কবিতার ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ, সঙ্গীতের ছন্দ—সকল রকম ছন্দকলায় তাঁহাদের সমান আর কেহই ছিল না। তাঁহাদেরই একজন, দেবরাজ জুপিটারের পুত্র আপোলোকে বিবাহ করেন।

আপোলো ছিলেন সৌন্দর্য্যের দেবতা, শিল্প ও সঙ্গীতের দেবতা। তিনি যখন বীণা বাজাইয়া গান করিতেন তখন দেবতারা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া শুনিতেন।

এমন বাপ মায়ের ছেলে অর্ফিয়ুস্ যে গান বাজনায় অসাধারণ ওস্তাদ হইবেন, সে আর আশ্চর্য্য কি? অর্ফিয়ুসের গুণের কথা দেশ বিদেশে রটিয়া গেল—স্বয়ং আপোলো

খুসী হইয়া তাহাকে নিজের বীণাটি দিয়া ফেলিলেন। পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে অর্ফিয়ুস্ বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন আর সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিত। অর্ফিয়ুসের বীণার সুরে আকাশ যখন ভরিয়া উঠিত, তখন সুরের আনন্দে গাছে গাছে ফুল ফুটিত,



সমুদ্রের কোলাহল থামিয়া যাইত, বনের পশু হিংসা ভুলিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এই রকমে দেশে দেশে বীণা বাজাইয়া অর্ফিয়ুস্ ফিরিতেছেন, এমন সময় একদিন ইউরিডিস্ নামে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বীণার সুরে মোহিত হইয়া দেখিতে আসিলেন, কে এমন সুন্দর বাজায়। ইউরিডিসকে দেখিবামাত্র অর্ফিয়ুসের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দ বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আকাশকে মাতাইয়া তুলিল। তন্ময় হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ইউরিডিসের মন একেবারে গলিয়া গেল। তারপর ইউরিডিসের সঙ্গে অফিয়ুসের বিবাহ হইল; মনের আনন্দে দুইজনে দেশদেশান্তরে বেড়াইতে চলিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁহাদের বেশী দিন থাকিল না। একদিন মাঠের মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ ইউরিডিস্‌কে কামড়াইয়া দিল এবং সেই বিষেই ইউরিডিসের মৃত্যু হইল। অর্ফিয়ুস্ তখন শোকে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বীণার তারে হাহাকার করিয়া

করুণ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ফিয়ূস্ একেবারে অলিম্পাস পর্ব্বতের উপরে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেবরাজ বজ্রধারী জুপিটার তাঁহার দুঃখের গানে ব্যথিত হইয়া বলিলেন "যাও, পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিয়া যমরাজ প্লুটোর নিকট তোমার স্ত্রীর জন্য নূতন জীবন ভিক্ষা করিয়া আন। কিন্তু জানিও, এ বড় দুঃসাধ্য কাজ; প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এমন কাজে যাইবার আগে চিন্তা করিয়া দেখ"।

অর্ফিয়ূস্ নির্ভয়ে বীণা বাজাইতে বাজাইতে পাতালের দিকে চলিলেন। পাতালপুরীর সিংহদ্বারে যমরাজের ত্রিমুণ্ড কুকুর দিন রাত পাহারা দেয়। অর্ফিয়ূস্‌কে আসিতে দেখিয়া রাগে তাহার ছয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া বিষাক্ত আগুন ফেনাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অর্ফিয়ূসের বীণার সুর যেমন তাহার কাণে আসিয়া লাগিল, অমনি সে শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। অর্ফিয়ূস্ অবাধে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তখন পাতালপুরী কম্পিত করিয়া বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। নরকের অন্ধকার ভেদ করিয়া সে সঙ্গীত পাতালের অতল গুহায় প্রবেশ করিল। সেই শব্দে যমদূতের হুঙ্কার আর পাপীদের চীৎকার মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া অত্যাচারী ট্যাণ্টেলাস্ পিপাসায় পাগল,—পান করিতে গেলেই জল সরিয়া যায়! বীণার সঙ্গীতে সে তাহার তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। মহাপাপী ইক্সিয়ন নরকের ঘুরন্ত চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এতদিন পরে বিশ্রাম পাইল, ঘুরন্ত চক্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধূর্ত্ত নিষ্ঠুর সিসিফাস্ চিরকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর পাথর গড়াইয়া তুলিতেছে, যতবার তোলে ততবার পাথর গড়াইয়া পড়ে; সেও দারুণ শ্রমের দুঃখ ভুলিয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

অর্ফিয়ূস যমরাজের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যমরাজ প্লুটো ও রাণী প্রসের্‌পিনা গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের পায়ের কাছে নিয়তিরা তিনবোনে জীবনের সূতা লইয়া খেলিতেছে। একজন সূতা টানিয়া ছাড়াইতেছে, একজন সেই সূতা পাকাইয়া জড়াইতেছে, আর একজন কাঁচি দিয়া পাকান সূতা ছাঁটিয়া ফেলিতেছে। অর্ফিয়ূসের সঙ্গীতে যমরাজ সন্তুষ্ট হইলেন, নিয়তিরা প্রসন্ন হইল। তখন আদেশ হইল, "ইউরিডিসকে ফিরাইয়া দাও, সে পৃথিবীতে ফিরিয়া যা'ক। কিন্তু সাবধান অর্ফিয়ূস! যমপুরীর সীমানা পার হইবার পূর্ব্বে ইউরিডিসের দিকে ফিরিয়া চাহিও না—তবে কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইবে।"

অর্ফিয়ুস মনের আনন্দে বীণা বাজাইয়া চলিলেন, তাঁহার পিছন পিছন ইউরিডিস্‌ও চলিলেন। যমপুরীর সীমানায় আসিয়া আর্ফিয়ুস্ মনের আনন্দে নিষেধের কথা ভুলিয়া, ফিরিয়া তাকাইলেন। অমনি তাঁহার চোখের সম্মুখেই ইউরিডিসের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া শূন্যের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তারপর অর্ফিয়ুস্ আর কি করিবেন? তিনি বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাগলের মত সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল বনের আড়ালে আড়ালে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় ইউরিডিস্ লুকাইয়া আছেন। মনে হইল, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস বলিতেছে, "ইউরিডিস্, ইউরিডিস্"—পাখীরা শাখায় শাখায় করুণস্বরে গান করিতেছে "ইউরিডিস্, ইউরিডিস্"!

এমনি ভাবে অস্থির মনে যখন তিনি ঘুরিতেছেন, তখন একদিন মদের দেবতা ব্যাকাসের মাতাল সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি ফূর্ত্তি করিয়া বীণা বাজাও আমরা নাচিব"। কিন্তু অর্ফিয়ুসের মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই, তাই বীণার তারেও কেবল দুঃখের সুরই বাজিতে লাগিল। তখন মাতালেরা রাগিয়া বলিল "মার ইহাকে—এ আমাদের আমোদ মাটি করিতেছে"। তখন সকলে মিলিয়া অর্ফিয়ুস্‌কে মারিয়া তাঁহার দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। সেই দেহ ইউরিডিসের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। শূন্যে অর্ফিয়ুসের আনন্দধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল আবার তিনি ইউরিস্‌কে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

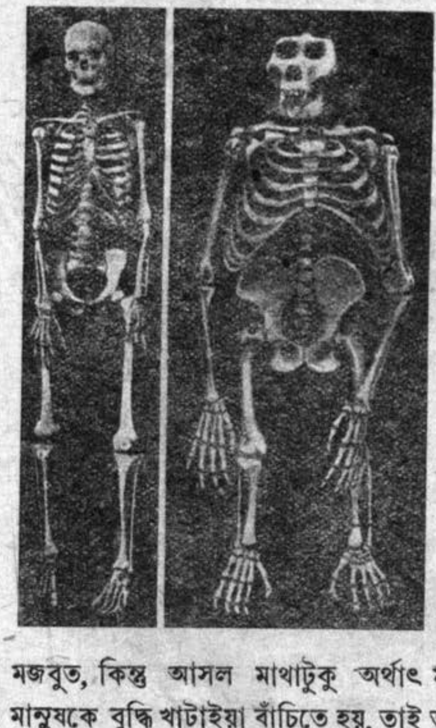
জলে স্থলে নদীর কলস্রোতে ঝরণার ঝর্ঝর শব্দে আনন্দ কোলাহল বাজিয়া উঠিল।

মানুষের কথা

জগতে কাহারও স্থির থাকিবার হুকুম নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, "চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সমস্তই চলিতেছে"। জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিত বলেন, "প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে তাহার অতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণু পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে"। ভূতত্ত্ববিৎ বলেন, "এই পৃথিবীকে আজ যেমন দেখিতেছি, চিরদিন সে এমন ছিল না এবং পরেও এমন থাকিবে না—তাহার চেহারা পর্য্যন্ত যুগের পর যুগ বদলাইয়া চলিয়াছে"। সুতরাং, মানুষ যে চিরকাল মানুষ ছিল না, সে যে ক্রমে এই রকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য কথা নয়। কোন্ আদিম কালের কোন্ জন্তু কেমন করিয়া ক্রমে মানুষের মত

হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে মানুষের সঙ্গে বানরের, বিশেষত "বনমানুষের", জ্ঞাতি সম্পর্কটাই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

চোখে দেখিতে মানুষ ও বানরের চেহারার মধ্যে যেমন মিল দেখিতে পাই, তেমনি কতগুলা তফাৎও বুঝিতে পারি, যাহার দরুণ বানরকে বানর বলিয়া বোঝা যায়। এইখানে একটা মানুষের কঙ্কাল আর একটা গরিলার কঙ্কাল পাশাপাশি দেখান



হইয়াছে। দুইজনের শরীরের গড়ন মোটামুটি একই রকমের; একই রকম ভাবে হাড়ের পরে হাড় সাজাইয়া কাঠাম দুটিকে দাঁড় করান হইয়াছে। বাঘ সিংহ বা গরু ঘোড়ার কঙ্কাল যদি ইহার পাশে বসাও তবে কখনই এতটা মিল দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এতটা মিল থাকিলেও দুয়ের মধ্যে তফাৎটাও বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। গরিলার হাত প্রকাণ্ড লম্বা এবং মজবুত, কারণ তাহাকে গাছে গাছে ফিরিতে হয়, চলিতে ফিরিতে তাহাকে হাতের ব্যবহার করিতে হয়। গরিলার পায়ের পাতা ঠিক হাতেরই মত, অর্থাৎ বলিতে গেলে তাহার চারিটাই হাত। তাহার শরীরে যে অসাধারণ শক্তি, তাহার পাঁজরের হাড়গুলা দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। তারপর মাথার খুলিটা দেখ—গরিলার দাঁত এবং চোয়াল খুবই মজবুত, কিন্তু আসল মাথাটুকু অর্থাৎ মগজের জায়গাটুকু মানুষের তুলনায় খুব ছোট। মানুষকে বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিতে হয়, তাই তাহার মগজ বাড়িয়া বাড়িয়া মাথাটাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। আরও কতগুলা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে, পণ্ডিতেরা যাহাকে খুব গুরুতর বলিয়া মনে করেন, যেমন হাঁটুর হাড়। মানুষ যে পায়ের পাতার উপর খাড়া হইয়া চলে, এবং গরিলা যে সামনের হাত দুটিতে ভর রাখিয়া কুঁজা হইয়া চলে, ঐ হাঁটুর হাড় দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

মানুষ কতদিন হইল এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, অর্থাৎ কতদিন হইল সে "মানুষ"

হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরা এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। সকলের চাইতে পুরাতন মানুষের চিহ্ন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের চোয়ালের হাড় আর মুখের ভিতরকার গড়ন দেখিয়া মনে হয় তাহারা কথা বলিতে জানিত না। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডুবয় যবদ্বীপে প্রাচীন জন্তুর কঙ্কাল খুঁজিতে গিয়া একটা মানুষের কয়েক টুকরা কঙ্কাল খুঁড়িয়া তোলেন। সেটা মানুষের কঙ্কাল কি বানরের কঙ্কাল, সে বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল—কারণ তাহার মগজকোষটি বানরের চাইতে অনেকটা বড় হইলেও আজকালকার সভ্য মানুষের তুলনায় খুবই ছোট এবং কপালটাও বানরের মত চ্যাপ্টা। তার দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইটা দেখিলে গরিলার দাঁতের কথাই মনে হয়। কিন্তু তাহার উরুর হাড় দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে মানুষের মত খাড়া হইয়া চলিত। এই প্রাচীন মানুষটির, অর্থাৎ জন্তুটির, নাম দেওয়া হইয়াছে বানরমানুষ। ইহার চাইতে প্রাচীন কোন মানুষের কঙ্কাল আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইউরোপে সেকালের মানুষের যে সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, এই বানরমানুষের



যবদ্বীপের বানরমানুষ ইউরোপের প্রাচীনমানুষ

তুলনায় তাহাদের খুব প্রাচীন বলা চলে না। কিন্তু তাহারাও এক একজন প্রায় পাঁচ

লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষ। ধনুকের মত বাঁকা ছোট ছোট পা, বানরের মত উঁচু উঁচু ভ্রূ, একটু আধটু কথা বলিতে পারে—সেই সব মানুষ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এই সব মানুষের চেহারা কেমন ছিল তাহা এই সকল কঙ্কাল হইতেই কতকটা বোঝা যায়।

মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, যখন সে অস্ত্র গড়িতে বা আগুণ জ্বালাইতে শিখে নাই, তাহারও অনেক আগে সে এমন একটি বিদ্যা শিখিয়াছিল, যাহা মানুষ ছাড়া অন্য কোনও পশুর জানা নাই। সেই বিদ্যাটি খাড়া হইয়া চলিবার বিদ্যা। কেবল মাত্র পায়ের সাহায্যেই যখন সে চলিতে শিখিল, তখন হইতে তাহার হাত দুইটা ছাড়া পাইল। সেই সময় হইতে সে হাত দুটাকে যে কত রকম কাজে লাগাইয়াছে, এবং কত কৌশল শিখাইয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই।

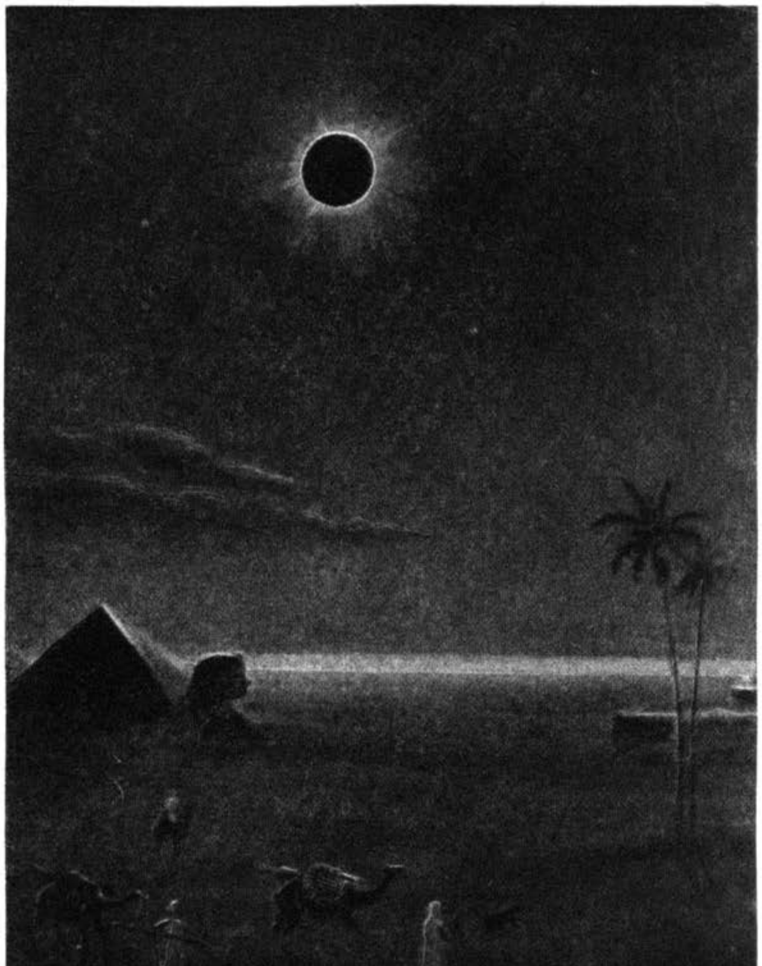
সেই সব মানুষেরা যে সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেই পরিষ্কার দেখা যায় যে, হাতের ওস্তাদী কেমন করিয়া যুগের পর যুগ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম যে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখে, তাহার অস্ত্র ছিল গাছ পাথর জানোয়ারের শিং ও হাড়। এই অতি প্রাচীন মানুষটি যদি অস্ত্র শস্ত্রের আরও উন্নতি করিতে পারিত, তবে হয়ত সে আরও কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিত। কিন্তু পাথরের অস্ত্রওয়ালা মানুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়া পারে নাই। প্রাচীনকালের নানারকম পাথরের অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া গিয়াছে। সব চাইতে পুরান যে গুলি, সে গুলিকে হঠাৎ দেখিয়া অস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় না, কারণ, সেসময়ে এক এক টুক্‌রা পাথরকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিতান্তই মোটা রকমের, উবড়োখাবড়ো অস্ত্র গড়া হইত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই রকম অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা পৃথিবীতে শিকার করিয়া ফিরিয়াছিল। যে সকল পর্ব্বতের গুহায় তাহারা বাস করিত সেই গুহার মধ্যে পাথরে আঁচড় কাটিয়া তাহারা যে সকল ছবি আঁকিত, তাহারও চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সেই ছবিগুলি দেখিলে তোমরা হয় ত হাসিবে—কারণ আজ কালকার পাঁচ সাত বৎসরের শিশুও অমন ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই সমস্ত ছবি দেখিয়া সেই গুহাবাসী মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য খবর জানিতে পারিয়াছেন। এই মানুষদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হইত, তাহাদের চেহারা ছিল কতকটা এস্কিমোদের মত, তাহারা চাষবাস জানিত না, বেদে জাতির মত নানাস্থানে ঘুরিত আর দল বাঁধিয়া শিকার করিত। সম্ভবত ইহাদের অনেকেই কাঁচামাংস খাইত, এবং কেহ কেহ হয়ত মানুষ খাইতেও কোন আপত্তি বোধ করিত না।

ইহার পর আরও বুদ্ধিমান এক রকম মানুষ দেখা দিল, যাহারা পাথরকাটা বিদ্যায় রীতিমত কারিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্রগুলি খুব সমান ও ধারাল এবং রীতিমত শান দিয়া পালিশ করা। তার উপর ইহারা মাটির বাসন গড়িতে চাষবাস করিতে কাপড় বুনিতে ও গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তু পুষিতেও শিখিয়াছিল। ইহারা যেখানে যাইত সেইখানেই সেই প্রাচীন যুগের আনাড়ি মানুষকে তাড়াইয়া মারিয়া শেষ করিত। বলিতে গেলে, পাথরের যুগের এই নূতন মানুষটি হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন তারা

কিছু দিন হইল বিলাত হইতে একটা টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল, আকাশে একটা নূতন তারা দেখা দিয়াছে। আকাশে এত যে তারা দেখিতেছি, তাহাদের প্রত্যেককেই মানুষে চিনিয়া রাখিয়াছে। আকাশের মানচিত্র আঁকিয়া তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি তারার স্থান পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার হঠাৎ নূতন তারা আসিল কোথা হইতে? সে তারা এত দিন কোথায় ছিল? সে হঠাৎ এমন জ্বলিয়া আবার এমন করিয়া নিভিয়া যায় কেন? পণ্ডিতেরা বলেন, যে তারাটাকে আমরা নূতন দেখিতেছি সে বরাবর ঐ খানেই ছিল—কেবল তাহার আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া এত দিন আমরা দেখিতে পাই নাই। আজ যে সে হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ এই যে, অন্য কোন তারার সহিত তাহার ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে। কোন্ সুদূর আকাশে শূন্যপথে চলিতে চলিতে তারায় তারায় 'কলিষণ' লাগিয়াছে আর সেই কলিষণের আগুণ হইতে আলোক ছুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আজ, না জানি কত বৎসর পরে, সেই আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর তাই দেখিয়া আমরা বলিতেছি "ঐ নূতন তারা"।

যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল ছুটিয়া যায়, এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাত বার পাক দিয়া আসিতে পারে, সেই আলোক বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়া তবে এই অসম্ভব দীর্ঘপথ পার হইয়া আসিয়াছে। ভাবিয়া দেখ সে কত দূর।



সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণ

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ   ভাদ্র, ১৩২৫   পঞ্চম সংখ্যা

ঝড়ের ছড়া

ঝড়   রুষিয়ে
ধায়   ঢুসিয়ে
ফোঁস্   ফুঁসিয়ে
খুব   হুঁশিয়ার!
ডাল   মট্‌কায়
এক   ঝট্‌কায়
ফুল   চট্‌কায়
সব   দুনিয়ার।
পাখ্-   পাখালির
ঝাঁক   আছড়ায়,
খালি   আঁচ্‌ড়ায়
গাছ-   গাছ্‌ড়ায়;
বট,   পাকাটির
প্রায়,   ধাক্কায়
ভেঙে   খাম্‌খাই
ঢালি-   পাক খায়!

জোর হ্যাঁচ্‌কায়
হাল মচ্‌কায়,
ভুরু কোঁচ্‌কায়
মাঝি, হায়, হায় ;
মন কাৎরায়,
মেঘ সাঁৎরায়,
আল্‌- কাৎরায়—
দশ দিক ছায়।
বন্‌- বরা নয়,
নয় নয় মোষ,—
তবু ভারি রোষ,
ভারি আক্রোশ ;
ক্ষেত ধাম্‌সায়
করে ধান সায়
আঁব ধ্বংসায়
হায় আফ্‌শোষ !
বুক ধ্বসিয়ে
ছায় বসিয়ে,—
হাড় খসিয়ে
সব পাঁজ্‌রার ;
চোখ্‌ পাক্‌লায়,
ভরে গাঁজ্‌লায় ;
ঝরে ওর গায়
মোতি কাজ্‌লার !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পতিব্রতার কাহিনী

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠান নগরে এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ রোগে একেবারে আতুর হইয়া পড়েন। সাধ্বী ব্রাহ্মণী প্রতিদিন পরম যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহাকে স্নান করান, খাওয়ান দাওয়ান প্রভৃতি কোন কাজেই তিনি অবহেলা করিতেন না। ব্রাহ্মণটি ছিলেন বড় রাগী ও উগ্রস্বভাব তাই এত যত্ন সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীকে সর্ব্বদা কেবলই তিরস্কার করিতেন। কিন্তু তবু ব্রাহ্মণী এক দিনের জন্যও তাঁহার সেবার কোন ত্রুটি করিতেন না। ব্রাহ্মণের চলিবার ক্ষমতা ছিল না, তবু একদিন স্ত্রীকে বলিলেন—"রাজপথের পাশে সেই যে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে আমাকে এখনই সেখানে কাঁধে করিয়া লইয়া চল। বন্ধুকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী করিলেন কি, কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই স্বামীকে কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। একে রাত্রি তাহাতে আবার আকাশে ঘন মেঘ করিয়া চারিদিক গভীর অন্ধকারে ঢাকা! বিদ্যুতের আলোতে পথ দেখিতে দেখিতে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণী চলিয়াছেন।

পথের ধারেই মাণ্ডব্য নামে এক মুনিকে চোর সন্দেহ করিয়া শূলে দেওয়া হইয়াছিল। বিনাদোষে শূলেবিদ্ধ হইয়া মুনি বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। পথে চলিতে চলিতে অন্ধকারে হঠাৎ ব্রাহ্মণীর স্কন্ধস্থিত স্বামীর পায়ের ধাক্কা মাণ্ডব মুনির শরীরে লাগায় তাঁহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল! তখন মুনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—"যাহার ধাক্কা লাগিয়া আমার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল, সেই পাপাত্মা প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয় হইবামাত্রই প্রাণত্যাগ করিবে।" কি সর্ব্বনাশ! হঠাৎ এই নিদারুণ শাপ শুনিয়া ব্রাহ্মণীর মনে কষ্টের সীমা রহিল না। তখন তিনিও বলিলেন —"কে তুমি মিছামিছি আমার স্বামীকে শাপ দিলে? আমিও বলিতেছি তাহা হইলে সূর্য্য আর কখন উদিত হইবে না।"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর কথাই ঠিক হইল—পরদিন আর সূর্য্যোদয় হইলই না! তখন হইতে কেবলই রাত্রি, কেবলই রাত্রি—আর আলোকের মুখ দেখা যায় না। যাগ, যজ্ঞ, হোম, প্রভৃতি সব বন্ধ হইল। এইরূপে কিছু দিন চলিল। তখন দেবতারা বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! জগতের কাজ চলিবে কি করিয়া? কেবলই রাত্রি! মাস, ঋতু, বৎসর কিছুই যে ঠিক করা যাইবে না! সূর্য্যোদয় বন্ধ হইল, এখন উপায় কি?

সৃষ্টিটাই যে নষ্ট হইয়া যাইবে ?" এইরূপ অনেক চিন্তার পর ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ ! পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর সতীত্ববলে সূর্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তোমরা সকলে গিয়া অত্রিমুনির পত্নী পতিব্রতা তপস্বিনী অনুসূয়াকে সন্তুষ্ট কর। তাহা হইলে তিনি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

ব্রহ্মার উপদেশে দেবতারা অত্রিপত্নী অনুসূয়ার নিকটে গিয়া তাঁহার স্তব করিলে পর তিনি বলিলেন—"তোমরা কি চাও ?" দেবতারা প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবি ! পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য উদিত হইতে থাকুন।" অনুসূয়া কহিলেন—"পতিব্রতার মহিমা কখনই খর্ব্ব হইবার নহে। যাহা হউক, আমি সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব এবং যাহাতে পুনরায় দিবারাত্রির ব্যবস্থা হয়, এবং ব্রাহ্মণীর স্বামীরও মৃত্যু না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।"

দেবগণকে বিদায় করিয়া অনুসূয়া সেই ব্রাহ্মণীর নিকট গেলেন। ব্রাহ্মণীর ও তাঁহার স্বামীর কুশল সংবাদ লইয়া তাঁহাকে নানা মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন—"তোমার আশ্চর্য্য স্বামীসেবার কথা শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তাই তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমার বাড়ীতে আসিলাম।"

ব্রাহ্মণী মহা সন্তুষ্ট হইয়া অতি আদরের সহিত অনুসূয়াকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"দেবি ! আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আর অনুগ্রহ করিয়া যখন পায়ের ধূলা দিয়াছেন তখন বলুন—কি করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

অনুসূয়া বলিলেন—"হে সাধ্বি ! তোমার কথায় সূর্য্যোদয় বন্ধ হইয়া পৃথিবীতে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেজন্যই দেবতারা দুঃখিতচিত্তে দেবরাজের সহিত আমার নিকট গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রির ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। আমি সে জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। এই বিপদ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি প্রসন্ন হও এবং সূর্য্যদেবও পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হইতে থাকুন।"

অনুসূয়ার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন—"হে দেবি ! মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার স্বামীকে শাপ দিয়াছেন যে সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার মৃত্যু হইবে। এবং সেজন্যই আমিও বলিয়াছি—সূর্য্য আর উদিত হইবে না।" অনুসূয়া বলিলেন—"পতিব্রতার মহিমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে তোমার স্বামীকে আমি পুনরায় জীবিত করিব এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রোগমুক্ত সুন্দর শরীর পাইবেন।"

ব্রাহ্মণী মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তাহা যদি হয় তবে আর আমার আপত্তি কি ? আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

তখন অনুসূয়া সূর্য্যের পূজা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন, ক্রমাগত দশদিন রাত্রির পর অনুসূয়ার আহ্বানমাত্র, পূর্ব্বদিক লাল বর্ণে আলোকিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল এবং তাঁহার শরীর যেমন মাটিতে পড়িবে ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। তখন অনুসূয়া বলিলেন—"ভদ্রে ! তুমি ভাবিও না ; আমি কেবলমাত্র পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি এক্ষণে তাহার শক্তি দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া অনুসূয়া করযোড়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমি অক্লান্ত পতিসেবা দ্বারা যদি পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে এই ব্রাহ্মণের রোগ দূর হউক, তিনি সুন্দর হউন এবং পুনর্জ্জীবিত হইয়া ব্রাহ্মণীর সহিত একশত বৎসর সুখে বাস করুন।"

অনুসূয়ার প্রার্থনা মাত্র ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহপ্রভায় চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বর্গে দুন্দভি বাজিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ডোরিজেন

(ইংরাজ কবি চসারের গল্প)

শৌর্য্যে বীর্য্যে ও মহত্ত্বে আরবিরেগাসের মত যোদ্ধা সে সময়ে ব্রিটানিতে অন্য কেহ ছিল না। তাঁর স্ত্রী ডোরিজেনের মত সুন্দরীও সে দেশে আর ছিল কিনা সন্দেহ।

সমুদ্রের ধারে উঁচু পাহাড়ের উপর আরবিরেগারের প্রাসাদ। বিয়ের পর ডেরিজেন্‌কে নিয়ে তিনি সেই প্রাসাদে এলেন। কিন্তু এক বৎসর যেতে না যেতেই আরবিরেগাসের মন আবার যুদ্ধের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি ভাব্‌লেন—"এরূপ ভাবে চুপ্‌চাপ বসে দিন কাটান আমার পক্ষে শোভা পায় না।" ইংলণ্ডে তখন ভারি যুদ্ধ হচ্ছিল ; সেই যুদ্ধে যাবার জন্য তিনি আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর ক্রমে যাত্রা করবার সময় হ'ল ; আরবিরেগাস্‌কে নিয়ে জাহাজ সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে পড়ল। যতক্ষণ জাহাজ দেখা গিয়েছিল ততক্ষণ প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ডোরিজেন একদৃষ্টে জাহাজের পানে

তাকিয়েছিলেন। তারপর জাহাজ যখন আর দেখা গেল না, তখন দুঃখে বেচারার মন ভেঙ্গে পড়ল—চোখে নিদ্রা নাই, খেতে মন বসে না, রাত দিন কেবলই দুঃখ করেন।

বন্ধুবান্ধবেরা নানা রকমে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁর দুঃখ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে আরবিরেগাসের চিঠি আস্‌ত, তাতে তাঁর নূতন নূতন বীরত্ব ও সুখ্যাতির কথা পড়ে ডোরিজেনের মন অনেকটা প্রফুল্ল হত। কিন্তু যখনই তিনি সমুদ্রের দিকে আর দূরের অন্ধকার ঘুট্‌ঘুটে পাহাড়গুলির দিকে চাইতেন তখনই তাঁর মন ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ত আর তিনি আবার বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

প্রাসাদের অন্য দিকে চমৎকার বাগান, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যেত না। ডোরিজেনের বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে এই বাগানে বেড়াতে যেতেন। একদিন বাগানে গিয়ে সকলে সারাদিন উৎসব করে কাটালেন। খাওয়া দাওয়া নাচ গান আমোদ আহ্লাদ—তাতে ডোরিজেন্ ছাড়া সকলেই যোগ দিলেন। ডোরিজেন্‌ও সেই তামাসা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলেন।

সেখানে একটি যুবকও ছিল তার নাম 'অরিলিয়াস্'। অরিলিয়াস্ সুশ্রী বলবান ও বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু তার লোভটা কিছু বেশী। ডোরিজেনের গলায় একটা চমৎকার মণি ঝুলছে দেখে, তার ইচ্ছা হ'ল যে সেই মণিটা সে নেয়। সে ক্রমাগত মণিটাকে দেখ্‌ছে আর ভাবছে "আহা ঐ মণিটা যদি আমার হ'ত"! এই রকম ভাবতে ভাবতে শেষটায় আর লোভ সামলাতে না পেরে সে ডোরিজেনের কাছে এসে বেহায়ার মত একেবারে মণিটা চেয়ে বস্‌ল।

ডোরিজেন্ অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"তুমি নিশ্চয় জেনো—আমাকে যদি ভিক্ষা করেও খেতে হয় হয় তবু এ মণিটি হাতছাড়া করতে পারি না।" কিন্তু অরিলিয়াস্ তবু বার বার মিনতি করতে লাগ্‌ল। সে বল্‌ল—"এর জন্য এমন অসাধ্য কাজ নাই যা আমি করতে পারি না"। তখন ডোরিজেন তামাসা করে বল্‌লেন—"আচ্ছা অরিলিয়াস্! তুমি যদি ঐ সমুদ্রের কাল কাল পাহাড়গুলোকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পার, তবে মণিটি তোমাকে দিব।"

এমন অসম্ভব কথা শুনে অরিলিয়াস্ নিরাশ হ'য়ে বাড়ী চলে গেল।

ডোরিজেনের মণিটি বড় সাধারণ মণি ছিল না। তাঁর জন্মের সময় তিনি এটি পেয়েছিলেন। মণিটি বরফের মত টল্‌টলে, দিনের বেলায় সূর্য্যের মত উজ্জ্বল দেখাত —পৃথিবীতে এমন আর একটি খুঁজেও পাওয়া যায় না! ছেলে বেলায় তাঁর মা বলে-

ছিলেন—"বাছা! মণিটিকে যত্ন করে সর্ব্বদা গলায় রেখো, তবেই সুখে শান্তিতে থাকবে, সকলে তোমাকে ভালবাস্বে। কিন্তু যদি এটি হাতছাড়া কর, তবে তোমার দুঃখের আর সীমা থাকবে না—সুখসৌভাগ্য আত্মীয়স্বজন সব হারিয়ে পৃথিবীতে একলা হয়ে পড়ে থাকবে।

এমন মণি কি ডোরিজেন্ কাকেও দিতে পারেন ? অরিলিয়াসের উপর তাঁর ভারি রাগ হ'ল। এই অদ্ভুত মণির কথা ব্রিটানির সকলেই জানে, অরিলিয়াস্‌ও নিশ্চয় শুনেছে। তবে জেনে শুনেও সে কোন্ মুখে মণিটা চাইল !"

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আরবিরেগাস্ অক্ষয়কীর্ত্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। সেই আনন্দে ডোরিজেন্ অরিলিয়াসের নীচতার কথা আর সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়গুলির কথা একেবারেই ভুলে গেলেন।

এদিকে অরিলিয়াস্ সেই দিন থেকে মনের দুঃখে বিছানায় পড়ে আছেন, উঠ্‌বার শক্তি নাই। তাঁর ভাই 'অষ্টিন্' দিন রাত তাঁকে যত্ন করেন, দেখেন শুনেন। এইভাবে কিছুদিন গেলে পর একদিন হঠাৎ অষ্টিনের মনে পড়ে গেল—তিনি যখন অর্লেয়াঁ সহরে পড়্‌তেন তখন সেখানে একটা যাদুমন্ত্রের বই দেখেছিলেন, তাতে যাদুকরদের অদ্ভুত কাণ্ডের কথা লেখা ছিল। সেই বিদ্যা যদি কেউ শিখে থাকে, তাকে দিয়ে ত পাহাড় সরান যেতে পারে ! অষ্টিন তখনই ছুটে গিয়ে অরিলিয়াসকে এই কথা বল্‌লেন। কি আশ্চর্য্য ! এ কথা শুনেই যেন অরিলিয়সের রোগ সেরে গেল, সেও বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল। সেই দিনই দুই ভাই মিলে অর্লেয়াঁ যাত্রা কর্‌লেন।

সহরের নিকটে যেতেই একজন লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো—লোকটির কেমন জানি অদ্ভুত রকমের পোষাক, চোখের চাউনিটি আরও অদ্ভুত!—তাঁদের দেখেই সে কাছে এসে নমস্কার করে বল্‌ল—"আপনারা সেই পাহাড় সরিয়ে মণি পেতে চান—আর সেই জন্য যাদুকরের সন্ধান কর্‌তে এসেছেন"। দুভাই ত একেবারে অবাক্ ! বুঝ্‌তে পার্‌লেন, এ লোক সত্যই যাদুকর। দু ভাই তখনই যাদুকরের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলেন।

যাদুকরের বাড়ী গিয়ে তাঁরা দেখ্‌লেন এমন আশ্চর্য্য বাড়ী কখন তাঁরা দেখেন নাই। বস্‌বার ঘরটিতে চারদিকে নানা রকম পুস্তকের আলমারি। দেয়ালে সব অতি অদ্ভুত ছবি ও পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র টাঙান। ঘরের এক কোণে একটা অদ্ভুত নীল রঙের আলো। তার উপর দেয়ালে গ্রহ নক্ষত্রের নক্সা আঁকা ছবি আর আলোর নীচেই

একটা টেবিল—তার উপর প্রকাণ্ড একটা পুথি দেয়ালের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা! অষ্টিন্ অরিলিয়াসের কানে কানে বল্‌লেন—"এটা সেই যাদুর বই"।

তারপর যাদুকর সেই আলোর কাছে গিয়ে যাদুর মন্ত্র পড়তে পড়তে দুই হাত নাড়তে লাগল আর অরিলিয়াস্ চেয়ে দেখ্‌লেন—তাঁদের চোখের সামনেই গভীর একটা বন হ'য়ে গিয়েছে আর তার পাশেই প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে কত সুন্দর সুন্দর হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্ত্তে এক দল সবুজ পোষাক পরা শিকারী এসে উপস্থিত—তাদের সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শিকারীরা তীর দিয়ে হরিণ গুলিকে মেরে ফেল্‌ল। তারপরেই দেখ্‌লেন—আর মাঠ টাঠ কিছু নাই তার জায়গায় প্রকাণ্ড নদী, নদীর ধারে বড় বড় বন রয়েছে। এই রকম কত যে অদ্ভুত দৃশ্য তাঁরা দেখ্‌লেন তার আর সীমা নাই। তারপর যাদুকর হাততালি দিল আর চক্ষের নিমেষে সব কোথায় মিলিয়ে গেল!

এই রকমে যাদুকর তার বিদ্যার পরিচয় দিয়ে দুভাইকে খুব আদর যত্ন ক'রে খাওয়াল। আহারের পর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, পাহাড় অদৃশ্য করে দিতে যাদুকর কত নিবে। যাদুকর বল্‌ল—"গুরুতর কাজ! হাজার মোহরের কমে যে পারা যাবে তা মনে হয় না।" তাতেই অরিলিয়াস্ মহা খুসী হয়ে বল্‌লেন—"সমস্ত পৃথিবীটা যদি আমার হতো তবে তাও আপনাকে দিয়ে দিতাম। যা হোক্ হাজার মোহরই দিব।"

তারপর দুইভাই যাদুকরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সেখানে গিয়েই যাদুকর তার কাজে লেগে গেল। গ্রহ নক্ষত্রের নক্সা নিয়ে হিজিবিজি অঙ্ক কসে অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কি সব হিসাব কর্‌ল। তারপর একদিন অরিলিয়াস্ জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন যাদুকর দুটি হাত তুলে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধীরে ধীরে দূরের পাহাড়গুলি ঝাপসা হ'য়ে সব শূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল! এই ব্যাপার দেখে তিনি একেবারে অবাক! বাইরে ছুটে গিয়ে দেখ্‌লেন পাহাড়ের চিহ্নটিও নাই, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যতদূর দেখা যায় একেবারে ফাঁকা! অরিলিয়াস্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে যাদুকরের পায়ে পড়ে তাকে অজস্র ধন্যবাদ করতে লাগ্‌লেন। তারপর আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করে একেবারে ডোরিজেনের সামনে গিয়ে হাজির।

এতদিন পরে হঠাৎ তাঁকে সম্মুখে দেখে ডোরিজেন্ চমকে উঠ্‌লেন। তিনি কিছু বলবার পূর্ব্বেই অরিলিয়াস্ বলিলেন—"এখন তা হলে আপনার মণিটি আমাকে দিন্।"

একথা বলতেই অরিলিয়াস্ দেখ্‌লেন ডোরিজেনের শান্ত নিশ্চিন্ত মুখখানি হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অরিলিয়াস্ আবার বল্‌লেন—"মনে পড়ে দুবছর আগে সেই বাগানে কি বলেছিলেন? দেখুন গিয়ে সত্য সত্যই পাহাড়-গুলি সরিয়ে ফেলেছি। এখন যত শীঘ্র পারেন আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন।"



ডোরিজেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—ভয়ে তাঁর মুখখানি সাদা হয়ে গিয়েছে। এরূপ অসম্ভব কাণ্ডও যে সম্ভব হতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তারপর স্বপ্নে চলার মত অন্যমনস্ক হ'য়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে চল্‌লেন। এই সময়ে আরবিরেগাস্ বাড়ী ছিলেন না, ভয়ে ভাবনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ডোরিজেন বাড়ী এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তিনদিন পরে বাড়ীতে এসেই ডোরিজেনকে দেখতে না পেয়ে আরবিরেগাস তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে শোবার ঘরে এসে দেখেন, ডোরিজেন বালিশের মধ্যে মাথাটি গুঁজে পড়ে আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। আরবিরেগাস্ ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"একি ডোরিজেন্! তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?"

ডোরিজেন কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বল্‌লেন। চাঁদের আলোকে আরবিরেগাস্ চেয়ে দেখলেন সত্য সত্যই পাহাড়গুলি নাই—যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই আকাশ আর সমুদ্র।

মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির হয়ে আরবিরেগাস্ বল্‌লেন—"নিরাশ হয়ো না ডোরিজেন্! ভগবানের ইচ্ছা হলে এরূপ আরও অদ্ভুত ঘটনা হয়ে আমাদিগকে রক্ষাও করতে পারে। কিন্তু যাই হোক্, তোমাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে। তারপর আমাদের ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে। সত্য রক্ষা করাই মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ।" এই কথা বলতে বলতে আরবিরেগাসের চোখ দিয়েও ঝর ঝর ক'রে জল পড়িতে লাগল।

পরদিন প্রাতঃকালে আরবিরেগাস্ বল্‌লেন—"যাও ডোরিজেন! তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর গিয়ে"। ইহার পর একজন সখী ও এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে ডোরিজেন বাহির হলেন।

এদিকে অরিলিয়াস্ কয়দিন ধরে প্রাসাদের দরজায় পাহারা দিচ্ছেন—ডোরিজেন কি করেন, কোথা যান তা দেখ্‌বার জন্য। ডোরিজেন প্রাসাদের বাহির হবামাত্র অরিলিয়াস্ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কোথা যাচ্ছেন?" ডোরিজেন্ শান্ত হ'য়ে বলিলেন—"মহাবীর আরবিরেগাসের আদেশে আমার এই অমূল্য মণি তোমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তোমারই কাছে চলেছি"।

একথা শুনে অরিলিয়াস্ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ডোরিজেনের করুণ মুখে তেজস্বিতার আলোক দেখে আর আরবিরেগাসার অটল মহত্বের কথা ভেবে ভক্তিতে তার শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠ্‌লেন "আমি কি এমনই নিষ্ঠুর? ফিরে যান আর প্রতিজ্ঞাপালন কর্‌তে হবে না। আমার দাবী আমি ফিরিয়ে নিলাম। আপনার স্বামীকে গিয়ে বলুন—আপনাদের আশ্চর্য্য মহত্ব দেখে আমার চোখ ফুটেছে। আমি আজীবন কষ্ট পাই সেও ভাল তবু সামান্য লোভের জন্য আপনাদের কষ্টের কারণ হতে চাই না।" মনের আনন্দে তাকে সহস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ডোরিজেন স্বামীকে এই সুখবর দিবার জন্য ছুটে বাড়ী ফিরে আসলেন।

এদিকে, যাদুকরের প্রাপ্য হাজার মোহরের কথা ভেবে ভেবে অরিলিয়স্ আর কূল কিনারা দেখ্‌তে পান না। ভাব্‌লেন—"আমার ত সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি করি কি? বাড়ী ঘর সব বিক্রী করে পথের ভিখারী হওয়া ভিন্ন আমার আর উপায় নাই! তবে যদি যাদুকরের নিকট ভিক্ষা করে কিছু দিন সময় নিতে পারি—তবেই রক্ষা।"

এই ভেবে অরিলিয়াস্ তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত পাঁচশ মোহর নিয়ে যাদুকরের কাছে গিয়ে মিনতি করে বল্‌লেন—"এখন এই পাঁচশ মোহর নিন্ আর কিছু সময় দিন, বাকি

টাকা দুই বৎসরের মধ্যে শোধ করে দিব। নতুবা এখনই আমাকে ঘরবাড়ী বিক্রী কর্‌তে হবে।”

একথা শুনে যাদুকর একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—“আমি কি আমার কত মত কাজ করি নাই?”

“নিশ্চয়ই করেছেন, খুব ভাল রকমেই করেছেন।”

“আমার সাহায্যেই কি তুমি মণিটি পাও নাই?”

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অরিলিয়াস্ বল্‌লেন—“না, সেটি পাই নাই।”

“কি! মণি পাও নাই! না পাবার কারণ কি?”

তখন আগা গোড়া সব ঘটনা জানিয়ে অরিলিয়াস্ বল্‌লেন—“ডোরিজেন্ মণিটি নিয়ে আমাকে দিতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নিজের প্রতি এমন ধিক্কার জন্মে গেল যে তাঁর প্রতিজ্ঞা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি।”

যাদুকর অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর বল্‌লেন—“ভাই! তোমরা সকলেই অতি মহৎ কাজ করেছ। তোমরা বড় লোক আর আমি সামান্য যাদুকর! কিন্তু তা বলে মনে করোনা যে ভগবান আমার মনেও কোন রকম মহত্ব দেন নাই। যাও ভাই! আমিও তোমাকে ঋণদায় থেকে মুক্তি দিলাম! এখানে যেসব মহৎ শিক্ষা পেলাম, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।” এই বলে যাদুকর ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

ডোরিজেন্ ও আরবিরেগাস্ প্রাসাদের নিকটেই পাহাড়ের উপর বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা দেখলেন একজন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে আর সমুদ্র থেকে একটা অদ্ভুত সাদা রঙের কুয়াশা উঠে তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

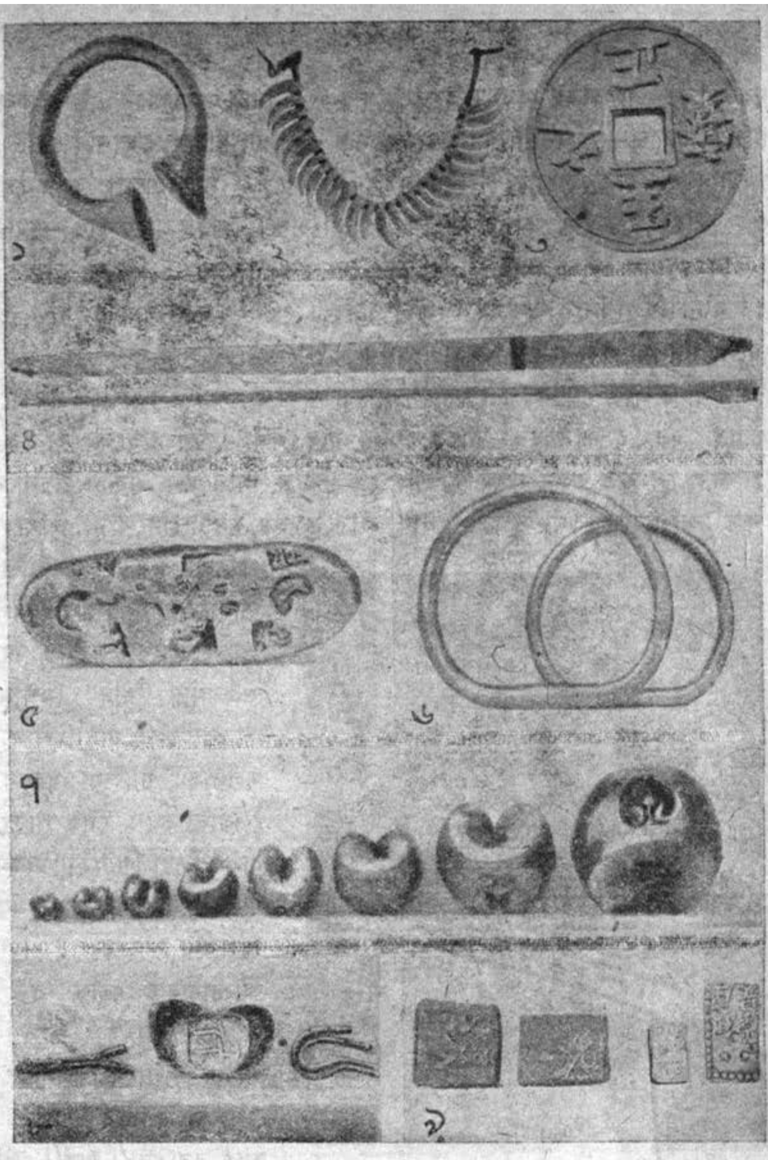
আর সমুদ্রের ধারে সেই কাল বিদ্‌ঘুটে পাহাড় গুলো আবার আকাশ ভেদ করে দেখা দিয়েছে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

মুদ্রার কথা

আমাদের দেশে সরকারী টাঁকশালে টাকা পয়সা প্রভৃতি 'মুদ্রা' তৈয়ারি হয়। এই মুদ্রার হিসাবেই সব জিনিষের দর দাম ঠিক হয়। তাই কোন জিনিষের দাম বলিতে হইলে আমরা বলি 'এত' টাকা বা 'এত' পয়সা। সকল সভ্য দেশেরই এই নিয়ম। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মুদ্রার প্রচলন নাই ; এক জিনিষের বদলে অন্য জিনিষ লওয়াই সে সকল দেশের কেনা বেচার নিয়ম। আবার কোন কোন দেশে নানা রকম কাজের জিনিষ মুদ্রারূপে চলে, যেমন,—আফ্রিকা ও নিউগিনিতে ক্রীতদাস, ল্যাপল্যাণ্ডে হরিণ, লাওস্ দেশে নূন, সাইবিরিয়ায় পশমী চামড়া, আফ্রিকায় কাপড়, কড়ি, পালক ইত্যাদি। কোন কোন দেশে খাবার জিনিষও মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হয়। নানারকম দুষ্প্রাপ্য জিনিষও মুদ্রার কাজ করে। পেলু দ্বীপের অধিবাসীরা কতকগুলি চিনামাটির মুক্তা ও লাল-মাটির তিন-কোনা চাক্তি যত্ন করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাই তাহাদের দেশের মুদ্রা—সে সকল মুদ্রা ও চাক্তি যে কবে কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহ তাহা জানে না ; কিন্তু মুদ্রাহিসাবে তাহার মূল্য খুব বেশী। পেলু দ্বীপের পাশে য়াপ দ্বীপের অধিবাসীরা বড় বড় পাথরের খণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহার করে। ঐ সকল পাথর য়াপ দ্বীপে পাওয়া যায় না,—পেলু দ্বীপ হইতে আনিতে হয়। যত বড় পাথর, তার তত দাম। ৬০০ টাকার একটা পাথর এত ভারি হয় যে দুই জন লোক অতি কষ্টে তাহা তুলিতে পারে। ঐ সকল দ্বীপের বড়লোকদের বাড়ীর সম্মুখে এই সব পাথরের 'নোট' সারি সারি সাজান থাকে।

এরূপ বড় মুদ্রা আর কোথাও প্রায় দেখা যায় না ; সাধারণতঃ, ছোট খাট মূল্যবান জিনিষই মুদ্রার কাজ করে। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে হরিণের দাঁতের মুদ্রা চলে। কোন কোন দেশে বন্যজন্তুর চামড়া ও কোন দেশে জানোয়ারের খুলি মুদ্রারূপে ব্যবহার হয়। লয়াল্‌টী দ্বীপে শিয়ালের লোমের দড়ি পাকাইয়া মুদ্রা তৈয়ারী হয় ; উহা আবশ্যক মত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। মেক্সিকো দেশে কোকো-সীমের বিচি এখনও মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শামুক, ঝিনুক আর কড়ির মুদ্রাও অনেক দেশে চলে। কড়ির ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও চলিতেছে। আমরা তো কথায়ই বলি 'টাকা কড়ি'। আফ্রিকার অনেক অংশে কড়ি আর শামুক ঝিনুকের মুদ্রা এখনও চলিতেছে। কোন কোন দেশে খাবার জিনিষও মুদ্রারূপে চলিতেছে, যেমন,—ফিলিপাইনে চাউল, মোঙ্গোলিয়ায় চা, আর মধ্য-আফ্রিকায় নূন।



১। আফ্রিকার আংটি মুদ্রা; ২। নিউগিনির হাঙ্গরের দাঁতের মুদ্রামালা; ৩। চীনের সরকারি মুদ্রা; ৪। ইংলণ্ডের প্রাচীন মুদ্রাদণ্ড বা অস্ত্রমুদ্রা; ৫। কোচিনের পত্রমুদ্রা; ৬। চীনের রূপার বালার মুদ্রা; ৭। শ্যামদেশের পুরাতন মুদ্রা; ৮। আরবের বাঁকানল, চীনের রূপার ভেলা, সিংহলের বঁড়শি মুদ্রা; ৯। সুইডেন ও জাপানের চৌকোণা মুদ্রা (৩০০ ও ১৫০ বৎসর আগেকার)।

মুদ্রায় ধাতুর ব্যবহারই সব চাইতে বেশী। নানান আকারে এই সকল ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত আছে,—কোনটা গোল বলের মত, কোনটা চাক্তি, কোনটা ছোট ডাণ্ডার মত কোনটা বালার মত, ইত্যাদি। কোন কোন দেশের মুদ্রা এরূপ আকারের থাকে যে সহজেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লওয়া যায়। মধ্য আফ্রিকায় তামার অথবা পিতলের তার মুদ্রার কাজ করে; এবং চীন দেশে রূপার ডাণ্ডা এখনও চলিত আছে। চীনদেশের সরকারি পয়সার মাঝখানে ফুঁটা থাকে। সেই ফুঁটার মধ্যে দড়ি চালাইয়া পয়সার মালা গাঁথিয়া লইলে বেশ সুবিধা হয়!

মুদ্রার কথা বলিতে গেলেই টাঁকশালের কথা বলিতে হয়। টাঁকশালে যেখানে টাকা পয়সা তৈয়ারী হয়, সেখানকার কলকারখানা যদি দেখ তাহা হইলে অবাক হইয়া থাকিবে। কলে যে কত রকম সূক্ষ্ম কাজ হইতে পারে, আর এক একটা পয়সা করিবার জন্য যে কত আশ্চর্য্য রকম সূক্ষ্ম হিসাব করিতে হয়, সেটা চোখে না দেখিলে বোঝা কঠিন। বড় বড় দাঁড়ি পাল্লা, তাহাতে তামা রূপা নিখুঁৎভাবে ওজন করিয়া তাহার সঙ্গে ঠিক ওজনমত "খাদ" মিশান হয়। তারপর সেই খাদ-মিশান ধাতুকে গলাইয়া ঢালিয়া ধাতুর পাত তৈয়ারী হয়। সেই পাতকে বার বার দলিয়া পিটাইয়া সূক্ষ্ম কলে মাপিয়া ঠিক দরকার-মত পুরু করা হয়। তারপর তাহা হইতে আন্দাজমত ছোট বড় চাক্তি কাটিয়া বাহির করে। সেই চাক্তি গুলাকে অসম্ভব চাপে ফেলিয়া তাহার উপর মুদ্রার ছাপ বসাইয়া দেয়। তারপর আরও খুঁটিনাটি কাজ করিয়া মুদ্রাগুলিকে কলে বাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া বস্তাবন্দীর জন্য কলে চালান দেওয়া হয়।



"বস্তাবন্দীর" কল

সেখানে একটা মস্ত কলের একমুখে টাকা বা পয়সা ঢালিয়া দেয় আর অন্য মুখে সেই টাকা পয়সা "গুন্‌তি" হইয়া একেবারে তোড়াবাঁধা অবস্থায় বাহির হয়। কেবল তাহাই নয়, ইহার মধ্যে বাজে বা অচল টাকা থাকিলে, অর্থাৎ কোন টাকা ওজনে কম বেশী থাকিলে, সেটাকা আপনা হইতে আল্‌গা হইয়া একটা বাক্সের মধ্যে জমা হইতে থাকে। সেই টাকা আর বাজারে বাহির হইতে পারে না।

শ্রীসুবিনয় রায়।

লক্ষ্মী-পক্ষী

লক্ষ্মী-পক্ষী দুই বোন—তাদের মা ছিল না। পক্ষী ছিল রাগী, হিংসুটে আর ঝগড়াটী, আর লক্ষ্মী ছিল ঠিক তার নামেরই মত। তারা থাক্‌ত তাদের বুড়ী ঠাকু'মার কাছে আর তাদের বাবা থাক্‌তেন অনেক দূরে এক সহরের ধারে।

একদিন লক্ষ্মী বল্‌ল, "পক্ষী বোন! চল না ভাই একবার গিয়ে বাবাকে দেখে আসি—অনেক দিন দেখ্‌তে যাইনি তাঁকে। আমাদের দেখ্‌লে তিনি কত খুসী হবেন!"

পক্ষী গাল ফুলিয়ে বল্‌ল, "তোমার খুসী হয় যাও! বুড়োকে খুসী কর্‌বার জন্য এতদূর পথ হাঁট্‌তে গেলাম আর কি!"

লক্ষ্মী আর কি করে? সে একাই রওয়ানা হ'ল। যেতে যেতে সে দেখ্‌ল একটা কুলগাছ তাকে বল্‌ছে, "লক্ষ্মী ভাই! আমার ডালপালাগুলোকে একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক ক'রে দাও না; আমার ভারি অসুবিধা হচ্ছে।" লক্ষ্মী বল্‌ল, "সত্যিই তো ভাই!" ব'লেই সে তাড়াতাড়ি গাছের ডালপালা সব ঠিকঠাক ক'রে পরিষ্কার ক'রে দিল।

আর কিছু দূর গিয়ে সে দেখ্‌ল একটা আগুণ তাকে বল্‌ছে, "আমার চুল্লিটা একটু পরিষ্কার ক'রে দাও না ভাই; আমি ছাই চাপা প'ড়ে দম আট্‌কে মর্‌ছি"। লক্ষ্মীও তাড়াতাড়ি উনুনের ছাই তুলে আগুণটাকে উস্কিয়ে দিল।

আরো কিছুদূর গিয়ে সে দেখ্‌ল একটি ছোট ঝরণা তাকে বল্‌ছে, "লক্ষ্মী ভাই! বালী আর শুক্‌নো পাতায় আমার স্রোত যে বন্ধ হয়ে এল; একটু পরিষ্কার ক'রে দাও না ভাই।" লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি পাতা আর বালী সরিয়ে দিল, আর ঝরণাও আবার কুল্ কুল্ ক'রে বইতে লাগ্‌ল।

আবার কিছুদূর গিয়ে সে দেখ্‌ল একটা বটগাছ তা'কে বল্‌ছে, "লক্ষ্মী ভাই! আমার এই ভাঙা ডালটাকে একটু বেঁধে দাও না ভাই; না হ'লে ও বেচারা ম'রেই যাবে।" লক্ষ্মীও তখনই সেই ভাঙ্গা ডালটাকে বেশ যত্ন ক'রে বেঁধে দিল।

এম্‌নি ক'রে যেতে যেতে সে তার বাবার বাড়ী পৌঁছে গেল। বুড়ো বাবা মেয়েকে দেখে এত খুসী হলেন যে তিনি তাকে আর কিছুতেই ছাড়্‌তে চান্‌ না। শেষটায় তাকে একটা মহিষ, একটা চর্‌কা কতগুলো হাঁড়ি-বাসন, বিছানা, কাপড়-চোপড়, আরো নানান জিনিষ দিয়ে বিদায় দিলেন। লক্ষ্মী সেই জিনিষগুলো মহিষের পিঠে বেঁধে দিয়ে মহিষ নিয়ে রওয়ানা হ'ল।

যেতে যেতে সেই বটগাছের কাছে এলে, বটগাছ বল্‌ল, "লক্ষ্মী ভাই! যে ভাঙ্গা ডালটিকে তুমি জুড়েছ, সে তোমার জন্য কেমন মুক্তোর মালা রেখেছে দেখ। এক রাজপুত্রের পাগড়ি থেকে এটা ওঠান হয়েছে। তুমি ওটা নাও।" লক্ষ্মী চেয়ে দেখে সত্যিই সে ডাল থেকে একটা সুন্দর মুক্তোর মালা ঝুল্‌ছে। সে অম্‌নি সেই মালাটা গলায় প'রে নিল।

আর কিছু দূর গিয়ে সেই ঝরণার ধারে এলে সে শুন্‌তে পেল যে ঝরণা বল্‌ছে, "লক্ষ্মী ভাই! এই সুন্দর শাড়ীটা তোমার জন্য অনেক দূর থেকে ভাসিয়ে এনেছি; তুমি এটা নাও।" লক্ষ্মীও তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে নিল।

আরো কিছু দূর গিয়ে সে আগুণের কাছে এল, আর আগুণ তাকে বল্‌ল, "লক্ষ্মী ভাই! আগুণের পাশে কেমন মিষ্টি পিঠে রয়েছে দেখ; তোমার জন্যই এগুলো তৈরী করিয়েছি। তুমি এগুলো খাও।" লক্ষ্মী সেগুলোকে আগুণ থেকে নামিয়ে, অর্দ্ধেক নিজে খেল খেল, আর বাকি অর্দ্ধেক পক্ষীর জন্য রেখে দিল।

আরো কিছু দূর গিয়ে সে কুলগাছের কাছে এল, আর কুলগাছ তাকে বল্‌ল, "লক্ষ্মী ভাই। একবার আমার দিকে তাকাও দেখি! আমার ডালে যে সব কূল রয়েছে সে সবই তোমার। তোমার জন্যই এ সব কূল পাকিয়েছি।" লক্ষ্মী দেখ্‌ল যে সত্যিই কূলগাছে অনেকগুলি সুন্দর গোল গোল কূল পেকে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কোঁচড় ভ'রে কূল পেড়ে নিল, আর তার অর্দ্ধেক খেয়ে বাকি অর্দ্ধেক পক্ষীর জন্য রেখে দিল।

তারপর সে বাড়ী এসে পক্ষীকে সব জিনিষ দেখাল আর কূল আর পিঠে খেতে দিল। পক্ষী কিন্তু সে সব দেখে মোটেই খুসী হ'লো না। সে রাগে আর হিংসায় গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বেচারা তা' দেখে বড়ই দুঃখিত হ'ল। কি আর কর্‌বে?

সে পক্ষীকে বল্‌ল, "দিদি, তুমিও একবার যাও না; তা' হ'লে তো তুমিও এ সব জিনিষ পেতে পার।"

পক্ষী তার পরের দিন সকালেই জিনিষের লোভে বাপের-বাড়ী রওয়ানা হ'লো। কুলগাছের সঙ্গে দেখা হ'লে কুলগাছ তাকেও বল্‌ল, "পক্ষী ভাই! আমার ডালপালা একটু পরিষ্কার ক'রে দাও না ভাই; আমার ভারি অসুবিধা হচ্ছে।" পক্ষী কিন্তু নাক সিঁটকিয়ে বল্‌ল, "আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই; ব'সে ব'সে তোমার ডালপালা সাফ্ করি আর কি!" এই ব'লে সে আবার রওয়ানা হ'ল।

আগুণের সঙ্গে দেখা হ'লে আগুণ তাকে বল্‌ল, "পক্ষী ভাই! ছাই চাপা প'ড়ে আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে; চুল্লিটা একটু পরিষ্কার ক'রে দাও না ভাই।" পক্ষী বল্‌ল, "ব'য়ে গেছে আমার! ততক্ষণে আমি দু' মাইল পথ হেঁটে চলে যাব।" ব'লে সে আবার ছুটে চল্‌ল।

বটগাছের সঙ্গে দেখা হ'লে বটগাছ তা'কে বল্‌ল, "পক্ষী ভাই! আমার এই ভাঙা ডালটিকে একটু বেঁধে দাও না ভাই; না হ'লে ও মরেই যাবে।" পক্ষী বল্‌ল, "ও মর্‌বে তো আমার কি? তা' বলে আমার সময় আমি নষ্ট কর্‌তে পারি না।" ব'লে সে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ঝরণার কাছে এলে ঝরণা যখন তাকে বল্‌ল, "পক্ষী ভাই! বালীতে আর শুক্‌নো পাতায় আমার স্রোত প্রায় বন্ধ ক'রে দিয়েছে; একটু সরিয়ে দাও না ভাই" তখন পক্ষী রেগে তাকে বল্‌ল "অত আবদারের কাজ নেই!" ব'লেই সে চল্‌তে লাগ্‌ল।

বাপের বাড়ী পৌঁছে প্রথমেই সে তার দাদা আর বৌদিকে দেখ্‌তে পেল। তারা দু'জনেই ছিল ঠিক পক্ষীর মত রাগী আর হিংসুটে। পক্ষীকে দেখেই তারা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, হাত মুখ নেড়ে চীৎকার ক'রে বল্‌ল, "ফের, আরেকটা এসেছিস্! কাল আমরা বাড়ী ছিলাম না, আর অম্নি একটা বোন এসে একমোট জিনিষ লুটে নিয়েছে; আজ আবার আরেকটা বোন এসেছে জিনিষের লোভে! শীগ্‌গির পালা—নৈলে মার খাবি"। এই না ব'লে তার বৌদিদি একটা ঝাঁটা দিয়ে পক্ষীকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

পক্ষী তখন আর কি করে? সে চুপি চুপি বাড়ী রওয়ানা হ'লো। ক্ষিধেয় তার পেট জ্বলছে, মার খেয়ে পিঠ জ্বলছে। সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফির্‌ছে আর মনে মনে বল্‌ছে, "মার খেয়েছি তাতে কি হ'লো? ঝরণার কাছে শাড়ীটা তো পাব?"

ঝরণার কাছে এসে সে দেখ্‌ল যে সত্যিই একটা সুন্দর রেশ্‌মী শাড়ী ঝরণার জলে ভেসে চ'লেছে। সে তাড়াতাড়ি শাড়ীটা নেবার জন্য জলে নামল; কিন্তু সেখানে জল এত গভীর ছিল, যে শাড়ী তো নিতে পার্‌লই না, মাঝে থেকে এক চুবুনি খেয়ে উঠ্‌তে হ'লো। পক্ষী বল্‌ল, "শাড়ী নাইবা পেলাম; মুক্তোর মালা তো পাবো!"

বটগাছের কাছে এসে দেখ্‌ল যে সত্যি সত্যিই ভাঙা ডাল থেকে মুক্তোর মালা ঝুল্‌ছে। তাড়াতাড়ি সে মালাটা নেবার জন্য ডাল ধ'রে টান দিল, আর ডালশুদ্ধ ভেঙে ভয়ানক জোরে তার মাথায় পড়্‌ল! ডালের বাড়ি খেয়ে পক্ষী তো মাথা ঘুরে অজ্ঞান! যখন তার জ্ঞান হ'লো তখন সে দেখ্‌ল যে মালাটা ডাল চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে ধূলো হ'য়ে গেছে, আর তার মাথা ফুলে ঢোল হয়েছে।

ততক্ষণে সে বেজায় চটেছে, আর ক্ষিদেয় তার পেট চোঁ চোঁ কর্‌ছে। তখন সে ভাব্‌ল, "থাক গিয়ে মুক্তোর মালা—পিঠেগুলো গিয়ে বেশ আরাম ক'রে খাওয়া যাক্"।

এই না ব'লে সে ছুটে আগুণের কাছে গেল, আর আগুণের উপরে পিঠে দেখে খপ্ ক'রে গরম পিঠে তুলে নিয়ে খেতে গেল। কিন্তু পিঠেগুলো এতই গরম ছিল যে তার আঙ্গুলে ফোস্কা প'ড়ে গেল, আর সে 'উ-হুঃ—হু!' বলে পিঠে ফেলে দিল। যেই না ফেলে দেওয়া অমনি কোত্থেকে কতগুলো কাক এসে পিঠে নিয়ে দে ছুট্!

"ও ছাই পিঠে নাই বা খেলাম, কুল তো আর গরম হবে না!" এই না বলে পক্ষী রাগে গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে কুলগাছের দিকে চল্‌ল। কুলগাছের কাছে এসে সে দেখে যে গাছের আগায় অনেক কুল পেকে রয়েছে। সে কুল পাড়্‌বার জন্য অনেক চেষ্টা কর্‌ল—কুলের কাঁটায় তার হাত মুখ ছড়ে গেল—কিন্তু একটা কুলও পাড়্‌তে পার্‌ল না। তখন নিরাশ হয়ে বাড়ী ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

যখন সে বাড়ী ফির্‌ল তখন তার যা দুর্দ্দশা!—ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ কর্‌ছে, মার খেয়ে গায়ে ব্যথা, পথ চলে পায়ে ব্যথা, কাঁটার খোঁচায় রক্তারক্তি!

শ্রীসুবিনয় রায়।

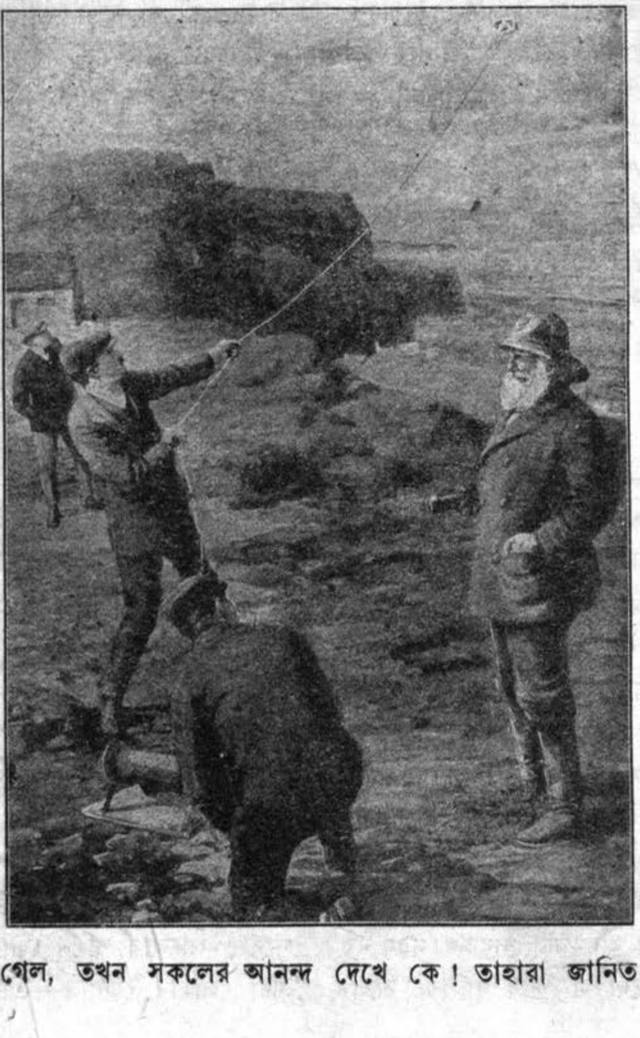
পণ্ডিতের খেলা

সে প্রায় দেড়শত বৎসর আগেকার কথা, একদিন এক ইংরাজ বুড়ী তাহার জানালা দিয়া দেখিতে পাইল যে, পাশের বাড়ীতে বাগানে বসিয়া একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্বুদ উড়াইতেছে। দুদিন চারদিন এই রকম দেখিয়া বুড়ী ভাবিল লোকটা নিশ্চয় পাগল—তা না হইলে, কাজ নাই কর্ম্ম নাই, কেবল কচি খোকার মত বুদ্বুদ লইয়া খেলা—এ আবার কোন্ দেশী আমোদ? বুড়ী তখন ব্যস্ত হইয়া থানায় গিয়া খবর দিল।

যে লোকটি বুদ্বুদ উড়াইত, পুলিশে তাহার খবর লইতে গিয়া দেখিল, তিনি আর কেহ নহেন স্বয়ং সার আইজাক্ নিউটন—যাঁহার মত অত-বড় বিজ্ঞানবীর হাজার বৎসরে দুটি পাওয়া দুষ্কর। বুদ্বুদের গায়ে যে রামধনুর মত জমকালো রং দেখা যায়, নিউটন তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে, আলোক জিনিষটা যে কি, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

মেঘের গায়ে রামধনুকের রং দেখিতে যে খুবই সুন্দর তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিলে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগে। শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন্ খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচের ঝাড়ে কেমন করিয়া ঝিকমিক করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেখায় আর পণ্ডিতের দেখায় অনেক তফাৎ। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানা রকমে খেলাইয়া দেখিলেন, আসল ব্যাপারটা কি। তারপর এই একই ব্যাপারের সন্ধান করিয়া কত পণ্ডিত যে কত নূতন তত্ত্ব বাহির করিলেন, তাহার আর অন্ত নাই। কিন্তু আজও তাঁহাদের কৌতূহল মিটে নাই। বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্রে সূর্য্যের আলোক দেখায় যেন রামধনুকের ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে রঙের মালা কেমন করিয়া সাজান থাকে পণ্ডিতেরা হাজার রকম উপায়ে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এক এক রকম আলোর এক এক রকম রঙিন্ মালা। সূর্য্যের আলোক বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে সূর্য্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তাহার বাইরের আগুণটা সেরকম গরম নয়। সূর্য্যের আলোর রঙিন্ ছটায় তাঁহারা এক একটা চিহ্ন দেখেন আর মাপিয়া বলেন, "এটা লোহার জ্যোতি—এটা

হাইড্রোজেনের আলো—এইটা গন্ধকের চিহ্ন, এইটা অঙ্গারের রেখা, এইটা ক্ষারের ধাতুর এইটা চূণের ধাতুর—ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলাইয়া তাঁহারা বলিতে পারেন, এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন, এই তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই সমস্ত সঙ্কেত শিখিবার মূলে ঐ রামধনুক দেখিবার কৌতূহল!



নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে কতগুলা লোক প্রতিদিন ঘুড়ি উড়াইত, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। সেখানকার নাবিকেরা এই "নিষ্কর্ম্মা" লোকেদের ছেলেখেলা দেখিয়া ঠাট্টা তামাসা করিত। তাহারা জানিত না যে ঐ নিষ্কর্ম্মার সর্দ্দারটির নাম মার্কনি—সেই মার্কনি, যিনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কল বানাইয়াছেন। তারের সূতায় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে উড়িত, আর একটা লোক সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের কল জুড়িয়া কাণ পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তারপর একদিন যখন সেই টেলিফোনের কলের মধ্যে টক্‌টক্ শব্দ শোনা গেল, তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! তাহারা জানিত যে ঐ শব্দ আসিতেছে

অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার হইতে। এম্‌নি করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় বিনা তারে বিদ্যুতের খবর চলিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ডের যাঁহারা নামজাদা পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এক দপ্তরীর পুরাতন বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া ফ্যারাডে অবসর মত দোকানের বইগুলা পড়িতেন। এমনি করিয়া তাঁহার মনে শিখিবার আগ্রহ জাগিয়াছিল। তারপর এক অজানা ভদ্রলোকের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভাল বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সেই কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যুতের শক্তিতে কল চালাইবার সঙ্কেত তিনিই আবিষ্কার করেন। বিদ্যুতের কল এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলিতেছে—বিদ্যুৎ ছাড়া সভাদেশের কাজ চলাই অসম্ভব। অথচ ফ্যারাডে যখন সর্ব্বপ্রথমে একটি ছোট চাকাকে বিদ্যুতের বলে ঘুরাইবার সঙ্কেত দেখাইলেন, তখন অনেক লোকেই সেটাকে নেহাৎ একটা তামাসার জিনিযমাত্র মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ ফ্যারাডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এই রকমের খেলনা বানাইয়া তাঁহার মত পণ্ডিত লোকের লাভ কি? ফ্যারাডে হাসিয়া বলিতেন, "নূতন একটা জ্ঞান লাভ করিলাম, ইহাইত যথেষ্ট লাভ। আর কোন লাভ যদি নাও হয় তাহাতেই বা দুঃখ কি?"

গ্রামোফোনের কথা জানে না, এমন্ শিক্ষিত লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। কিন্তু শব্দকে যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায়, একথাটা কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত মানুষের কল্পনায় আসে নাই। এডিসন যখন ফনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ ভয় পাইয়াছিল। ঘরে মানুষ নাই তিনি কেবল একটা চোঙ্গার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তারপর চোঙ্গার মুখে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন—এই রকম ব্যাপার তাহারা সর্ব্বদাই দেখিত! তারপর এডিসন্ যখন তাহাদের ডাকিয়া কলের আওয়াজ শুনাইলেন—তখন কলের মধ্যে বিকৃতগলায় মানুষের মত শব্দ শুনিয়া তাহাদের ভয়টা ঘোচে নাই কিন্তু এইটুকু তাহারা বুঝিয়াছিল যে ব্যাপারটা নেহাৎ পাগলের খেলা নয়।

বিলাতের পিল্‌ট্‌ ডাউন নামক স্থানে কতগুলা মজুর মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরার মত কি সব জিনিষ বাহির হইত, একজন সাহেব সেইগুলা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইত। সে গুলা যে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন মজুরেরা তাহা জানিত না। তাহারা পয়সার লোভে সেই সব সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কিন্তু সাহেবটি পিছন

ফিরিলেই তাহারা হাসাহাসি করিত, আর ইঙ্গিত করিয়া বলিত "লোকটার মাথায় কিছু গোল আছে। একদিন হঠাৎ খুলির হাড়ের মত এক টুকরা জিনিষ পাইয়া সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক চড়িয়া গেল—এবং কিছুদিন বাদে কোথা হইতে এক বুড়া আসিয়া সেই সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া মাটি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। একটার জায়গায় দুইটা পাগলকে দেখিয়া মজুরদেরও আমোদ বাড়িয়া গেল, কারণ ইঁহাদের উৎসাহের কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুজনের চেষ্টায় যাহার আবিষ্কার হইল বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন পিল্ট্‌ডাউনের খুলি। ইহা অতি প্রাচীন কালের একটা মানুষের মাথার টুকরা। কেহ কেহ বলেন এত প্রাচীন মানুষের চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। গত মাসে যবদ্বীপের বানর-মানুষের কথা বলা হইয়াছে; এই মানুষটি তাহার চাইতেও প্রাচীন কি না, সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। কারণ খুলিটার বয়স লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। ইহার জন্য সাহেব দুটি ছয় মাস ধরিয়া মাটিতে বসিয়া 'রাবিশ' ঘাঁটিয়াছিলেন!

বনচাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা-আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেক লোকেই দেখিয়াছে, কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতেই জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কত রকম কৌশল খাটাইয়া কত রকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লও, তবে বুঝিবে বৈজ্ঞানিকের "দেখা" আর সাধারণ লোকের দেখায় তফাৎ কি রকম!

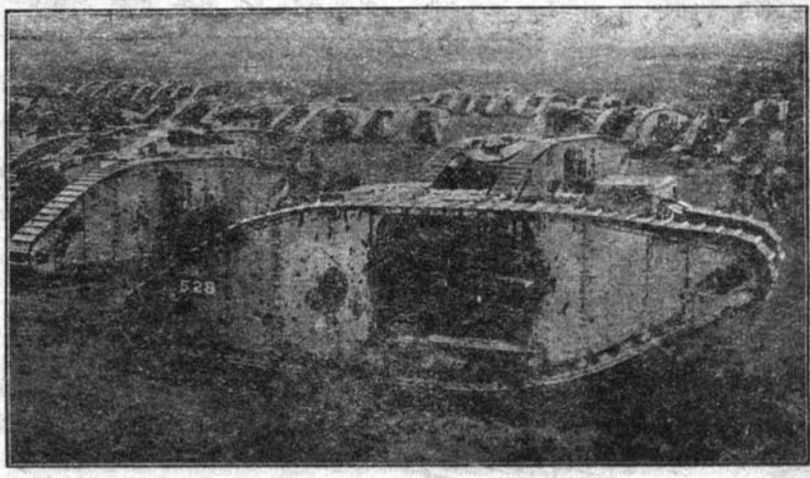
নানাকথা

চলন্ত দুর্গ

বড় বড় যুদ্ধের জাহাজগুলোকে এক একটা চলন্ত দুর্গ বলা যেতে পারে। বর্ম্ম-আঁটা লোহার দুর্গ, তার ভিতর থেকে সে তার অস্ত্র ছুঁড়ে মারে বিশ মাইল পঁচিশ মাইল দূরে। জিনিষটা যে খুবই ভয়ঙ্কর তাতে আর সন্দেহ কি? সে কেবল জলেই থাকে, এতেই যা রক্ষা। ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ সব চাইতে বেশী—তাই ইংরেজের ভয়ে জার্ম্মানির যত জাহাজ সব সমুদ্র ছেড়ে বন্দরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আজকাল আবার ডাঙ্গায় চলবারও দুর্গ হ'য়েছে,—ইংরাজ আর ফরাসিরা হাজার হাজার চলন্ত দুর্গ তৈরী করছে।

মোটর গাড়ীতে বর্ম্ম পরিয়ে কামান চাপিয়ে এক রকম ছোট খাট চলন্ত দুর্গ তৈরী হয়, সেটা কিছু নূতন জিনিষ নয়—এই যুদ্ধের আগেও সে রকম গাড়ীর চলন ছিল। কিন্তু চাকাওয়ালা গাড়ীর পক্ষে সব জায়গায় চলা ফেরা করা সম্ভব নয়। চলবার পথটা যদি চষা ক্ষেতের মত হয়, তার মাঝে মাঝে যদি খাদ কাটান থাকে, আর যেখানে সেখানে কাঠের বেড়া কিম্বা মাটির ঢিপি বসান থাকে, তাহ'লে মোটর চল্‌বে কি ক'রে? সেখানে কোন রকম চাকার গাড়ী চল্‌তে পারে না।

চাকা ছাড়াও গাড়ী চলে? হাঁ চলে বৈকি। শীতের দেশের স্লেজ্ গাড়ীতে চাকা নেই—তার তলাটা হয় নৌকো কিম্বা ধনুকের মত; তাকে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিতে হয়।



কিন্তু এক একটা চলন্ত দুর্গ কত হাজার মণ ভারি—তাকে ত আর হিঁচ্‌ড়ে টানা সহজ নয়। আর সহজ হলেই বা কি? তাকে যদি টেনে টেনেই চালাতে হল তবে সে আর 'চলন্ত' হ'ল কোথায়?

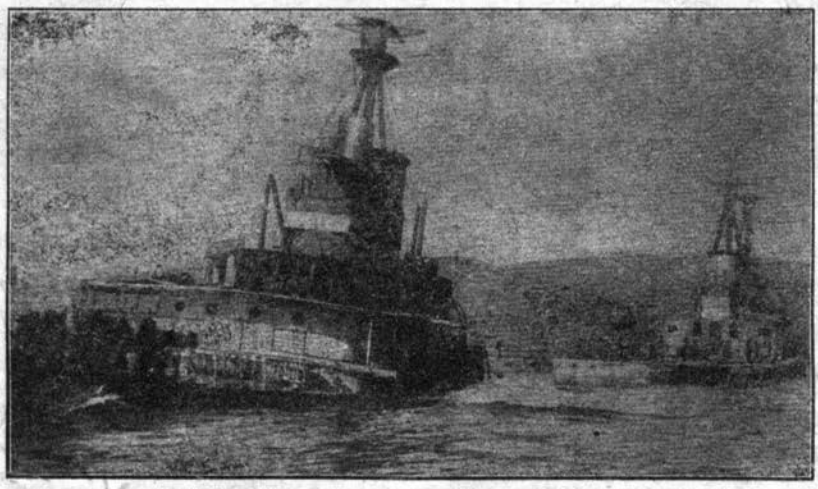
বাইসিকলের পা'দানের চাকায় যে রকম শিকল আঁটা থাকে, সেই রকম একটা শিকল যদি তার বড় বড় চাকা দুটোর উপর দিয়ে জড়ান থাকৃত, তাহ'লে কি রকম হ'ত? চলন্ত দুর্গের চল্‌বার ব্যবস্থাটা অনেকটা সেই রকম।

দুর্গের কল কব্জা কিছুই বাইরে থেকে বুঝবার যে নেই। দুর্গের দুপাশে দুটো 'পায়া'—দেখ্‌তে যেন মাছের মত—তার ভিতরে অনেকগুলো চাকা আছে। চাকাগুলো একটা

ধাপ বাঁধা লোহার ফিতে দিয়ে মোড়া। ভিতরের কল যখন চলে ফিতেটাও চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তে থাকে। ধাপে ধাপে ফিতার উপর ভর ক'রে দুর্গটা ঠিক যেন শুঁয়ো পোকার মত পা ফেলে গুটি গুটি চল্‌তে থাকে। এক একটা দশ বিশ বা চল্লিশ পঞ্চাশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা। ঘরদালানের মত প্রকাণ্ড জিনিষ, সে যখন বিনাচাকায় সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে চলে বেড়ায় তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য হয়। যুদ্ধের খানা খন্দ 'পরিখা' তার কাছে সামান্য আঁচড়ের মত। সেগুলোর উপর দিয়ে সে অনায়াসেই চ'লে যায়। কাঠের ঠেকা তারের বেড়া মাটির দেয়াল ঝোপ জঙ্গল সব তার ধাক্কা লেগে ঝট্‌কে পড়ে। উঁচু উঁচু ঢিপিগুলোতে যখন সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেলে দুলে উঠ্‌তে থাকে, তখন তার কস্‌রৎ চোখে দেখলেও অসম্ভব মনে হয়। আর যখন সে দলে দলে গম্ভীর ভাবে শত্রুর দিকে এগুতে থাকে আর ডাইনে বাঁয়ে গোলাগুলি ছিটাতে থাকে তখন শত্রুর মনরে অবস্থাটা কি রকম হয় সেটাও বেশ বুঝতে পার।

নকল জাহাজ

এক এক রকম জন্তু আছে, তারা আসলে নিরীহ ভালমানুষ, কিন্তু তাদের চেহারাটা দেখ্‌তে ভয়ানক। সন্দেশে একবার গিরগিটির কথা ছাপান হয়েছিল, তাতে একটা



কাঁটাওয়ালা গিরগিটির ছবি ছিল। সেটা ঠিক এই রকমের জন্তু। মানুষের মধ্যেও এই

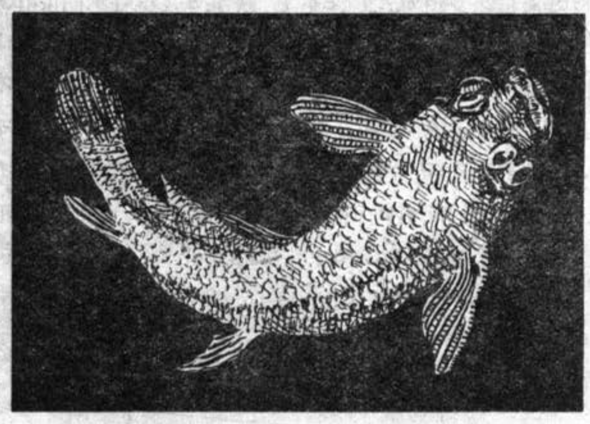
রকম নকল বীরের অভাব নাই। কত লোক আছে, তারা জোব্বা জাব্বা এঁটে, পাগ্‌ড়ী বেঁধে, তলোয়ার ঝুলিয়ে, গ্যাট্‌ গ্যাট্‌ ক'রে চলে বেড়ায়—তাদের দেখ্‌লে মনে হয়, না জানি কত বড় বীর! কিন্তু কাজের সময়ে তারা সকলেই যে খুব বীরত্বের পরিচয় দেয়, তা নয়। এখানে যে ছুটি যুদ্ধের জাহাজের ছবি দেওয়া হ'ল এরাও যে কি রকম যোদ্ধা তার একটু বর্ণনা শোন। দূর থেকে দেখায় যেন ওর কামানগুলো সব মুখ বা'র ক'রে আছে—একবার শত্রুর দেখা পেলেই হয়। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ্‌বে "কামান" গুলো শুধু কাঠের চোঙা—তার গোলাও নেই, গোলা ছুঁড়্‌বার কোন সরঞ্জামও নেই। তারপর, ঐ যে তার বর্ম্ম-আঁটা শরারটি, ওটাও নেহাৎ ফাঁকি—কারণ ওর উপরে হাতুড়ি পিট্‌লেই ঢপ্‌ ঢপ্‌ আওয়াজ শুনে বুঝবে যে ওটা কাঠের তৈরী, কেবল লোহার মত রং করা হ'য়েছে। ঐ যে চূড়োর উপর মাস্তুলঘর, ওটা হ'চ্ছে ক্যাম্বিসের তৈরী। বল্‌তে গেলে আগাগোড়া জাহাজটাই কাঠ ক্যাম্বিস আর টিনের ব্যাপার! বহুকালের পুরান জাহাজের খোলের মধ্যে সেকেলে কলকব্জা বসিয়ে অতি সস্তায় জাহাজটিকে খাড়া করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার, মিছামিছি এ রকম অপদার্থ জাহাজ বানিয়ে লাভ কি? লাভ এই যে, শত্রুকে বোকা বানাবার সুবিধা হয়। এই জাহাজ যখন গম্ভীর ভাবে ধোঁয়া উড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তখন কে বল্‌বে যে সে যুদ্ধের জাহাজ নয়? শত্রুর ছোটখাট জাহাজগুলো তাকে দূর থেকে দেখেই মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। ইংরাজেরা এই রকম চৌদ্দটা জাহাজ বানিয়ে প্রায় দেড় বছর তাদের সমুদ্রে ঘুরিয়েছিল। জার্ম্মানেরা অনেকদিন পর্য্যন্ত এই ফিকিরটা বুঝতে পারেনি। একবার তারা এই রকম একটা জাহাজকে ডুবিয়ে "ইংরাজের মস্ত যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছি" বলে ফূর্ত্তি ক'রেছিল।

অদ্ভুত মাছ

নদীতে আর সমুদ্রে যত রকম মাছ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অদ্ভুত মাছের কোন অভাব নাই। কাহারও চেহারা অদ্ভুত, কাহারও চালচলন অদ্ভুত, কাহারও আহার বিহার বাসাবাড়ী সবই অদ্ভুত। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্‌টার কথা যে বলিব আর কোন্‌টা যে বাদ দিব তাহা ঠিক করাই কঠিন।

প্রথমে চারিচক্ষু-মাছের কথা বলি। মাকড়ষার নাকি আট দশটা চোখ থাকে কিন্তু পোকা মাকড় ছাড়া আর কোন প্রাণীর যে দুইটার বেশী চোখ হয় একথা আর

শুনিয়াছ কি ? কোন কোন জানোয়ারের দেখা যায় কপালের কাছে একটা করিয়া চোখের মত থাকে—কিন্তু "চোখের মত" হইলেও সেটা চোখ নয়, তাহাতে দেখার কাজ চলে না। কিন্তু এই মাছের যে দুজোড়া চোখ তাহার প্রত্যেকটিই সত্যিকারের চোখ। দুই দুইটা চোখ এক সঙ্গে উপর নীচ করিয়া বসান; মাছ যখন জলে ভাসে তখন উপরের এক জোড়া চোখ থাকে জলের বাহিরে, আর নীচের জোড়া জলের তলায়। যে জোড়া জলের উপরে থাকে তাহার গড়ন ঠিক সাধারণ মাছের মত নয়—তাহাতে জলের নীচে দেখিবার সুবিধা হয় না। আর নীচের জোড়া ঠিক সাধারণ মত চোখ তাহাতেও জলের বাহিরের কোন জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় না। জলের ভিতর ও বাহির একসঙ্গে দেখিবার বিশেষ কোন দরকার ইহার ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থাটায় যে কাজের কতকটা সুবিধা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক রকম চশমা আছে তাহাকে "বাই-ফোক্যাল্ বলে —সেই চশমার উপরের আধখানা এক রকম কাঁচ, তাহাতে দূরের জিনিষ দেখিবার সুবিধা হয়, আর নীচের আধখানা আর এক রকম —তাহাতে পড়া শুনার কাজ চলে। এই মাছের চোখটা ঠিক যেন "বাই-ফোকাল" চোখ।



চোখের কথা বলিতে গেলে আর একটি মাছের কথাও বলিতে হয়। সে মাছের একদিকে দুইটা চোখ, আর একদিকে চোখ নাই। এরকম এক দিক কানা হইবার অর্থ কি জান ? মাছটার স্বভাব এই যে, সে কাদার মধ্যে কাৎ হইয়া শুইয়া থাকে। যে দিকটা কাদার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সে দিকটায় চোখ থাকা না থাকা সমান কথা—তাই তাহার দুইটা চোখই থাকে মুখের একপাশে—যে পাশটা আকাশের দিকে ফিরান সেই পাশে।

আফ্রিকার নীল নদীতে এক রকম মাছ আছে সে চিৎ হইয়া চলে। চলার এ রকম

অদ্ভুত ভঙ্গী হইবার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই যে, ইহাদের পেটের চাইতে পিঠের রংটা অনেক বেশী সাদা। সাদা পিঠটা আলোর দিকে থাকিলে চক্‌চক্ করে— তাহাতে মাছটার গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার সুবিধা হয় না। তাই সে কাল পেটটাকে উপর দিকে ধরিয়া আপনাকে জলের মধ্যে বেশ বেমালুম করিয়া রাখে। জানোয়ারের মধ্যে মানুষ কাঙ্গারু প্রভৃতি জন্তু যেমন খাড়া হইয়া চলে, মাছেদের মধ্যেও এমন এক একজন আছেন যাঁরা মানুষের মত খাড়া হইয়া চলেন। বিশেষত একজন অছেন, তিনি সমুদ্রে থাকেন, তিনি কেবল খাড়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন না—তাঁর মাথাটি আবার ডিগবাজি নীচের দিকে রাখা চাই। এই মাছের চেহারাটিও অদ্ভুত ছুঁচাল রকমের, তাই ইংরাজিতে ইহার নাম Needle fish বা ছুঁচ মাছ। সমুদ্রে এক রকম চাঁদা মাছ আছে, তাহারা রাগিলে বা ভয় পাইলে পেটটাকে ফুটবলের মত ফুলাইয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন ফোলা পেটটি জলের উপর বাহির হইয়া ভারি অদ্ভুত দেখায়। কোন কোন চাঁদামাছের গায়ে আঁশের বদলে কাঁটা বসান থাকে—রাগের সময় সেগুলি সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠে।



চেহারার কথা যদি বল, মাছের চেহারা যে কত অদ্ভুত রকমের হইতে পারে তার কিছু কিছু নমুনা সন্দেশে মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়াছে। সেই "থলেগলা চাবুক-লেজ" যার গলায় লম্বা থলি আর ল্যাজটি চাবুকের মত; সেই বঁড়্শিবাজ মাছ যার নাকের উপর ছড়ি, তার আগায় টোপের মত নোলক, আর যার যত বড় গা ততবড় হাঁ; সেই শয়তান মাছ যার চেহারাটা মুখোসপরা সঙের মত; এ সমস্তেরই ছবি সন্দেশে দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকার রাক্ষুসে মাছ, যাহাদের সাংঘাতিক দাঁতের কামড়ে গরু ঘোড়া পর্য্যন্ত প্রাণ হারায়—তাহারও চেহারাটি নেহাৎ ভদ্র মতন নয়।

কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভট বিদ্‌ঘুটে মাছের খোঁজ করিতে হইলে সমুদ্রের গভীর জলে যে সব মাছ থাকে, তাহাদের সংবাদ লইতে হয়। সে দিন এইরূপ কতগুলা মাছের চমৎকার

বর্ণনা পড়িয়াছি! তাহার দু একটি নমুনা শুন। একটি মাছ, তাহার কপালের উপর দুইটা শিং—সেই শিঙের আগায় তার চোখ। শিং দুটাকে সে ইচ্ছামত এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে। তাহার গায়ে আবার সারি সারি আলো বসান—গভীর অন্ধকার সমুদ্রে সেগুলি আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। আর একটা মাছ, তার মুখে লম্বা দাড়ি—দেখিতে অনেকটা গাছের পাতার মত; তার উপর মুখ ভরা বড় বড় গজালের মত দাঁত। অন্ধকারে সমস্তটা দাড়ি জ্বলিতে থাকে। আরেকটি মাছ তাহার চোখ দুইটা ঠোঁটের কোণায়, মনে হয় হাঁ করিলেই চোখ দুইটা গিলিয়া যাইবে! ইহার নাকটা জুতার গোড়ালির মত উঁচু আর হাঁ করিলেই মুখের ভিতরে আলো জ্বলিয়া উঠে—শিকার ধরিবার ভারি সুবিধা। আর একটি মাছ আছে, তাহার সমস্ত শরীরটি লালকালো চিত্র বিচিত্র করা। তাহার চোখ দুইটা এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে সমস্তটা মাথা ভরাই চোখ।

ইহারা সকলেই প্রায় শিকারী মাছ। নিজেদের বাতি দিয়া ইহারা শিকার খোঁজে। কেহ কেহ সমুদ্রের নীচে বাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে; সেই বাতি দেখিয়া যে সব শিকার তামাসা দেখিতে আসে, তাহাদের খপ্ করিয়া গিলিয়া খায়। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা শিকারকে বাগাইবার জন্য নানা রকম অস্ত্রকৌশল খাটাইয়া থাকে। কাহারও বিষাক্ত ল্যাজ চাবুকের মত শিকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, কেহ বিদ্যুৎ চালাইয়া শিকারকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ জোঁকের মত তাহার রক্ত চুষিয়া ধরে আর কেহ পিচকারী মারিয়া ডাঙ্গার শিকারকে জলে পাড়িয়া আনে। টিকটিকির শিকার ধরা দেখিয়াছ? কোন কোন মাছ আছে তাহারাও ঠিক সেই রকম কায়দায় শিকার ধরে। আস্তে আস্তে চুপি চুপি শিকারের পিছনে গিয়া তারপর হঠাৎ, টিকটিকির জিভের মত, তাহাদের মুখটা সরু লম্বা হইয়া শিকারের ঘাড়ে ছুটিয়া পড়ে।

এইবারে একটা মাছের কথা বলিব আমরা তাহার নাম দিয়াছি গেছো-মাছ। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা জলের বাহিরে আসিয়াও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। কই মাছ যে অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটির উপর "কাতরাইয়া" চলিতে পারে, তাহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু মাছ যে আবার সখ করিয়া জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় ওঠে আর রীতিমত গাছে চড়িতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই মাছ আফ্রিকাতেই বেশী পাওয়া যায়। ইহার দুপাশের ডানা দুইটা দেখিতে কতকটা আঙ্গুল-জোড়া পায়ের মত। সেই ডানার উপর ভর করিয়া মাছগুলা অনায়াসে ডাঙ্গায় উঠিয়া

গাছে চড়িয়া বসে। ইহাদের মুখ প্রায়ই ব্যাঙের মত কদাকার হয়—চোখ দুটাও সেই রকম ড্যাবডেবে। এ মাছ খাইতে এমন বিস্বাদ যে মানুষ ত দূরের কথা—ডাঙ্গার কোন জন্তু বা আকাশের পাখীরা পর্য্যন্ত ইহাকে ছোঁয় না। কিন্তু জলের বড় বড় মাছগুলা ইহাদের দেখিলে টপাটপ্ খাইয়া ফেলে। সেই জন্য ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিবার জন্য এক এক সময়ে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠে।



মাছের বিদ্যার কথা অনেক বলা হইল—এইবার আরেকটি বিদ্যার কথা বলিয়াই শেষ করি। সেটি আর কিছু নয়—সঙ্গীত বিদ্যা! অবশ্য সঙ্গীত বলিতে মনে করিও না যে তারা রীতিমত সা-রে-গা-মা সুর করিয়া রাগ রাগিণীর চর্চ্চা করে। কোন কোন মাছ আছে তাহারা একটু আধটু শব্দ করিতে জানে। কেহ ইঁদুরের মত কুট্‌কুট্ শব্দ করে, কেহ অদ্ভুত রকম ঘঁৎঘঁৎ শব্দ করে, আর কেহ বা ডুর্ ডুর্ করিয়া ঢাকের মত আওয়াজ করে। কিন্তু সকলের চাইতে ওস্তাদ যে মাছ, সে দলে বলে সমুদ্র তীরে পড়িয়া মোটা কান্নার মত একরকম অদ্ভুত সুর করিতে থাকে। খানিক দূর হইতে শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যেন মানুষের কোলাহলের সুর!

বাজেগল্প

কলকেতার সাহেব বাড়ী থেকে গোষ্ঠবাবুর ছবি এসেছে। বাড়ীতে তাই হুলস্থুল। চাকর বামুন ধোপা নাপিত দারোগা পেয়াদা সবাই বলে "দৌড়ে চল, দৌড়ে চল"।

যে আসে সেই বলে, "কি চমৎকার ছবি! সাহেবের আঁকা"! বুড়ো যে সরকার মশাই, তিনি বল্‌লেন, "সব চাইতে সুন্দর হ'য়েছে বাবুর মুখের হাসিটুকু—ঠিক তাঁরই মতন ঠাণ্ডা হাসি"! শুনে অবাক হ'য়ে সবাই বল্‌লে "যাহো'ক! সাহেব হাসিটুকু ধরেছে খাসা"।

বাবুর যে বিষ্টুখুড়ো তিনি বল্লেন, "চোখ দুটো যা এঁকেছে, ওরই দাম হাজার টাকা—চোখ দেখ্‌লে, গোষ্ঠর ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে"। শুনে একুশজনে একবাক্যে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

রেধো ধোপা তার কাপড়ের পোটলা নামিয়ে বল্লে, "তোফা ছবি। কাপড়খানার ইস্ত্রি যেন রেধো ধোপার নিজের হাতে করা। নাপিত তার ক্ষুরের থলি দুলিয়ে বল্লে, "আমি উনিশ বছর বাবুর চুল ছাঁট্‌ছি—আমি ঐ চুলের কেতা দেখেই বুঝ্‌তে পারি, একখান ছবির মতন ছবি। আমি যখনই চুল ছাঁটি, বাবু আয়না দেখে ঐ রকম খুসী হ'ন"।

বাবুর আহ্লাদী চাকর কেনারাম বল্লে, "বলব কি ভাই, এমন জলজ্যান্ত ছবি—আমিত ঘরে ঢুকেই এক পেনাম ঠুকে চেয়ে দেখি, বাবুত নয়—ছবি"! সবাই বল্লে "তা ভুল হবারই কথা—আশ্চর্য্য ছবি যাহো'ক্"!

তারপর সবাই মিলে ছবির নাকমুখ গোঁফদাড়ি সমস্ত জিনিষের খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা ক'রে প্রমাণ কর্‌লেন যে সব বিষয়েই বাবুর সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম মিলে যাচ্ছে—সাহেবের বাহাদুরি বটে! এমন সময় বাবু এসে ছবির পাশে দাঁড়ালেন।

বাবু বল্লেন "একটা বড় ভুল হ'য়ে গেছে। কলকেতা থেকে ওরা লিখ্‌ছে যে ভুলে আমার ছবি পাঠাতে, কার যেন ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটা ফেরৎ দিতে হবে"।

শুনে সরকার মশাই মাথা নেড়ে বল্‌লেন "দেখেছ! ওরা ভেবেছে আমায় ঠকাবে! আমি দেখেই ভাবছি অমন ভিরকুটি দেওয়া প্যাখ্‌না হাসি—এ আবার কার ছবি"! খুড়ো বল্লেন "দেখনা! চোখ দুটো যেন উল্‌টে আস্‌ছে—যেন গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া"!

রেধো ধোপা, সেও বল্‌ল "একটা কাপড় পরেছে যেন চাষার মত। ওর সাত জন্মে



কেউ যেন পোষাক করতে শেখেনি"। নাপিত ভায়া মুচকি হেসে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌ল "চুল কেটেছে দেখনা—যেন মাথার উপর কাস্তে চালিয়েছে"। কেনারাম ভীষণ ক্ষেপে চেঁচিয়ে বল্‌লে "আমি সকাল বেলায় ঘরে ঢুকেই চোর ভেবে চমকে উঠেছি। আরেকটু হ'লেই মেরেছিলাম আর কি"! আবার এরা বলছিল ওটা নাকি বাবুর ছবি। আমার সামনে ওকথা বল্‌লে মুখ থুড়ে দিতুম না।"

তখন সবাই মিলে একবাক্যে বল্‌লে যে, সবাই তারা টের পেয়েছিল, এটা বাবুর ছবি নয়। বাবুর নাক কি অমন চ্যাটাল? বাবুর কি হাঁসের পায়ের মত কাণ? ওকি বসেছে, না ভালুক নাচছে?

(২)

কতগুলো ছেলে ছাতের উপর হুড়োহুড়ি ক'রে খেলা করছে—এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল। তার পরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে "হারু পড়ে গেছে" বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চল্‌ল।

খানিক বাদেই শুনি একতালা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠেছে। বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশ বাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হ'য়েছে"? শুন্‌তে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে "হারু পড়ে গিয়েছে"। বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে!

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বল্লেন, "এদিকে ত পড়েনি, ভেতর বাড়ীতে পড়েছে বোধ হয়।" কিন্তু ভেতর বাড়ীতে মেয়েরা বল্‌লেন "এখানে ত পড়েনি—আমরা ত ভাবছি বা'র বাড়ীতে পড়েছে বুঝি"। বাইরেও নেই ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল "কোথায় রে? কোথায় হারু?" তারা বল্‌লে "ছাতের উপর"। সেখানে গিয়ে তারা দেখে, হারু বাবু অভিমান ক'রে বসে বসে কাঁদ্‌ছেন! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারা-মারিতে সে প'ড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। "হারু পড়ে গেছে" ব'লে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানান হ'চ্ছে যে "হারুকে আমরা ফেলে দিইনি—সে পড়ে গেছে ব'লে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হ'চ্ছে"।

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তারশুদ্ধ এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে তার আর নালিশ করাই হ'ল না। যাহো'ক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুসী হ'ল যে শাসন টাসনের কথা কারও মনেই এল না।

সব চেয়ে বেশী জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কাণে শোনেন কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞেস করল "আপনি এত কাঁদ্‌ছিলেন কেন"? তিনি বল্লেন "আমি কি অত জানি? দেখ্‌লুম ঝিয়েরা কাঁদ্‌ছে বৌমা কাঁদ্‌ছেন, তাই আমিও কাঁদ্‌তে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হ'য়ে থাকবে।



আপনি উড়ে বস্‌ল জুড়ে, আমার হ'ল দোষ!
আমার ঘরে চড়াও ক'রে আমায় বলে ফোঁস্‌!
আ-রে মোলো—মাসেক হ'ল ফুট্‌ল সবে চোখ
এরই মধ্যে এমন বিছে? আমায় করে রোখ!

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ আশ্বিন, ১৩২৫ ষষ্ঠ সংখ্যা

ক্ষীর পুতুলের বিয়ে

বামুনপাড়ার বৈশাখী আর চৈতালী তার সই!
ঠিক দুজনায় পান্না সোণায়, মিল্‌টি মানান্‌সই!

সখ আমোদের জীবন তাদের, বয়স অধিক নয়;
কেউ এগার কারুর বার, কোষ্ঠিতে এই কয়।

চৈতাবলীর ক্ষীরপুতলির চাঁদপানা এক ছেলে!
বৈশাখী তার কোল জুড়াবার তেমনি মেয়ে পেলে!

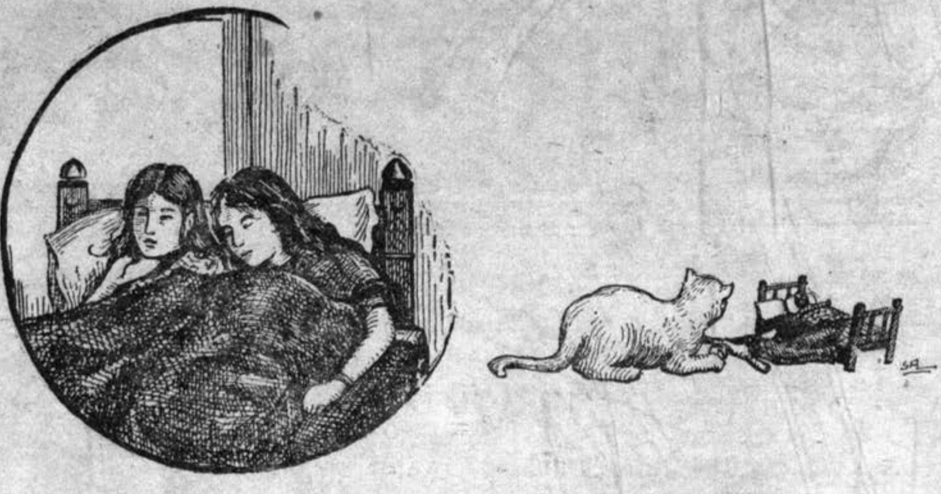
চাঁদটি যখন উঠল তখন বাজ্‌ল বেলা ন'টা!
তারার উদয় সন্ধ্যা সময় রাত্রে বিয়ের ঘটা!

সাজন গোজন, সব আয়োজন, বাজনা উঠে বাজি!
হরষ মনে সই দুজনে বেয়ান হ'তে রাজি!

কনে'য় বরে লগ্ন ধরে বদল হ'ল মালা!
কেউ নাচে গায়! কেউ লুচি খায়! বাসরটি জম্‌কালো!

রাত দুপরে বাসর ঘরে পড়ল সবাই ঢুলে,
জুট্‌ল আসি বাঘের মাসী গাইতে হেলে দুলে!

সেই আবাগী একলা জাগি আসর গরম করে,
ইঞাও ইয়েঁ তান তুলিয়ে বরের কাণে ধরে !



রাত পোহাতে পাল্‌কি সাথে এলেন ছেলের মাতা—
দেখেন চেয়ে বরকে খেয়ে খাচ্ছে কনে'র মাথা !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ওয়াং

(চীনদেশের গল্প)

ওয়াং একটি ছোট ছেলে ; তার বাড়ী চীন দেশে। মা বাবার সঙ্গে সে বেশ সুখে থাকৃত ; হঠাৎ এক বৎসর তাদের দেশে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে ক্ষেতের সব ধান মরে গেল। শেষে আর দু' মুঠো খাবারও ঘরে রইল না ; তারা বড় গরিব হয়ে গেল।

ওয়াং তার বাপ মাকে বড় ভালবাস্‌ত। তাদের কষ্ট তার সহ্য হ'লো না ; সে বল্ল, "আমিই রোজগার ক'রে এনে বাপ মাকে খাওয়াব।"

তখনই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রোজগারের চেষ্টায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। কিছু দূর গিয়েই এক থুড়্‌থুড়ে বুড়োকে দেখ্‌ল। সে বেচারা একেই বুড়ো তায় কুঁজো, তার

উপর আবার পিঠে প্রকাণ্ড ভারী বোঝা নিয়েছে,—কাজেই বুঝতে পার তার কি রকম মুস্কিল! ওয়াং তাকে দেখেই ছুটে গিয়ে বল্‌ল, "তোমার বোঝাটা আমাকে দাও। আমি জোয়ান মানুষ, আমার বইতে কোন কষ্ট হবে না।" বুড়ো শুনে খুসী হ'য়ে বল্‌ল, "লক্ষ্মী ছেলে তুমি!" ব'লে, তাকে বোঝাটা দিয়ে দিল। কিছু দূর যেতেই আকাশে ভয়ানক কালো মেঘ উঠে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে আর বাজ পড়্‌তে আরম্ভ হ'লো।

ওয়াং খুব সাহসী ছিল, কিন্তু বাজের শব্দকে সে বড়ই ভয় কর্‌ত। তাই সে ভয়ে বোঝাটা নামিয়ে হাতে মুখ লুকিয়ে কঁাদ্‌তে লাগল।

বুড়ো লোকটি বল্‌ল, "ও কি হে! বাজ্‌কে ভয় কর্‌ছ কেন? ওতে তো ভয়ের কিছুই নেই।"

ওয়াং তখন কতকটা সাহস ক'রে বল্‌ল, "বাজ কি ক'রে হয়, তা' যদি জান্‌তে পার্‌তাম, তবে বোধ হয় আমার ভয় চ'লে যেত।"

বুড়ো লোকটি বল্‌ল, "তুমি আমার এত উপকার কর্‌লে, আমি ও তোমার একটি উপকার কর্‌ব। বাজ কেমন ক'রে হয় তোমায় দেখিয়ে দেব।"

তার পরেই ওয়াং দেখল যে সে আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যাচ্ছে। চারি দিকে সাদা সাদা মেঘ রয়েছে তার উপর পা দিলে ঠিক মনে হয় যেন নরম বালিশ। মেঘ ফাঁক ক'রে সে নীচেকার সমুদ্র, গ্রাম, পাহাড় কত কি দেখ্‌তে পেল! সবই তখন ছোট্ট হ'য়ে গেছিল। সে ভাবল, "একবার যদি পড়ে যাই তবে না জানি কি কাণ্ড হবে!"

আকাশের গায় তারাগুলো ঠিক হীরের টুক্‌রোর মত ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে! ওয়াং কয়েকটা তারা খুঁটে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু কিছুতেই পার্‌ল না। শেষে একটা ছোট তারা তুলে নিয়ে তার জামার আস্তিনে পুরে রাখ্‌ল।

এমন সময় সে দেখল যে তিনটে ভূত ভয়ানক জুটো খোক্কসের ঘাড়ে চ'ড়ে একটা প্রকাণ্ড গাম্‌লা হাঁকিয়ে চ'লেছে। খোক্কস দুটো যেই লেজ নাড়ছে, অমনি বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে। ওয়াং কিনা চালাক ছেলে, সে তখনি বুঝতে পার্‌ল যে ঐ রকম ক'রেই বাজ পড়ার আওয়াজ হয়।

খোক্কসের পিঠে যে গাম্‌লা ছিল, সেটা জলে ভরা। তিনটে ভূত হাতা নিয়ে তা' থেকে জল তুলে শূন্যে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। ওয়াং কিনা চালাক ছেলে, সে বুঝতে পার্‌ল যে ঐ রকম ক'রেই বৃষ্টি হয়।

ভূতগুলো ওয়াংকে ডেকে বল্‌ল, "আয় না ভাই, একটু জল ঢেলে দিবি।" ওয়াং অম্‌নি একটা হাতা নিয়ে জল ঢালতে আরম্ভ কর্‌ল। যখন তাদের গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে আচ্ছা ক'রে তাদের ক্ষেত আর পুকুরের উপর জল ঢেলে দিল।



তারপর ভূতগুলো বল্‌ল, "ঢের হয়েছে ভাই, আর না। এবার তোকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিই?" ওয়াং বল্‌ল, "আচ্ছা, দেও।" অমনি ভূতগুলো একটা লম্বা দড়ি পৃথিবী পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দিল, আর ওয়াং সড়্ সড়্ ক'রে সেই দড়ি বেয়ে মাটিতে নেমে পড়্‌ল। নেমেই সে ছুটে বাড়ী গেল। সেখানে গিয়ে দেখে তাদের খাল বিল পুকুর ক্ষেত সব জলে ভরা, আর তার বাবা খুব প্রাণপণে মনের সাধে চায করছে! ওয়াংকে দেখে তার বাপ মা যে কি খুসী হ'লো, সে আর কি বল্‌ব! তারপর যখন তারা জান্‌তে পার্‌ল যে ওয়াংই নিজের হাতে জল ঢেলে তাদের ক্ষেত পুকুর খাল বিল সব জলে ভরিয়ে দিয়েছে, তখন তারা আনন্দে নাচতে লাগল! দেখতে দেখতে তাদের ক্ষেতে কত ধান হ'লো, আর তাদের সব কষ্ট ঘুচে গেল।

আর সেই যে তারাটা ওয়াং এনেছিল, সে তারার কথা চীনের রাজা শুন্‌তে পেয়ে একদিন ওয়াংএর বাড়ীতে এসে হাজির হ'লেন। রাজা মশাই লক্ষ মোহর দাম দিয়ে সেটাকে কিনে বাড়ী নিয়ে গেলেন, আর ওয়াং অত টাকা পেয়ে আহ্লাদে তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাগ্‌ল।

———

শ্রীসুবিনয় রায়।

চন্দ্রহংসের উপাখ্যান

(মহাভারত)

কৌণ্ডিল্য নগরের রাজা দধিমুখ ভারি ধার্ম্মিক এবং একান্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তানাদি না জন্মিলে, মনের দুঃখে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের ফলে তাঁহার পরমসুন্দর পুত্র জন্মিল। রাজার মনে আনন্দের সীমা নাই! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার পরদিনই খাদ্যের সঙ্গে বিষ খাইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মনের দুঃখে রাণীও স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিলেন। পরিবারের এক বৃদ্ধা ধাত্রী শিশুটিকে তিনদিন পর্য্যন্ত লালন পালন করিয়া তারপর সেও হঠাৎ মারা পড়িল। তখন অসহায় শিশুটিকে তাহার মাতুল নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন; সেখানে শিশু ক্রমে পাঁচ বৎসরের হইলে তাহার নাম রাখা হইল "চন্দ্রহাস" বা "চন্দ্রহংস"।

রাজা দধিমুখের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধিই তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করে। রাজাকে বধ করিয়া সে নিজে তাঁহার সিংহাসনে বসিল! মনের আনন্দে সে ভাল করিয়া খবর লইল না, এবং জানিতেও পারিল না যে রাজার সন্তান জন্মিয়াছে এবং সে তাহার মামার বাড়ীতে পরমসুখে আছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি রাজা হইয়া কিছুদিন পরে রাজবাড়ীতে পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা করিল। মনে করিল ইহাতেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। প্রতিদিন বহুদূর হইতে নগরবাসিগণ পুরাণ পাঠ শুনিবার জন্য রাজবাড়ীতে আসিতে লাগিল। একদিন অন্য শিশুদের সঙ্গে চন্দ্রহাসও রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত! পুরাণ শুনিতে শুনিতে তাহার মনে ভক্তির উদয় হইল। সভার ব্রাহ্মণগণ এই সুন্দর বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই শিশুটি কাহার? ইহার শরীরে যে রাজার লক্ষণ দেখিতেছি—এ নিশ্চয় একদিন আমাদের রাজা হইবে।" ধৃষ্টবুদ্ধি বলিল—"এ বালক কাহার সন্তান তাহা ত জানি না। এ কৌণ্ডিল্যনগরে রাজা হইবে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা!" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—"ইহার শরীরের লক্ষণ দেখিয়াই জানিয়াছি এ রাজচক্রবর্ত্তী; সুতরাং এখন হইতে তুমি সাবধান হও—আমাদিগের কথা মিথ্যা হইবার নহে।" একথায় ধৃষ্টবুদ্ধি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে বালকটি দধিমুখ রাজার পুত্র চন্দ্রহংস।

ধৃষ্টবুদ্ধি অন্তঃপুরে গিয়া ভাবিল, এই বালককে যেরূপে হউক এখনই বধ করিতে হইবে, নতুবা বৃদ্ধবয়সে আমাকে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে। এই ভাবিয়া সে ঘাতকদিগকে ডাকিয়া গোপনে বলিল—"চন্দ্রহংসকে ফাঁকি দিয়া গভীর বনে লইয়া যাও ; তারপর তাহাকে মারিয়া ফেল। কিন্তু সাবধান ! কেহ যেন জানিতে না পারে !"

ঘাতকেরা চন্দ্রহংসকে নানা কথায় ভুলাইয়া গভীর বনে লইয়া গেল। বন দেখিয়া চন্দ্রহংস ভয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালকের ক্রন্দনে নিষ্ঠুর ঘাতকের প্রাণও গলিয়া গেল। তাহারা যুক্তি করিয়া চন্দ্রহংসের বাঁ পায়ের একটি অঙ্গুল কাটিয়া লইল এবং পথে একটা কুকুর মারিয়া তাহার রক্ত আর সেই কাটা আঙ্গুলটা নিয়া মন্ত্রীকে দেখাইল। তাহা দেখিয়া মন্ত্রী মনে করিল—বিপদ দূর হইয়াছে। আর তখন তাহার আনন্দ দেখে কে !

এদিকে ধৃষ্টবুদ্ধির মন্ত্রী কলিঙ্গ সেই বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি গভীর বনে বালকের ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া, অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রহংসকে দেখিতে পাইলেন। কলিঙ্গের পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি এই পরম সুন্দর বালকটিকে যত্নের সহিত বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তারপর বালকের মুখে তাহার পরিচয় শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। এদিকে বাহিরে প্রচার করিয়া দিলেন—মন্ত্রী কলিঙ্গের এতদিন পরে একটি পুত্র জন্মিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া ধৃষ্টবুদ্ধিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

এদিকে চন্দ্রহংস দিনে দিনে বড় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার যোল বৎসর বয়স হইল। কলিঙ্গ তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—দেখিতে দেখিতে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে চন্দ্রহংস অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রহংসের হরিভক্তি বাড়িতে লাগিল। প্রতিদিন পূজা করেন, দান ধ্যান ও একাদশী ব্রত করেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে নগরের প্রজাগণ ক্রমে সকলেই পূজা ব্রত ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়া ভক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল।

একদিন একাদশী ব্রতের সময়ে কলিঙ্গ লোকজন দিয়া ধৃষ্টবুদ্ধিকে অনেক উপহার পাঠাইলেন। ধৃষ্টবুদ্ধির সম্মুখে মূল্যবান্ উপহারগুলি রাখিয়া কলিঙ্গের লোক জন স্নান করিতে চলিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন—"তোমরা চলিয়া যাইতেছ কেন ? এ বেলা রাজবাড়ীতে সকলে আহার করিয়া যাও।" অনুচরগণ বলিল—"মহারাজ ! আজ একাদশী ব্রত, আজ আমরা উপবাস করিব। এখন নদীতে যাইতেছি, স্নান করিয়া নারায়ণের পূজা করিতে হইবে।" এ কথায় ধৃষ্টবুদ্ধির রাগ দেখে কে ! সে বলিল—

"আরে ব্যাটারা! ছোট লোকের আবার পূজা একাদশী কি রে? এ শিক্ষা তোদের কে দিল?" অনুচরগণ বলিল—"রাজা মশায়! আমাদের মন্ত্রীকুমার আমাদিগকে এই ব্রত শিখাইয়াছেন। তাঁহার উপদেশে কলিঙ্গে সকলেই হরিপূজা করে আর একাদশীর উপবাস করে।"

এ কথায় ধৃষ্টবুদ্ধি মহা বিস্মিত হইয়া তখনই কলিঙ্গের বাড়ীতে চলিল। সেখানে গেলে মন্ত্রী কলিঙ্গ মহা সমাদরে ধৃষ্টবুদ্ধিকে সুন্দর আসনে বসাইয়া, পিতাপুত্রে যোড়হস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর চন্দ্রহংসকে দেখাইয়া কলিঙ্গ বলিলেন—"এটি আমার পুত্র চন্দ্রহংস, আপনাদের আশীর্ব্বাদে সে এখন এতখানি বড় হইয়াছে। এ কথায় দুষ্ট ধৃষ্টবুদ্ধির মনে সন্দেহ হইল। সে বলিল—"সত্য করিয়া বল, এ ছেলে তুমি কোথায় পাইলে?" তখন নিরুপায় হইয়া কলিঙ্গ আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

ইহা শুনিয়া দুষ্ট ধৃষ্টবুদ্ধি সমস্তই বুঝিতে পারিল। ঘাতকেরা যে তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন মনে মনে অনেক ভাবিয়া, সে তাহার পুত্র মদনের নামে এক পত্র লিখিল—"এই পত্রবাহক চন্দ্রহংসকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবে"। তারপর পত্র বন্ধ করিয়া কলিঙ্গকে বলিল—"মদনের এই পত্রখানি এখনই তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে। পত্র অতি গোপনীয়, অন্যকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—সুতরাং তোমার পুত্র চন্দ্রহংসকে পাঠাও।" পিতার আজ্ঞায় চন্দ্রহংস তখনই পত্র লইয়া রাজবাড়ীতে মদনের নিকট চলিল।

রাজবাড়ীর নিকটে আসিয়া চন্দ্রহংস প্রথমে রাজার বাগানে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর বাগানটি, মধ্যখানে পুকুর। সেই পুকুরের ধারে বকুল গাছের তলায় বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রৌদ্রে পথ হাঁটিয়া শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রাম করিতে বসিয়া সেইখানেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এদিকে বড় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা 'বিষয়া' সখিগণের সহিত সেই সময়ে উপবনে আসিয়াছিলেন—পুকুরে স্নান করিয়া উদ্যানের শিবমন্দিরে তিনি পূজা করিবেন। পূজার আয়োজনসহ সখীদিগকে শিবমন্দিরের নিকটে রাখিয়া তিনি পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন পরমসুন্দর ক্ষত্রিয় যুবক বকুল তলায় ঘুমাইতেছেন। আর দেখিলেন তাহার পাগড়ীতে একখানি পত্র রহিয়াছে। তখন কৌতূহলবশতঃ তিনি পত্রখানি না পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না।

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! পত্র পড়িয়া দেখেন, তাঁহারই পিতা তাঁহার ভাই মদনকে লিখিয়াছেন—এই পত্রবাহক চন্দ্রহংস তোমার নিকট যাইবামাত্র তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবে!

পত্র পড়িয়া বিষয়ার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন—"কি ভয়ানক কথা! এমন সুন্দর সরল মানুষকে কি মারিতে হয়?" এই ভাবিয়া বিষয়া করিলেন কি, চোখের কাজল লইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়া পাগ্‌ড়িতে রাখিয়া দিলেন। তারপর স্নান করিয়া মহাদেবের পূজা করিতে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে প্রায় বিকাল বেলা চন্দ্রহংস জাগিয়া মদনের নিকট পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। পত্র খুলিয়া মদন পড়িল, তাহার পিতা লিখিয়াছেন—"পত্রপাঠমাত্র অবিলম্বে পত্রবাহক চন্দ্রহংসের সহিত বিষয়ার বিবাহ দিবে। এ বিষয়ের অন্যথা না হয়, আর আমার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।" পিতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, এই ভাবিয়া মদন তখনই বিবাহের আয়োজন করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া চন্দ্রহংসের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিল।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখনও আমোদ উৎসবের ধুম থামে নাই, এমন সময় ধৃষ্টবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর বলিলেন—"তোমার মদন বড় বুদ্ধিমান্ ছেলে, চন্দ্রহংসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ দিয়া সে খুব ভাল কাজ করিয়াছে—এমন রূপবান্ ও গুণবান্ বর পাওয়া কঠিন!" একথা শুনিয়া মন্ত্রীর ত একেবারে চক্ষু স্থির! সে রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে তখনই অন্তঃপুরে গিয়া, মদনকে ডাকিয়া বলিল—"হতভাগা কুলাঙ্গার! কাহার হুকুমে তুই চন্দ্রহংসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ দিলি?" মদন বলিল—"বাবা! আপনার পত্র পাইয়াই ত চন্দ্রহংসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ দিয়াছি—ইহাতে আমার দোষ কি?" এই বলিয়া সেই পত্র আনিয়া পিতার হাতে দিল। পত্র পড়িয়া ধৃষ্টবুদ্ধি ভাবিল—পুত্রের দোষ নাই, এটা বিশ্বাসঘাতক চন্দ্রহংসেরই কাজ! এই ভাবিয়া সে তখনই ঘাতকদিগকে গোপনে ডাকিয়া বলিল—"তোরা শীঘ্র ভগবতীর মন্দিরে যা। সেখানে যাহাকে দেখিবি—সে যদি আমার পুত্র মদনও হয়, অথবা যে কেহ হয়—তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবি।"

ঘাতকেরা চলিয়া গেলে পর ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহংসকে ডাকিল। চন্দ্রহংস বিষয়ার সহিত আসিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। দুষ্ট ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ না করিয়াই বলিল—"বিষয়াকে বিবাহ করিয়াছ, ভালই। বিবাহের পর ভগবতী মন্দিরে

গিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়—তিনি আমাদের কুলের দেবতা। সুতরাং বিলম্ব করিও না, পূজার আয়োজন লইয়া একাকী এখনই ভগবতীর মন্দিরে যাও।" চন্দ্রহংসের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইবার কারণ নাই, কাজেই শ্বশুরের কথামত পূজার সামগ্রী লইয়া তিনি তখনই মন্দিরে চলিলেন।

মন্দিরে যাইবার পথে মদনের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল—"চন্দ্রহংস! পূজার আয়োজন লইয়া কোথায় যাইতেছ?" চন্দ্রহংস বলিল—"কুলদেবীর পূজা করি নাই বলিয়া তোমার পিতা দোষ দিয়াছেন, তাই ভগবতীর মন্দিরে চলিয়াছি।" একথায় মদন বলিল—"আজ আমি পূজা করিব, তুমি ঘরে যাও।" এই বলিয়া চন্দ্রহংসকে ফিরাইয়া দিয়া মদন মন্দিরে চলিল। মন্দিরে গিয়া মদন একমনে ভগবতীর পূজা



করিতেছে এমন সময়ে ঘাতক আসিয়া উপস্থিত! রাজার হুকুম—ভগবতী মন্দিরে যাহাকে পাইবে, সে আমার পুত্র মদন হইলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে। সুতরাং, আর কথাটি নাই—তলোয়ার লইয়া ঘাতক এক কোপে মদনের মাথা কাটিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

২

এদিকে হতভাগা চন্দ্রহংস রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেলে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া হতভাগা ধৃষ্টবুদ্ধি পাগলের মত ভগবতী মন্দিরের দিকে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে! হায়! হায়! মদনের কাটা মাথা মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে! ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজের মাথাটি কাটিয়া ফেলিল! রাজবাড়ীতে এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র চন্দ্রহংসও মন্দিরে গিয়া উপস্থিত! দেখিলেন পিতা পুত্রের কাটা মাথা মাটিতে পড়িয়া আছে তখন তিনি যোড় হস্তে দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলে—"হে মা ভগবতী! পিতা পুত্রকে বাঁচাইয়া দাও।" এইরূপে বহু স্তুতি মিনতি করিয়াও যখন দেখিলেন দেবী সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন তলোয়ার লইয়া নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইলে, দেবী তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। তখন চন্দ্রহংস দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—"মা! এই দুজনকেই বাঁচাইয়া দাও।" পরমধার্ম্মিক চন্দ্রহংসের প্রার্থনা দেবী পূর্ণ করিলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদন বাঁচিয়া উঠিল।

এই ঘটনায় ধৃষ্টবুদ্ধির চৈতন্য হইল এবং সে চন্দ্রহংসকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গিয়া ভগবানের আরাধনায় মন দিল। চন্দ্রহংস মদনকে মন্ত্রী করিয়া রাণী বিষয়ার সহিত পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

ভোঁদড়

অনেক স্থানেই ভোঁদড় দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই কলিকাতার পশুশালায় গিয়াছ; সেখানে একটা গোল চৌবাচ্ছায় যে কয়েকটা ভোঁদড় রাখা হইয়াছে, তাহাদের কাছে ১০।১৫ মিনিট দাঁড়াইয়াছ কি? আমি যত দিন সেগুলিকে দেখিতে গিয়াছি, এক দিনও তাহাদের কোনটাকে স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। একবার ডুব দেওয়া আর কিছু দূর গিয়া মুখ ভাসাইয়া পুনরায় ডুব দেওয়া,—কাযের মধ্যে তো এই; ইহা লইয়াই বেচারারা এত ব্যস্ত যে দেখিলে বোধ হয় ঐ জলটুকুর

প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাহাদের পরিচয় থাকার উপরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা দেখিয়া হয়ত মনে করিয়াছ যে ঐরূপ করিয়া তাহারা জলের ভিতর মাছ খোঁজে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাছ খুঁজিতে হইলেও ঐরূপ করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবল আমোদ করিবার জন্যই ইহারা এইরূপ করিয়া থাকে।

ভোঁদড়গুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী জলার ধারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যখন খেলা করে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে তাহাদের চাইতে সুখী জীব আর নাই। আমি বন্য ভোঁদড়ের খেলা কখনও স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাহার চাইতে আমোদজনক দৃশ্য বড় অধিক নাই। দিনের বেলায় কিন্তু ইহারা তত মন খুলিয়া আমোদ করিতে পারে না; সূর্য্য অস্ত গেলেই তাহাদের আনন্দের সময় হয়। তাহাদের খেলার একটা বেশ নিয়ম আছে। প্রথমে সংগীত, তার পর ব্যায়াম। কোন কোন সময় ব্যায়াম এবং সংগীত এক কালেই চলিতে থাকে। তাহারা কোন্ রাগিণী কোন্ তাল অবলম্বন করিয়া কি গান গায়, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি; তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অনেক ছেলের গান গাইবার একটা বাতিক আছে। তাহাদের গানে পৃথিবীর সকল প্রকারের রাগিণী এবং সকল প্রকারের তালই এক সময়ে ব্যবহার হয়। মনে কর এইরূপ কুড়িজন ছেলে তিন রাত্রি বাহিরে বসিয়া চ্যাঁচাইল, আর হিম লাগিয়া তাহাদের গলা বসিয়া গেল—এখন কথা কহিতে গেলে কেবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এখন যদি এই কুড়িজন ছেলে রাত্রিতে নদীর ধারে কোন নির্জ্জন বনে গিয়া গান গায়, আর ম্যাও ম্যাও করে, আর শেয়ালের ডাক ডাকে, আর কাশে, আর নাকে কাঠি দিয়া ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিয়া হাঁচে, তবে ভোঁদড় পরিবারের গানের কতকটা নকল করিতে পারে। ইহাদের ব্যায়াম উল্টাবাজি। তোমাদের ব্যায়ামশিক্ষক হয়ত তোমাদিগকে দুইতিনজনে মিলিয়া মাটির উপর উল্টাবাজি করিতে হইলে কিরূপ করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। না দিয়া থাকিলেও আমাদের দেশী বাজিকরদিগকে ঐরূপ করিতে অবশ্যই দেখিয়াছ। ভোঁদড়েরা ২০।২৫টা মিলিয়া একটা পিণ্ডের আকার ধারণপূর্ব্বক ঐ বাজি করে। তবে তোমাদের উল্টাবাজিতে আর তাহাদের উল্টাবাজিতে একটু তফাৎ আছে। তোমরা সমান জমীর উপর উল্টাবাজি কর, তাহারা ডাঙ্গার উপর হইতে উল্টাবাজি করিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে।

আমি যখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন আমাদের বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে অনেক ভোঁদড় আছে। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে ভোঁদড়ের প্রতিহিংসা লইবার বৃত্তিটা বড় প্রবল। কাহারও উপর কোন কারণে চটিলে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ঐ ভদ্রলোকটীর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে ছোট নৌকায় উঠিয়া মাছ ধরিতে যাইতেন। একদিন নৌকার সম্মুখে একটা ভোঁদড় দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া গুঁতা মারিলেন। গুঁতা খাইয়া ভোঁদড়টা ক্যাঁচম্যাচ করিয়া উঠিল; আর অমনি নৌকার চারিধারে কতকগুলি ভোঁদড় মাথা জাগাইল। তিনি বলিয়াছেন যে "সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে অনেকগুলি ভোঁদড় ছিল না, সুতরাং তাহারা নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই, নতুবা সেদিন তাঁহার প্রাণ লইয়া ঘরে আসাই দায় হইত।"

ভোঁদড়েরা মাছ ধরিয়া খায়; মাছ ধরিতে ইহারা এত পটু যে, কোন কোন দেশের জেলেরা ইহাদের সাহায্যে মাছ ধরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। ভোঁদড়ের সাহায্যে মাছ ধরাটা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিও না। ভোঁদড় মাছ ভাল ধরিতে পারে সত্য; কিন্তু ধরিলে কি হইবে, পেটুক দুষ্টু ছেলের হাতে সন্দেশ দিলে যেরূপ হয়, অশিক্ষিত ভোঁদড়ের উপর মাছ ধরিবার ভার দিলেও সেইরূপই হয়। ভোঁদড় মাছ পাইলেই খাইয়া ফেলে। খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া গেলেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না। পেট ভরিলে মাছ খায় না, কিন্তু ধরিয়া তাহাকে দাঁতে টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সুতরাং তখন ভোঁদড় মাছ না খাইলেও ওরূপ জন্তুকে মাছ ধরিতে দিয়া মৎস্য ব্যবসায়ীর লাভ অতি অল্পই হয়।

ভোঁদড়কে দিয়া মাছ ধরাইবার ইচ্ছা থাকিলে খুব ছোট ছানা ধরিয়া আনিতে হয়। সেই ছানাকে মাছ খাইতে দিবে না; কেবল নিরামিষ খাওয়াইয়া তাহাকে পুষিবে। ভোঁদড় সহজেই কুকুরের মতন পোষ মানে। কোন জিনিস ছুড়িয়া ফেলিলে কুকুরের ন্যায় ভোঁদড়ও তাহা আনিয়া দিতে শিখিতে পারে। প্রথমতঃ তাহাকে ঐরূপে নানাপ্রকারের জিনিষ আনিয়া দিতে শিখাইতে হয়। এই বিষয়টা খুব ভালরূপ শিক্ষা হইলে শুক্‌নো মাছ দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। মাছের ছালের ভিতর খড় পূরিয়া তাহা দ্বারা প্রথমতঃ পরীক্ষা করিলে আরো ভাল হয়। শুক্‌নো মাছ আনিয়া দিতে শিক্ষা হইলে—অর্থাৎ যদি দেখ যে ভোঁদড় সেই শুক্‌নো মাছটাকে খাইয়া ফেলিবার মত কোন ভাব প্রকাশ না করে, তাহা হইলে—তাহাকে মরা মাছ আনিতে

দিবে। মরা মাছের পাঠ ভালরূপ শিক্ষা হইলে তাহাকে নির্ভয়ে জলে ছাড়িয়া দিতে পার।

ভোঁদড়ের লোম অতি কোমল। এই জন্য অনেক লোকে ভোঁদড় মারিয়া তাহার ছাল বিক্রয় করে। সেই ছালে বড়লোকের পা রাখিবার আসন তৈয়ারি হয়; আরো অনেক জিনিষ তৈয়ারি হয়।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি নদীর পার ঢালু হইলে ছেলেরা তাহাতে জল দিয়া পিছল করিয়া লয়, এবং তাহার উপর দিয়া জলে পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া খেলা করে। কানাডা দেশীয় ভোঁদরগুলিও এই খেলা জানে। সেখানে ঢালু ও মসৃণ বরফের উপর উপুড় হইয়া ভোঁদড়গুলি খেলা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা এইরূপে ৪০ হাত পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া যায়।

["সখা"—এপ্রিল ১৮৮৬]

মেঘবৃষ্টি

বর্ষাকালে রাস্তায় বাহির হইবার আগে আমরা আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহার ভাবগতিক কিরূপ—মেঘ আছে কিনা, বৃষ্টির সম্ভাবনা, অথবা ঝড় দেখা যায় কিনা। কিন্তু মেঘ কিরূপে জন্মায়, আকাশে কি ভাবে থাকে, মেঘের আকার প্রকার এবং চালচলণ কিরূপ সেকথা ভাবিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না।

মেঘের জন্মের কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীর খাল, বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্রের জল গরমে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়; সেই বাষ্প জমিয়া খুব ছোট ছোট জলকণার সৃষ্টি হয়। এই সকল জলকণার স্তূপকেই আমরা বলি মেঘ। মনে হইতে পারে যে জলকণা তো বাতাসের চেয়ে ভারি; তাহা হইলে মেঘ কেমন করিয়া শূন্যে থাকে? বাস্তবিক মেঘ সর্ব্বদাই নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কখনও, বাতাসের ঠেলায় উপরে উঠিতেও পারে, কিন্তু নীচে নামাই তাহার স্বভাব। যে মেঘের জলকণার আকার যত বড়, সে মেঘ তত তাড়াতাড়ি নীচে নামে। জলকণাগুলি আকারে বেশী বড় হইয়া গেলে, বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। খুব উঁচুতে যে মেঘ থাকে, তাহাতে অনেক

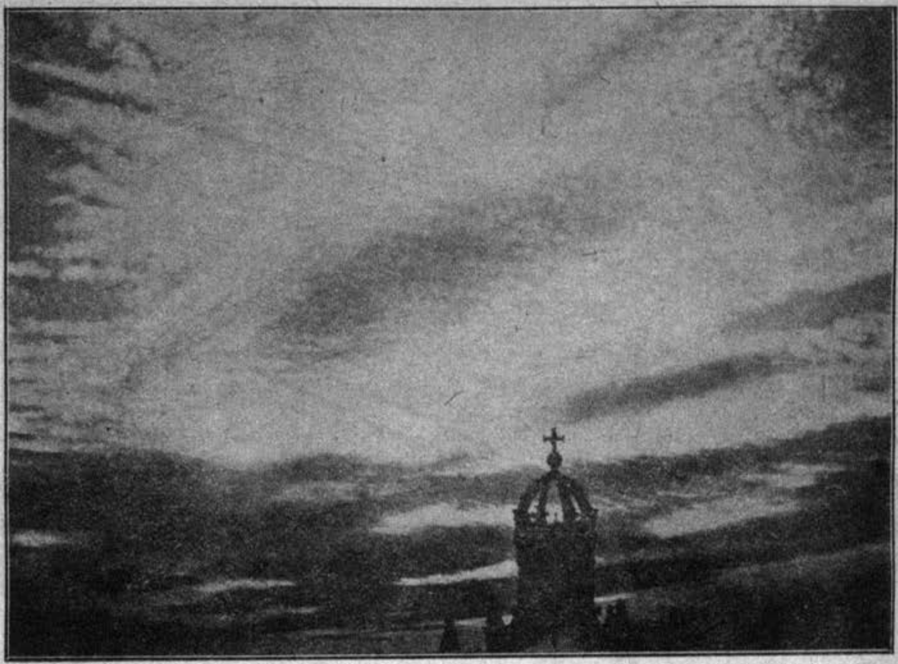
সময়ে জলকণাগুলি জমিয়া বরফের কণা হইয়া থাকে। এই মেঘ আবার নীচে গরম বাতাসের মধ্যে নামিলে সেই বরফ গলিয়া জলকণা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা দেশে এই বরফ কণাই তুষারবৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে।

অনেক সময় উপরের মেঘ বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পোঁছাইবার আগেই বাষ্প হইয়া মিলিয়া যায়। কাজেই, মেঘ আসিলেই যে বৃষ্টি পড়িবে, একথা বলা যায় না। শীতের দেশে মাঝে মাঝে একটা বড় মজার জিনিষ দেখা যায়। মেঘের জলকণা খুব ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ কোন গাছ পালা অথবা অন্য কোন জিনিষের গায়ে বরফ হইয়া জমিয়া যায়।

মেঘবৃষ্টি ও ঝড় বাতাসের খবর রাখিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বড় বড় সরকারী আফিস আছে। ইংরাজিতে তাকে বলে মিটিয়রলজিক্যাল (Meteorological) আফিস। এই সমস্ত আফিসের কাজ কেবল মেঘ বাতাস ইত্যাদির নানা রকম মাপ জোখের হিসাব লওয়া। সে কি রকম হিসাব? কোন্ খানে কত গরম তাহার হিসাব, কোন্ খানের বাতাস কত খানি ভিজা বা শুকনা তাহার হিসাব; কোনখানে বাতাসের চাপ কিরূপ, বাতাস কতটা হাল্কা বা কতটা ভারি, তাহার হিসাব; বাতাস কতখানি জোরে কোন্ দিকে চলিতেছে, কোনখানে কতখানি বৃষ্টি পড়িল, কি রকম মেঘ দেখা দিল, তাহার হিসাব।

বাতাস যখন চলে তখন তাহাকে বলে 'হাওয়া', হাওয়া যখন ছোটে, তখন তাহার নাম 'ঝড়'। বাতাস আবার চলা ফিরা করে কেন? গরম লাগিলে বা জলের বাষ্প মিশিলে বাতাস ছড়াইয়া হাল্কা হইয়া উপর দিকে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার চাপ কমিয়া খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ফাঁকা হইবার যো নাই, চারিদিকের চাপে আশ পাশ হইতে বাতাস ছুটিয়া সেই হাল্কা জায়গাটাকে দখল করিতে চায়, তাহাতেই বাতাসের চলাচল হয়। বাতাস যখন যেদিকে চলে, সে তখন মেঘগুলিকে শুদ্ধ সে দিকে টানিয়া লইতে থাকে। এই রকম টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এক একটা মেঘের এক এক রকম চেহারা হইয়া উঠে। যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মেঘের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারেন। খুব উঁচুতে ৫।৬ মাইল উপরে যে মেঘ থাকে, তাহার চেহারা অতি হাল্কা সূক্ষ্ম চামরের মত। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সে মেঘ নীচে নামিতে গেলেই গরম বাতাসে শুকাইয়া মিলাইয়া যায়।

তারপর দু মাইল চার মাইল উঁচুতে ছিটান তুলার মত বা চষাক্ষেতের মত যে সব

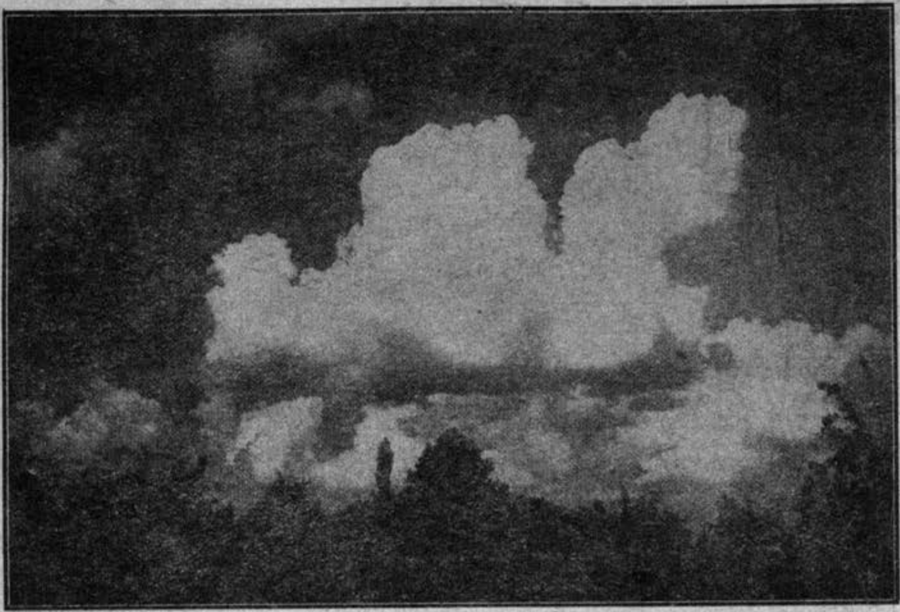


নিরীহ মেঘ। ইহাকে কেহ ভয় করিও না।

সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়, তাহাতে ও হঠাৎ বৃষ্টি পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত মেঘ যখন সূর্য্যাস্তের সময়ে লম্বা লম্বা স্তর বাঁধিয়া আকাশের গায়ে শুইয়া থাকে তখন তাহার উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া কি আশ্চর্য্য সুন্দর রঙের খেলা দেখা যায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের যে মেঘ, তাহার চেহারাটা খুব গম্ভীর ও জমকালো হয়; সে যেন রাগে ফুলিয়া পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া উঠিতে থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া যায়। তখন সে বৃষ্টির মেঘ হইয়া ধোঁয়ার প্রলেপের মত আকাশের গায়ে লেপিয়া যায়।

বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখনই মনে হয় "এইবার বাজ পড়ার শব্দ শুনিব"—এবং অনেক সময়েই সে শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে বাতাসটা কিরকম তোলপাড়

হইয়া উঠে, ওই আওয়াজটা হইতেই তাহা বুঝিতে পার। বিদ্যুতের ঝলক ছুটিবামাত্র



বিদ্যুৎ পোরা পুঞ্জ মেঘ—ইনি গর্জ্জন ও বর্ষণ দুই জানেন।

চারিদিকে গরম বাতাস ঠিকরাইয়া পড়ে, আবার সেই চোট্ সামলাইতে গিয়া চারিদিকের বাতাস ছুটিয়া কড়্‌কড়্ শব্দে টক্কর বাধাইয়া বসে। তাহার পরেও খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত বার বার বহু দূরের মেঘ হইতে গুড় গুড় করিয়া সেই শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে থাকে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিস্ থাকাতে বৃষ্টি বাদল সম্বন্ধে নানারকম খবর আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। "ঝড় আসিতেছে" এই খবর সময়মত জানিতে পারিলে মানুষে সাবধান হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। মনে কর, খবর আসিল—এখান হইতে দুই শত মাইল দূরে একটা বড় ঝড় খুব বৃষ্টি লইয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে এই দিকে আসিতেছে। সে যদি বরাবর ঐভাবে এই মুখেই আসে, এবং আসিতে আসিতে তাহার বৃষ্টি যদি ফুরাইয়া না যায়, অথবা যদি মাঝে কোথাও গরম শুকনা বাতাসে তাহার মেঘ শুকাইয়া না ফেলে, তবে চার ঘণ্টা পরে এখানে বৃষ্টি হইবে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিসে বড় বড় মানচিত্রে সর্ব্বদাই চারিদিকের খবর আঁকিয়া রাখা হয়। বাতাসের চাপ, বাতাসের গতি, বাতাসের বেগ, বাতাসের উত্তাপ, বাতাসের ভিজা-ভাব ও মেঘবৃষ্টি, সব খবর সেই মানচিত্রের গায়ে স্পষ্ট রেখা টানিয়া দেখান হয় —এবং বাতাসের ভাবগতিক যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতে থাকে, মানচিত্রের উপরেও সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের হিসাব ক্রমাগত বদলাইয়া দেখান হয়।

সোমিলক

(পঞ্চতন্ত্রের গল্প)

কোন স্থানে সোমিলক নামে এক তাঁতি ছিল, সে চমৎকার মিহি কাপড় প্রস্তুত করিত। বড়লোক সকলেই তাহার কাপড় কিনিতেন এবং তাহার নিপুণতার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সোমিলক কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত না, যাহা আয় হইত সমস্তই তাহার সংসারের কাজে খরচ হইয়া যাইত। গ্রামের অন্য তাঁতিরা শুধু মোটা কাপড় তৈয়ারি করিতে জানে। কিন্তু তবু তাদের অবস্থা সোমিলকের চাইতে অনেক ভাল। এই কারণে মনের দুঃখে সোমিলক বেশী উপার্জ্জনের আশায় বর্দ্ধমান পুরে যাত্রা করিল।

বর্দ্ধমানপুরে তিন বৎসর খুব মনোযোগের সহিত ব্যবসায় করার পর সোমিলক তিনশত মোহর রোজগার করিয়া একদিন দেশে ফিরিয়া চলিল। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া এক বনের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে, হিংস্র জন্তুর ভয়ে সে স্থির করিল বড় একটা গাছে চড়িয়া রাত্রিটা কাটাইবে। গাছের উপরে যখন সে নিদ্রায় অচেতন তখন গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিল—বিধাতাপুরুষ ও কর্ম্মপুরুষ আসিয়া সেখানে উপস্থিত! কর্ম্মপুরুষ বিধাতাপুরুষকে বলিলেন—"প্রভু! আপনি ত জানেন যে সোমিলকের ভাগ্যে শুদ্ধ তার খরচ চলিবার মত অর্থই লেখা আছে—তবে কেন তাহাকে তিনশ মোহর দিলেন?" বিধাতাপুরুষ বলিলেন—"পরিশ্রম করিয়া যে ব্যবসায় করে তাহাকে আমি ধন ত দিবই; তবে সে ধন তাহারি থাকিবে কি না, সেটা তুমি দেখিবে।"

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সোমিলক দেখিল থলিয়াটি একেবারে শূন্য—একটি মোহরও নাই! সে ভারী আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়া ভাবিল—"হায়! এত কষ্ট করিয়া

ধন উপার্জ্জন করিলাম, তাহা হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল ! তবে আর বাড়ী গিয়া কি হইবে—যাই, আবার বর্দ্ধমানপুরেই ফিরিয়া যাই।

বর্দ্ধমান ফিরিয়া সোমিলক একান্ত চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে আবার পাঁচ শত মোহর উপার্জ্জন করিয়া দেশে চলিল। এবারে সে আর পথে ঘুমাইবে না। অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেও ক্রমাগত চলিয়া প্রায় বাড়ীর কাছে আসিয়াছে, এমন সময় শুনিল—চোখের আড়ালে থাকিয়া কর্ম্মপুরুষ আবার সেইরূপ বিধাতাপুরুষকে বলিলেন—"কেন আপনি সোমিলককে এত ধন দিলেন ?" বিধাতাপুরুষ ও পূর্ব্বের মত উত্তর দিলেন। বলিতে বলিতে সোমিলক দেখিল তাহার থলিয়াটি একেবারে শূন্য।

এবারে মনের দুঃখে নিতান্ত নিরাশ হইয়া সে মনে করিল আত্মহত্যা করিবে। নিকটেই একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছের ছালে শক্ত দড়ি পাকাইয়া গাছে চড়িল। তারপর সেই দড়ি গলায় পরিয়া ফাঁসি দিতে যাইবে, এমন সময় আকাশে থাকিয়া কর্ম্মপুরুষ বলিলেন—"সোমিলক ! ক্ষান্ত হও—এরূপ সাহস করিও না। আমিই তোমার ধন চুরি করিয়াছি। কারণ, খাওয়া পরার মত টাকাই তোমার কপালে লেখা আছে—তাহার অধিক আমি সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, তোমার সাহস দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও, বল।"

এ কথায় সোমিলক বলিল—"প্রভু ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাকে অনেক ধন দান করুন—আমি অন্য কোন বর চাই না।" কর্ম্মপুরুষ বলিলেন—"যে ধন ভোগ করিতে পারিবে না, সে ধন লইয়া কি করিবে ? খাওয়া পরা চলে এমন ধন ছাড়া বেশী ধন তোমার ভোগে নাই।" সোমিলক বলিল—"ভোগে থাকুক, বা না থাকুক, তবু আমি ধনই চাই।"

ইহা শুনিয়া কর্ম্মপুরুষ কহিলেন—"তাহাই যদি হয় তবে তুমি আবার বর্দ্ধমানপুরে যাও। সেখানে 'গুপ্তধন' ও 'উপভুক্ত ধন', এই দুই বণিক পুত্র আছে। তাহাদিগের স্বভাব দেখিয়া, যে জনের মত হইতে ইচ্ছা হয় তুমি সেই জনের মত হইবারই বর প্রার্থনা কর—আমি তোমাকে সেইরূপই করিয়া দিব।" এই বলিয়া কর্ম্মপুরুষ অন্তর্হিত হইলে সোমিলক বিস্ময়ের সহিত বর্দ্ধমানপুরে ফিরিয়া চলিল।

বর্দ্ধমানে গিয়া গুপ্তধনের বাড়ীর সন্ধান করিয়া ভিতরে গেল। তাহাকে দেখিবামাত্র গুপ্তধন ও তাহার স্ত্রীপুত্রেরা রাগিয়া আগুন ! আর যা গালাগালি দিল ! কিন্তু সে সব সোমিলক গ্রাহ্যও করিল না—ঘরে ঢুকিয়াই বসিয়া পড়িল। তারপর আহারের

সময় অতি অশ্রদ্ধার সহিত গুপ্তধন তাহাকে যাহা কিছু খাদ্য দিল তাহাতে তাহার পেটই ভরিল না! যাহা হউক কোন মতে ক্ষুধা দূর করিয়া সোমিলক রাত্রে সেখানেই ঘুমাইল। গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিল—কর্ম্মপুরুষ, ভাগ্য বিধাতাকে বলিতেছেন—"গুপ্তধন আজ সোমিলককে খাইতে দিয়া যে বেশী খরচ করিল, সেটা আপনি মঞ্জুর করিলেন কেন?" বিধাতাপুরুষ বলিলেন—"ধন আমি কৃপণকেও দিয়াছি। কিন্তু তাহার ফলাফল তোমার হাতে, খরচ বাঁচাইবার ফিকির তুমি কর।" ঘুম হইতে উঠিয়া সোমিলক দেখিল যে গুপ্তধনের পেটের অসুখ হইয়াছে। সোমিলককে আধপেটা খাইতে দিয়া তাহার যে সামান্য খরচ হইয়াছে সেই অপরাধেই রোগের জন্য কৃপণকে সেদিন উপবাস করিতে হইল।

এদিকে সোমিলক সেই দিনই গুপ্তধনের বাড়ী ছাড়িয়া উপভুক্ত ধনের বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেখানে তাহার আদর যত্নের সীমা রহিল না। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া রাত্রে উপভুক্তধনের বিছানায় পরম সুখে ঘুমাইল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, বিধাতাপুরুষ ও কর্ম্মপুরুষ আসিয়া উপস্থিত! কর্ম্মপুরুষ বলিলেন—"প্রভু! উপভুক্তধন সোমিলকের যত্ন করিতে গিয়া অনেক খরচ করিয়াছে, সমস্ত জিনিষ দোকান হইতে ধারে আনিয়াছে—এখন শোধ করিবার সম্বল কোথায়?" বিধাতাপুরুষ বলিলেন—"যাহাতে তাহার অর্থাভাব না হয়, সে ব্যবস্থা তুমি কর।"

ইহারপর প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল, সেই দেশের রাজা হঠাৎ সন্তুষ্ট হইয়া লোকদ্বারা উপভুক্তধনকে রাশি রাশি ধন পাঠাইয়া দিয়াছেন! এই ব্যাপার দেখিয়া সোমিলক সবিস্ময়ে ভাবিল—"উপভুক্তধনের ধন সঞ্চয় কিছুই নাই, তবু দেখিতেছি গুপ্তধনের চাইতে সে অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে আছে! ধনের ফল দান আর উপভোগ—কেবল কৃপণের মত জমাইয়া লাভ কি? অতএব, হে বিধাতা! আমাকে উপভুক্ত ধনের মতই করিয়া দিউন।"

তাহাই হইল—বিধাতার কৃপায় সোমিলক শুধু যে ধনী হইল তাহা নহে, দুহাতে ধন বিলাইয়া ও ধনের সদ্ব্যয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

———

নোবেলের দান

পাঁচ বৎসর আগে যখন ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল, যে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নোবেল প্রাইজ" পাইয়াছেন, তখন দেশময় একটা উৎসাহের ঢেউ ছুটিয়াছিল। "নোবেল প্রাইজ" জিনিষটা কি তাহা অনেকেই জানিত না, তাহারা সে বিষয়ে আগ্রহ করিয়া খোঁজ করিতে লাগিল।

আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান। যাঁহারা বিজ্ঞান জগতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি করেন, এবং বিশেষভাবে, যাঁহারা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদের সম্মানের জন্য এই সম্পত্তির আয় হইতে "নোবেল প্রাইজ" নামে লক্ষাধিক টাকার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। যে-কোন দেশের যে-কোন লোক এই অর্ঘ্যলাভের যোগ্য হইলেই তাহা পাইতে পারেন।

এই নোবেল লোকটির জীবনের কাহিনী বড় অদ্ভুত। দুর্ব্বল স্বাস্থ্য লইয়া রুগ্ন ভগ্নদেহে তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি অত্যন্ত ভীরু ও নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন, সামান্য দুঃখ কষ্ট বা উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু অপর দিকে তাঁহার মনের এমন অসাধারণ বল ছিল, ঘোর বিপদের মধ্যে ও রোগের যাতনার মধ্যে তিনি শান্ত ভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। সমস্ত জীবন তিনি বোমা ও বারুদের মশলা লইয়া নানারকম পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যে সকল সময়ে প্রাণটি হাতে করিয়া চলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন; ইহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে তাহাও তাঁহার জানা ছিল, কিন্তু সে চিন্তা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

আলফ্রেড নোবেলের পিতা রুসিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিকর ছিলেন। গোলা বারুদ লইয়া তাঁহার কারবার, এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁহার সহায় ছিল। কেবল যে যুদ্ধের কাজেই বারুদের ব্যবহার হয় তা নয়। তার আর একটি মস্ত কাজ, পাহাড় ভাঙ্গা। রেলপথ বসাইবার জন্য এবং রাস্তাঘাট বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার জন্য অনেক সময়ে পাহাড় ভাঙ্গিয়া সমান করিতে হয়। কোদাল ঠুকিয়া এই কাজ করিতে গেলে অসম্ভব রকম পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে হয়!

সাধারণ বারুদের সাহায্যে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু বারুদের তেজও সময়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নোবলের সময়েও অনেক জিনিষের কথা লোকে জানিত, যাহার তেজ বারুদের চাইতে ও ভয়ানক—কিন্তু এই সমস্ত জিনিষ এত সামান্য কারণে ফাটিয়া যায় যে তাহাকে কাজে লাগাইতে কেহ সাহস পাইত না। কাজ করিতে গিয়া সামান্য একটু গরম বা সামান্য একটু আঁচড় অথবা ধাক্কা লাগিলেই ঘর বাড়ী উড়িয়া এক প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নোবেল ডিনামাইট্ আবিষ্কার করিয়া সে অসুবিধা দূর করেন। ডিনামাইটের শক্তি সাধারণ বারুদের চাইতে আট গুণ বেশী অথচ তাহাকে লইয়া সাবধানে নাড়াচাড়া করিলে কোন ভয়ের কারণ নাই।

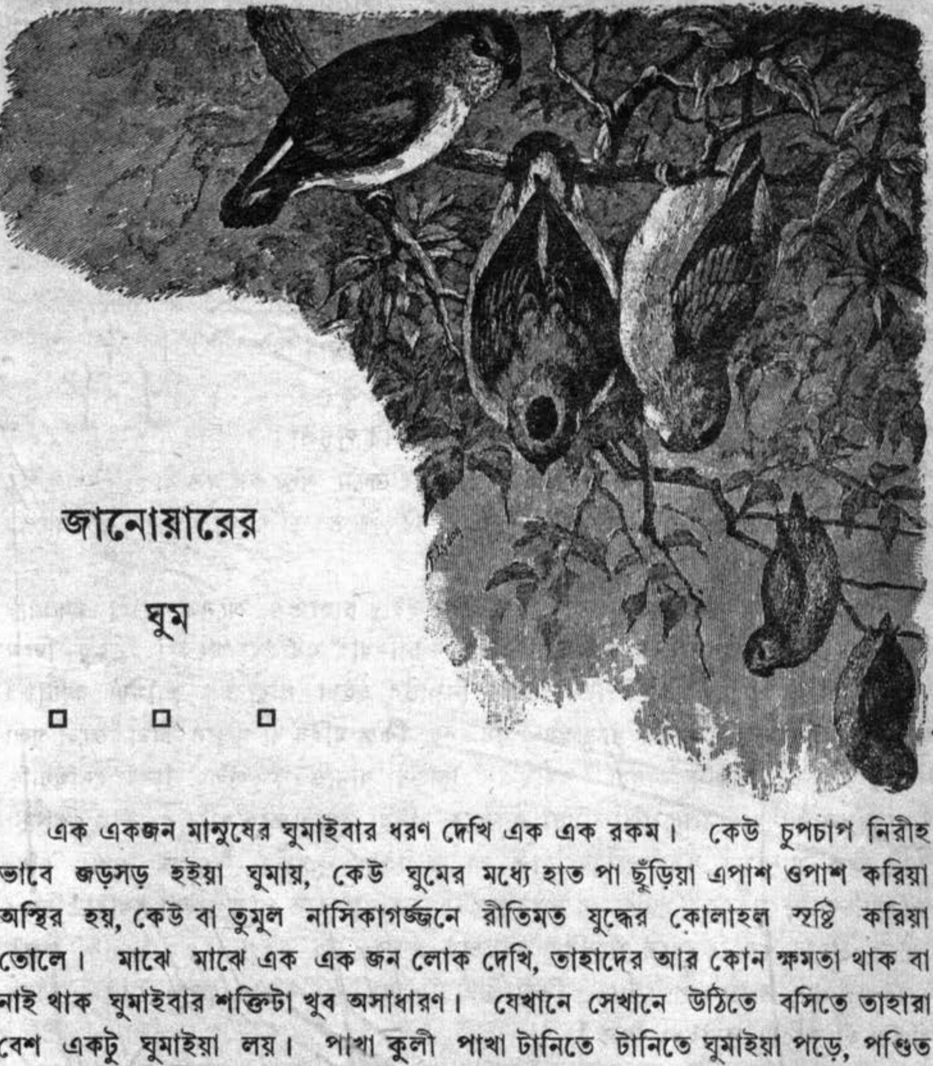
ডিনামাইট্ ছাড়াও তিনি আরও অনেক রকম বারুদের মশলা আবিষ্কার করেন। আজকাল কামানের গোলা ছুঁড়িবার জন্য যে সকল প্রচণ্ড বারুদ ব্যবহার হয় তাহাও নোবেলের আবিষ্কারের ফল। এই সমস্ত সাংঘাতিক জিনিষের কারবারের জন্য নোবেল বড় বড় কারখানা বসাইয়া পৃথিবী জুড়িয়া প্রকাণ্ড ব্যবসা চালাইয়া, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার একটি কারিকরের অসাবধানতায় সমস্ত কারখানাটি উড়িয়া যায় এবং অনেক লোক মারা পড়ে ও অনেক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। তাহাতেও নোবেলের উৎসাহ দমে নাই—তিনি আবার নূতন করিয়া কারখানা করাইলেন এবং এরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্য অনেক সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন। সে কারখানা আজও চলিতেছে।

কারখানার ভিতরে যদি ঢুকিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে "সাবধান হওয়া" কাহাকে বলে। যে সকল স্থানে বিপদের সম্ভাবনা, সেখানে প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে মাটি উঁচু করিয়া পাহাড়ের মত দেয়াল দেওয়া হইয়াছে। ঘরগুলি খুব হাল্কা করিয়া তৈয়ারী, তাহার মেজের উপর পুরু করিয়া চট্‌মোড়া। যাহারা কাজ করে, তাহাদের পায়ে কাপড়ের জুতা—কোথাও কোন শব্দ করিবার নিয়ম নাই। সেখানে আগুন জ্বালান দূরে থাকুক, কারখানার ত্রিসীমানার মধ্যে দিয়াশালাই আনিতে দেওয়া হয় না। কোন রকম লোহার জিনিষ সেখানে আনা নিষেধ, কাঁটা পেরেক পর্য্যন্ত আনিবার উপায় নাই। এই রকমের অসংখ্য নিয়ম নিষেধ মানিয়া তবে কারখানা চালাইতে হয়। ভগ্ন শরীরে এই রকম সাংঘাতিক জিনিষের কারবার করিয়া নিত্য বিপদের মধ্যে যাঁহার জীবন কাটিল,

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ চিন্তা হইল এই যে, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য, এবং জ্ঞান ও আনন্দের বিস্তারের জন্য উপায় করিতে হইবে। তাহারই ফলে, এই নোবল প্রাইজ।

কিন্তু কেবল এই দানই নোবেলের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ডিনামাইট প্রভৃতি যে সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র তিনি জগৎকে দিয়া গেলেন, সেও বড় সামান্য দান নয়। যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সভ্য মানুষের যে সমস্ত বড় বড় কীর্ত্তি, তাহার অনেকগুলিই সহজ ও সম্ভব হইয়াছে, কেবল নোবেলের ঐ অস্ত্রের গুণে। মাটি উড়াইয়া পাহাড় ফাটাইয়া পাথর সরাইয়া পথঘাট রেলপুল বসান হইতেছে, খাল কাটিয়া নদীর পার ভাঙ্গিয়া জলের স্রোতকে নানাদিকে চালান হইতেছে, সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া নূতন নূতন জলপথের সৃষ্টি হইতেছে, খনি ব্যবসায়ী খনি খুঁড়িতে গিয়া পাঁচ মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে সারিতেছে, সভ্য দেশের চাষা বিনা লাঙ্গলে সামান্য পরিশ্রমে বড় বড় জমী ফুঁড়িয়া চষিয়া ফেলিতেছে!

নেপোলিয়ান যখন ইটালি বিজয় করিতে চলিলেন, তখন সকলে বলিয়াছিল, "কি অসম্ভব কথা! এই দুরন্ত শীতে তুমি সৈন্য লইয়া আল্প্‌স্ পাহাড় পার হইবে কিরূপে?" নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "There shall be no Alps"! "আল্প্‌স্ পাহাড় থাকিবে না।"—অর্থাৎ সে আমায় বাধা দিতে পারিবে না। নেপোলিয়ান আল্প্‌স্ পার হইয়া চলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে যখন ফ্রান্স, ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্প্‌স্ পাহাড় ভেদ করিয়া রেলপথ বসান হইতেছিল, তখন নোবেলও বলিতে পারিতেন, "There shall be no Alps"! লক্ষযুগের পাহাড়ের বাঁধন একটি রুগ্নদেহ দুর্ব্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।



জানোয়ারের ঘুম

□ □ □

এক একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরণ দেখি এক এক রকম। কেউ চুপচাপ নিরীহ ভাবে জড়সড় হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত পা ছুঁড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অস্থির হয়, কেউ বা তুমুল নাসিকাগর্জ্জনে রীতিমত যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে এক এক জন লোক দেখি, তাহাদের আর কোন ক্ষমতা থাক বা নাই থাক ঘুমাইবার শক্তিটা খুব অসাধারণ। যেখানে সেখানে উঠিতে বসিতে তাহারা বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়। পাখা কুলী পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়ে, পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে পড়াইতে ঢুলিতে থাকেন, আর ছোট ছোট ছেলেরা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমের ঘোরেই হুঁ হুঁ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত কয়েকদিন রাত

জাগিয়া এবং হয়রাণ হইয়া সৈন্যেরা যখন শিবিরে ফিরে, তখন অনেক সময়ে দেখা যায় তাহারা চলিতে চলিতেই ঘুমের ঘোরে মাতালের মত টলিতেছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যবাড়ী গিয়াছিলেন—শীতের সময়ে। সেখানে পাড়াগেঁয়ে শীতটা কি রকম হয় তাঁহার জানা ছিল না। তাই শিষ্য যখন লেপ দিতে চাহিল তখন তিনি বারণ করিয়া বলিলেন "আমার শীতটীত কিছু লাগে না"। কিন্তু "লাগে না" বলিলেইত আর শীত দূর হয় না; কাজেই রাত্রে যখন ঠাণ্ডা বাড়িয়াই চলিল, তখন ঠাকুর মহাশয়ের দুরবস্থা কেমন হইয়াছিল, শিষ্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন অতি চমৎকার—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেণের পুঁটুলী।

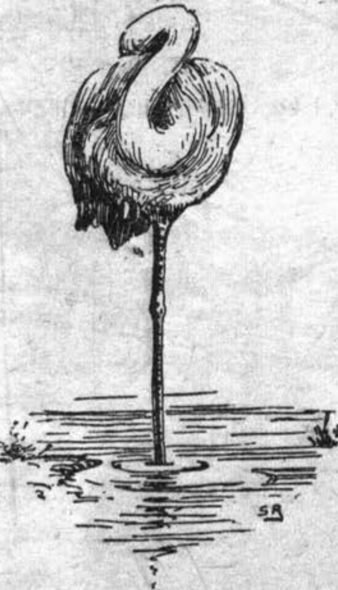
প্রথমটা ঢেঁকির মত সটান সোজা, তার পর ক্রমে ধনুকের মত বাঁকা; তার পর কুকুরের মত হাত পা গুটাইয়া জড়সড়, তার পর শীতে তাল পাকাইয়া একেবারেই পুঁটুলির মত গোল!

জানোয়ারদের ঘুমের কায়দা যদি দেখ, তবে ইহার চাইতেও অনেক বেশী রকমারি পাইবে। কেউ চোখ বুজিয়া ঘুমায়, কেহ চোখ চাহিয়াই ঘুমাইয়া থাকে। কেহ দিনে জাগিয়া রাত্রে ঘুমায়, কেহ প্যাঁচার মত নিশাচর হইয়া সারারাত জাগিয়া কাটায়। আস্তাবলে ঘোড়াগুলি খাড়া দাঁড়াইয়া ঘুম দেয় কিন্তু মহিষ বা গণ্ডার কাদা জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া আরাম করিয়া ঘুমায়। চিড়িয়া খানায় কতগুলা বাঁদর দেখিয়াছি তাহারা দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া একসঙ্গে বসিয়া ঘুমাইতেছে আবার কোন কোনটা দেখি ঠিক মানুষের মত শুইয়া হাত পা এলাইয়া ঘুমায়। একটা ওরাং ওটাং দেখিয়াছিলাম, সে একটি দোলনার উপর পেটের ভর দিয়া হাত পা ঝুলাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে তাহার যে কিছুমাত্র অসুবিধা হইতেছে এরূপ বোধ হইল না। অনেক জন্তুই ঘুমাইবার সময় ঠাণ্ডা ছায়া খোঁজে, কিন্তু নদীর ধারের কুমীরগুলা দুপুর রোদে চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে।

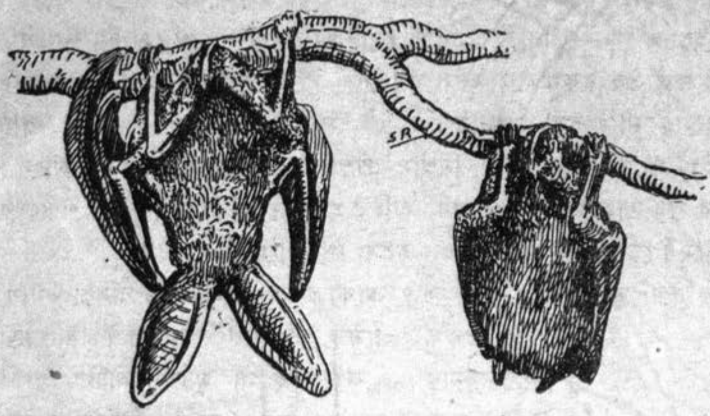
আবার কত জন্তু আছে তাহারা শীতকালটা বা গ্রীষ্মের গরমটা কুম্ভকর্ণের মত লম্বা লম্বা ঘুম দিয়া কাটায়। ভাল্লুক সাপ ব্যাং গেঁড়ি প্রভৃতি কোন কোন জন্তু এ

বিদ্যায় বেশ পাকা ওস্তাদ ; পরিষ্কার দিন হইলেই কাঠবিড়ালীগুলা রোদে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘলা দিন দেখিলে তাহারা অনেকেই গাছের ফাটলে কোটরে ঢুকিয়া ঘুমাইয়া থাকে—আবার পরিষ্কার রোদ না হওয়া পর্য্যন্ত সে ঘুম ভাঙ্গিতে চায় না। যে সকল জন্তু এই রকম লম্বা লম্বা ঘুম দেয়, ঘুমের সময় তাহারা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, না খাইয়া কাটায়। এই সময়ে তাহাদের শরীরটা প্রায় অসাড় ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে—এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে। এই রকম লম্বা ঘুমের পর তাহারা যখন আবার বাহির হয়, তখন দেখা যায় যে শরীরের চর্ব্বি শুকাইয়া তাহাদের চেহারা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

পাখীরা কেমন করিয়া ঘুম যায় দেখিয়াছ ত ? কাকাতুয়া যেমন দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়, সেই রকম অনেক পাখীই গাছের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমায়। কেহ কেহ পা মুড়িয়া মাটির উপর চাপিয়া বসে। বক যে এক-ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া চমৎকার ঘুমাইতে পারে তাহা সকলেই জান। প্যাঁচা প্রভৃতি কোন কোন পাখী ঘুমাইবার সময়ে গায়ের পালক ফুলাইয়া আপনাদের শরীরটাকে প্রায় দ্বিগুণ বড় করিয়া তোলে। এক রকম চন্দনা আছে তাহারা ঠিক বাদুড়ের মত গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ঘুমায়! (১৮৩ পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। বাদুড় কেমন করিয়া ঘুমায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—তাহারা মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ডানা মুড়িয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। শীতের সময়ে কলিকাতার ইডেন গার্ডন্‌সে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক দেখিয়াছি। বাদুড়েরা নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়, কিন্তু এগুলি যে রকম ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ আর ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তাহাই যদি ঘুমের নমুনা হয়, তবে না জানি সে কি রকমের ঘুম! ঘুমাইবার পূর্ব্বে বাদুড়েরা যে রকম ঘটা করিয়া ঘুমের আয়োজন করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। যে লম্বকর্ণ বাদুড় বা চামচিকার ছবি এখানে দেওয়া হইল ইনি ঘুমাইবার সময় প্রথমই গাছের ডাল



আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া পড়েন তারপর ডানা দুইটা দুচার বার ঝাড়িয়া খুব সাবধানে ভাঁজ করিয়া বন্ধ করেন। তারপর ফট্ করিয়া একটি প্রকাণ্ড কাণ মুড়িয়া যায়; খানিক বাদে সে আর একটি কাণও ঠিক ঐ রকম হঠাৎ গুটাইয়া লয়—তখন আর তাহাকে চিনিবার যো থাকে না।



বাদুড়ের কথা বলিতে গিয়া আরেকটা জন্তুর কথা মনে হয়, সে আপনাকে রীতিমত 'বেণের পুটুলি' পাকাইয়া ঘুমায়। তখন তাহাকে দেখিলে হঠাৎ জানোয়ার বলিয়া চিনিতে পারাই অসম্ভব। মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড ফল বা মৌচাক ঝুলিয়া আছে। এই জন্তুর নাম কোবেগো। দেখিতে কতকটা বাদুড়ের মত হইলেও, এটি বাদুড় নয়, এবং ইহার ডানাটাও বাদুড়ের ডানার মত ছড়ান নয়। বাদুড়ের মত উড়িতে না পারিলেও ইহারা এই ডানায় ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া ১০০।১৫০ শত হাত পার হইয়া যায়। ইহাদের ছানাগুলি বাঁদরের ছানার মত সবসময়ে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া



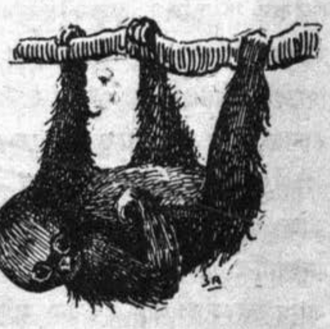
ঘুমন্ত কোবেগো

থাকে। এই রকম পুঁটুলি পাকাইবার অভ্যাসটা "বর্ম্মধারী" বা "আর্ম্মাডিলো" প্রভৃতি আরো কোন কোন জন্তুরও দেখা যায়।



কোবেগো

মাথা ঝুলাইয়া ঘুমান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের মধ্যে আর একজনের কথা বলিয়া শেষ করি। ইহার ইংরাজি নাম স্লথ অর্থাৎ অলস। বাস্তবিক এমন ঢিলা স্বভাবের অলস জন্তু আর বড় দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া আর অকাতরে ঘুমাইয়া ইহারা সারা বছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকান, মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমান—ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন একডালের পাতা ফুরাইয়া গেল, তখন আর এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভূঁড়ি দোলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে, ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময়ে ইহাদের মাথায় এক রকমের শেওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁৎলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি চ্যবণ প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়াছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না—কিন্তু মাথায় শ্যাওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধ হয় কতকটা সুবিধা হইত।



কুকুরের মালিক

ভজহরি আর রামচরণের মধ্যে ভারি ভাব। অন্তত, দুই সপ্তাহ আগেও তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুতা দেখা যাইত।

সে'দিন বাঁশপুকুরের মেলায় গিয়া তাহারা দুইজনে মিলিয়া একটা কুকুর ছানা কিনিয়াছে। চমৎকার বিলাতী কুকুর—তার আড়াইটাকা দাম। ভজুর পাঁচসিকা আর রামার পাঁচসিকা—দুইজনের পয়সা মিলাইয়া কুকুর কেনা হইল। সুতরাং দুইজনেই কুকুরের মালিক।

কুকুরটাকে বাড়ীতে আনিয়াই ভজু বলিল, "অর্দ্ধেকটা কুকুর আমার, অর্দ্ধেকটা তোর"। রামা বলিল, "বেশ কথা! মাথার দিকটা আমার, ল্যাজের দিকটা তোর"। ভজু একটু ভাবিয়া দেখিল, মন্দ কি! মাথার দিকটা যার সেইত কুকুরকে খাওয়াইবে, যত হাঙ্গাম সব তার। তাছাড়া কুকুর যদি কাউকে কামড়ায়, তবে মাথার দিকের মালিকই দায়ী, ল্যাজের মালিকের কোন দোষ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং সে বলিল, "আচ্ছা, ল্যাজের দিকটাই নিলাম"।

দুইজনে দুপুর বেলায় বসিয়া কুকুরটার পিঠে হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিত। রামা বলিত, "দেখিস্ আমার দিকে হাত বোলাস্‌নে", ভজু বলিত, "খবরদার, এদিকে হাত আনিস্‌নে"। দুইজনে খুব সাবধানে নিজের নিজের ভাগ বাঁচাইয়া চলিত। যখন ভজুর দিকের পা তুলিয়া কুকুরটা রামার দিকে কাণ চুলকাইত, তখন ভজু খুব উৎসাহ করিয়া বলিত, "খুব দে—আচ্ছা ক'রে খামচিয়ে দে"। আবার ভজুর দিকে মাছি বসিলে রামার দিকের মুখটা যখন সেখানে কামড়াইতে যাইত, তখন রামা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিত, "দে কাম্‌ড়িয়ে! একেবারে দাঁত বসিয়ে দে"!

একদিন একটা মস্ত লাল পিঁপ্‌ড়ে কুকুরের পিঠে কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরটা গা ঝাড়া দিল, পিঠে জিভ লাগাইবার চেষ্টা করিল, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া পিঠটা দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দুইজনে বিষম তর্ক উঠিল, কার ভাগে কামড় পড়িয়াছে। এ বলে "তোর দিকে পিঁপ্‌ড়ে লেগেছে—তুই ফেল্‌বি"; ও বলে "আমার ব'য়ে গেছে পিঁপ্‌ড়ে ফেল্‌তে—তোর দিকে কাঁদছে, সে তুই বুঝবি"। সে দিন দুইজনে প্রায় কথাবার্ত্তা বন্ধ হইবার জোগাড়।

তারপর একদিন কুকুরের কি খেয়াল চাপিল, সে তাহার নিজের ল্যাজটা

লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। নেহাৎ কুকুরে' খেলা—তার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। সে ধনুকের মত এক পাশে বাঁকা হইয়া ল্যাজটার দিকে তাকাইয়া দেখে, আর একটু একটু ল্যাজ নাড়ে। সেটা যে তার নিজের ল্যাজ, সে খেয়াল বোধ হয় তার থাকে না—তাই হঠাৎ অতর্কিতে ল্যাজ ধরিবার জন্য সে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাও নড়িয়া যায়, কাজেই ল্যাজটা আর ধরা হয় না। ভজু আর রামা এই ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহে পাল্লা দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রামার মহাস্ফূর্ত্তি যে ভজুর ল্যাজকে তাড়া করা হইতেছে, আর ভজুর ভারি উৎসাহ যে তার ল্যাজ রামার মুখকে ফাঁকি দিয়া নাকাল করিতেছে।

দুজনের চীৎকারেই হো'ক কি নিজের ট্যাটামির জন্যই হো'ক্, কুকুরটার জেদ চড়িয়া গেল। সমস্ত দিন সে থাকিয়া থাকিয়া চর্কীবাজির মত নিজের ল্যাজকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই রকমে খামখা পাক দিতে দিতে কুকুরটা যখন হয়রান হইয়া হাঁপাইতে লাগিল, তখন রামা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভজু বলিল, "আমার দিকটাই জিতিয়াছে"।

কিন্তু কুকুরটা এমন বেহায়া, পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই সে আবার ল্যাজ তাড়ান সুরু করিল। তখন রামা রাগিয়া বলিল "এইও! তোমার ল্যাজ সামলাও। দেখছ না কুকুরটা হাঁপিয়ে পড়ছে"। ভজু বলিল "সামলাতে হয় তোমার দিক সামলাও—ল্যাজের দিকে ত আর হাঁপাচ্ছে না"! রামা ততক্ষণে রীতিমত চটিয়াছে। সে কুকুরের পিছন পিছন গিয়া ধাঁই করিয়া এক লাথি লাগাইয়া দিল। ভজু বলিল "তবেরে! আমার দিকে লাথি মারলি কেন রে?" এই বলিয়াই সে কুকুরের মাথায় ঘাড়ে কাণে চটাপট্ কয়েকটা চাঁটি লাগাইয়া দিল। দুই দিক হইতেই রেষারেষির চোটে কুকুরটা ছুটিয়া পালাইল। তখন দুইজনে বেশ এক চোট হাতাহাতি হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই রামা দেখে, কুকুরটা আবার ল্যাজ তাড়া করিতেছে। তখন সে কোথা হইতে একখানা দা' আনিয়া এক কোপে ক্যাঁচ্ করিয়া ল্যাজের খানিকটা এমন পরিপাটি উড়াইয়া দিল, যে কুকুরটার আর্ত্তনাদে ভজু ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই দেখিল কুকুরের ল্যাজকাটা, রামার হাতে দা'। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না।

তখন সে রামাকে মারিতে মারিতে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। কুকুরটা ল্যাজ কাটার দরুণ রামার উপর একটুও খুসী হয় নাই—সে নিমকহারাম হইয়া 'রামার দিক' দিয়াই রামার ঠ্যাঙ্গে কামড়াইয়া দিল।

এখন দুজনেই চায় থানায় নালিশ করিতে। রামা বলে, "ল্যাজটা ভারি বেয়াড়া বারবার মুখের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে চায়—তাই সে ল্যাজ কাটিয়াছে। ল্যাজ না কাটিলে কুকুর পাগল হইয়া যাইত, না হয় সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মরিত। মারা গেলে ত সমস্তটা কুকুরই মারা যাইত, সুতরাং ল্যাজ কাটার দরুণ গোটা কুকুরটারই উপকার হইয়াছে। মুখ ও বাঁচিয়াছে, ল্যাজ ও বাঁচিয়াছে; তাতে রামার ও ভাল ভজুর ও ভাল। কিন্তু ভজুর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে সে রামার দিকের কুকুরকে রামার উপরে ল্যালাইয়া দিল। মুখের দিকে ভজুর কোন দাবীদাওয়া নাই, সে দিকটা সম্পূর্ণভাবেই রামার—সুতরাং রামার অনুমতি ছাড়া ভজু কোন্ সাহসে এবং কোন্ শাস্ত্র বা আইন মতে তাহা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে যায়? ইহাতে অনধিকার চর্চ্চা চুরি তছরূপ—সব রকম নালিশ চলে।

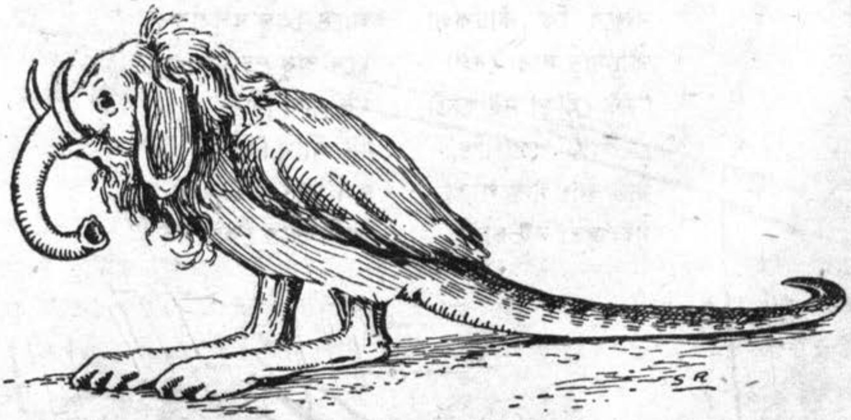
ভজু কিন্তু বলে অন্য রকম। সে বলে, রামার দিকের কুকুর রামাকে কামড়াইয়াছে, তাতে ভজুর কি দোষ? ভজু কেবল 'লে লে লে" বলিয়াছিল, তাহাতে কুকুর যদি রামাকে কামড়ায়, তবে সেটা তাহার শিক্ষার দোষ,—রামা তাহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেয় নাই কেন? তা ছাড়া ভজুর ল্যাজ খেলা করিতে চায়, রামার হিংসুটে মুখটা তাহাতে আপত্তি করে কেন? ভজুর ল্যাজকে কামড়াইতে যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? আর, রামা তার কুকুরের চোখ বাঁধিয়া কিম্বা মুখোস্ আঁটিয়া দিলেই পারিত—সে ল্যাজ কাটিতে গেল কাহার হুকুমে? একবার নালিশটি করিলে রামচরণ "বাপ বাপ" বলিয়া ছয়টি মাস জেল খাটিয়া আসিবেন—তা নইলে ভজুর নাম ভজহরিই নয়।

এখন এ তর্কের ত আর মীমাংসাই হয় না। আমাদের হরিশ খুড়ো বলিয়াছিলেন, "এক কাজ কর্, কুকুরটার নাকের ডগা থেকে ল্যাজের আগা পর্য্যন্ত দাঁড়ি টেনে তার ডান দিকটা তুই নে, বাঁ দিকটা ওকে দে—তাহ'লেই ঠিক মত ভাগ হবে।" কিন্তু তাহারা ও রকম "ছিল্‌কা কুকুরের" মালিক হইতে রাজি নয়। কেউ কেউ বলিল, "তা কেন? ভাগাভাগির দরকার কি? গোটা কুকুরটাই রামার, আবার গোটা কুকুরটাই ভজুর।" কিন্তু একথায়ও তাহাদের খুব আপত্তি। একটা বই কুকুর নাই তার গোটা কুকুরটাই যদি রামার হয় তবে ভজুর আবার কুকুর আসে কোথা হইতে? আর রামার গোটা কুকুরটাই যদি ভজুর হয়, তবে রামার আর থাকিল কি? কুকুর থেকে কুকুর বাদ, বাকী রইল শূন্যি!

এখন তোমরা যদি ইহার মীমাংসা করিয়া দাও।

কিম্ভূত !

বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁৎ খুঁৎ।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আবদারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই, সেটা চাই, কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।
কোকিলের মত তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে "উঁহু—দূর ছাই"!
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখীদের মানা নেই
তাই দেখে মরে কেঁদে—তার কেন ডানা নেই?
হাতীটার কি বাহার, দাঁতে আর শুণ্ডে
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে।
কাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে।

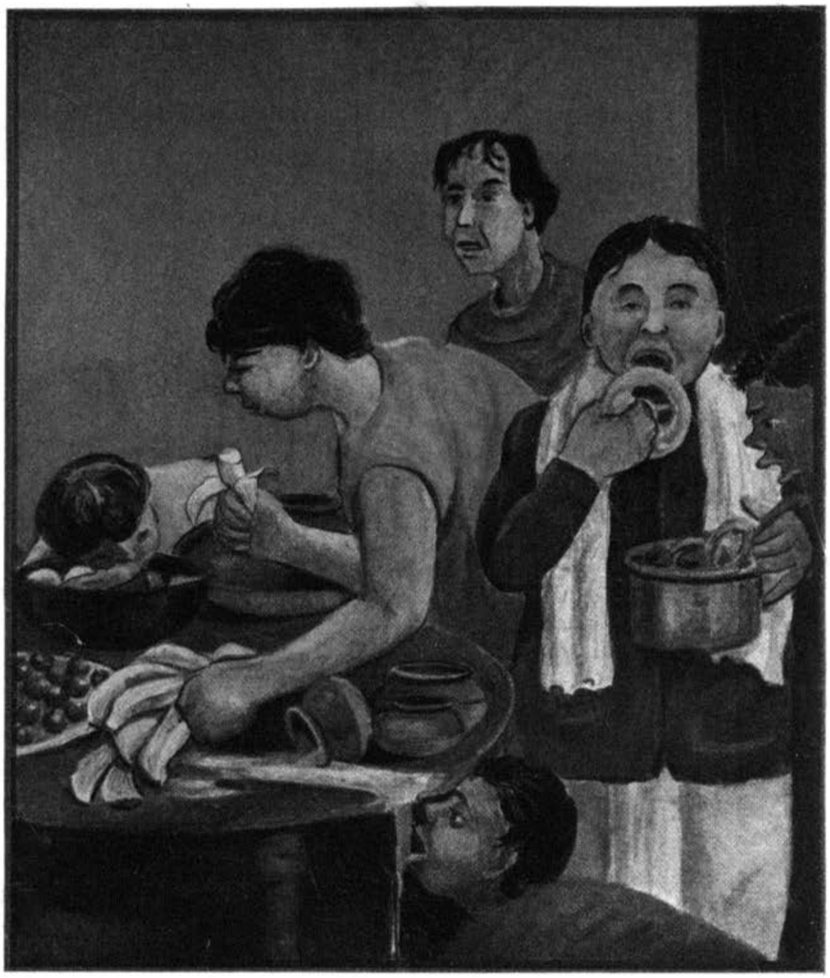


সিংহের কেশরের মত তার তেজ কৈ?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ কৈ?

একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখ্না
যারে পায় কেঁদে বলে "মোর দশা দেখ্ না" !
কেঁদে কেঁদে শেষটায়—আষাঢ়ের বাইশে—
হ'ল বিনা চেষ্টায় যা চেয়েছে তাই সে।

*   *   *   *

ভুলে গিয়ে কাঁদাকাটি আহ্লাদে আবেশে,
চুপি চুপি একলাটি বসে বসে ভাবে সে—
কোকিলের কুহু ডাক কেশরে কি শানাবে ?
খাড়া দাঁত শুঁড়ো নাক আকাশেতে মানাবে ?
লাফ দিয়ে হুস্ করে হাতী কভু নাচে কি ?
কলাগাছ খেলে পরে কাঙ্গারুটা বাঁচে কি ?
ভুলে কেউ মাড়া দিলে ল্যাজে যদি লেগে যায় ?
"বুড়োহাতী ওড়ে" ব'লে কেউ যদি রেগে যায় ?
কেউ যদি মুখ নেড়ে বলে তার সামনেই—
"কোথাকার তুই কেরে ? নাম নেই ধাম নেই" !
বল্‌বে কি কাঁচকলা আছে কিছু বল্‌বার ?
কাঁচুমাচু সারা বেলা মনে শুধু তোলপাড়—
"নই ঘোড়া নই হাতী, নই সাপ বিচ্ছু—
মৌমাছি প্রজাপতি, নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাং গাছ পাতা, জল মাটি ঢেউ নই
নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই !"



খাই খাই



ষষ্ঠ বর্ষ — কার্ত্তিক, ১৩২৫ — সপ্তম সংখ্যা

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হ'তেই সুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু—
পড়ার কথা খাতায় পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে!
মন চলে না—মুখ চ'লে যায় আবোল তাবোল ব'কে!
কাণটা ঘোরে কোন্ মুলুকে হুঁস্ থাকে না তার,
একাণ দিয়ে ঢুকলে কথা, ওকাণ দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি;
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি।
কল্পনাটা স্বপ্নে চ'ড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে—
আর কিরে মন বাঁধন মানে? ফির্‌তে কি চায় পাঠে?
পড়ার চাপে ছটফটিয়ে আর কিরে দিন চলে?
ঝুপ্ ক'রে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে।

ঔত্তম মনু

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ছিলেন উত্তম। উত্তমের মত ধার্ম্মিক ও ক্ষমতাশালী রাজা সেকালে খুব কমই ছিলেন। বভ্রুরাজকুমারী বেহুলার সহিত উত্তমের বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় বেহুলাকে বিবাহ করিয়াও তিনি সুখী হইতে পারিলেন না, কারণ বেহুলা রাজাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজার প্রতি তিনি নানা প্রকারে অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। একদিন আহারে বসিয়া একটি সুমিষ্ট খাদ্য রাজার নিকট এতই ভাল লাগিল যে, তিনি তাহার কিঞ্চিৎ রাণীকে না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু রাণী নিতান্ত অবহেলার সহিত তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন!

এইরূপে অপমানিত হইয়া, রাজার ক্রোধের সীমা রহিল না! তিনি তখনই মন্ত্রীকে হুকুম করিলেন—"এই মুহূর্ত্তে রাণীকে লইয়া গিয়া গভীর বনে রাখিয়া আইস।" মন্ত্রীর আদেশ পালন করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। রাণী বলিলেন—"ভালই হইল, আমাকে আর রাজার মুখ দেখিতে হইবে না!"

রাণীকে নির্ব্বাসন দিয়া রাজা উত্তমের মনে আর শান্তি থাকিল না! শুধু রাণীর কথাই সর্ব্বদা ভাবেন, শত চেষ্টার পরও রাণীর স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। সেজন্য তিনি আর বিবাহ করিলেন না; ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! রাত্রে আমি ঘুমাইয়াছিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু দরজা না খুলিয়াই, জানি না কে ঘরে ঢুকিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে! আপনি রাজা! আপনার নিকট নালিশ করিতেছি—শীঘ্র আমার স্ত্রীর সন্ধান করিয়া দিন্।"

রাজা বলিলেন—"আচ্ছা ঠাকুর! আপনার ব্রাহ্মণীকে ত আমি কখন দেখি নাই—বলুন দেখি, তাঁহার আকৃতি কিরূপ ছিল?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ! আমার ব্রাহ্মণী লম্বা, রোগা, হাত দুখানি বেঁটে, চোখ দুটি উগ্র, মধ্য বয়স, চেহারা কুৎসিতের একশেষ, স্বভাবও অতিশয় কর্কশ! রাজা বলিলেন—"ঠাকুর! ওরূপ কুলক্ষণা স্ত্রীর জন্য আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? আপনাকে আমি অন্য

সুলক্ষণা ব্রাহ্মণী আনিয়া দিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ! আমার স্ত্রী কুলক্ষণা হইলেও তাঁহাকেই আমি চাই; সুতরাং তাঁহাকেই আনিয়া দিতে হইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর, রাজা ব্রাহ্মণপত্নীর উদ্দেশে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন এক গভীর বনে গিয়া উপস্থিত! সেখানে পরম সুন্দর একটি তপোবনে দেবতার মত উজ্জ্বলকান্তি এক ঋষি বসিয়া আছেন। ঋষি রাজাকে দেখিবামাত্র সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া শিষ্যকে অর্ঘ্য আনিতে বলিলেন। তখন শিষ্য মৃদুস্বরে বলিল—"প্রভু! এই রাজাকে অর্ঘ্য দেওয়া উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন।" শিষ্যের কথায় মুনিঠাকুর কেবলমাত্র সম্ভাষণ ও আসনদানেই রাজার সম্মান রক্ষা করিলেন।

রাজাকে বসাইয়া মুনিঠাকুর বলিলেন—"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?" রাজা বলিলেন—"ঠাকুর! আমার রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে কে চুরি করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণীর সন্ধান করিতে করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু প্রভু! আপনি আমাকে অর্ঘ্য দিতে চাহিয়া, পরে কি জন্য তাহা দিলেন না—অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলুন।" ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি স্বায়ম্ভুব মনুর কুলে জন্মিয়াছেন, অর্ঘ্য পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সেজন্যই আপনাকে দেখিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া শিষ্যকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি অর্ঘ্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে শিষ্য সন্দেহ প্রকাশ করায় আমি আবার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম। মহারাজ! রাণীকে যে বনবাস দিয়াছেন সে কথা কি ভুলিয়া গেলেন? জানিবেন যে, স্ত্রীর সহিত সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মকেও আপনার পরিত্যাগ করা হইয়াছে। সেজন্যই আপনি অর্ঘ্য পাইবার অনুপযুক্ত।"

মুনিঠাকুরের কথায় রাজা উত্তম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর! এখন অনুগ্রহ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ পত্নীর সন্ধান বলিয়া দিন্।" মুনি বলিলেন—"মহারাজ! অদ্রিতনয় 'বলাক' রাক্ষস সেই ব্রাহ্মণপত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। উৎপলাবত নামক বনে গেলেই আপনি সেই দ্বিজপত্নীকে দেখিতে পাইবেন।"

মুনিঠাকুরের উপদেশে রাজা উত্তম উৎপলাবত বনে গিয়া সন্ধান করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন—ব্রাহ্মণ যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ আকৃতির এক ব্রাহ্মণী বসিয়া বেল খাইতেছেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাক্‌রুণ! আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন? আপনি কি বিশালতনয় সুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"হাঁ, আপনি যে বিশালপুত্রের নাম করিলেন, আমি তাঁহারই স্ত্রী। দুরাত্মা বলাক রাক্ষস, ঘুমের মধ্যে আমাকে চুরি করিয়া এখানে আনিয়া রাখিয়াছে! আমাকে এখনও কেন যে আহার করে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য!" ইহা শুনিয়া উত্তম বলিলেন—"সেই দুষ্ট রাক্ষস কোথায় গিয়াছে"? ব্রাহ্মণী বলিলেন—"এই বনের এক পাশেই রাক্ষসের বাড়ী, সেখানে গেলেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী রাজাকে পথ দেখাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণীর উপদেশমত বনের প্রান্তে গিয়া রাজা দেখিলেন, স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত বলাক রাক্ষস বসিয়া আছে। রাজাকে দেখিবামাত্র রাক্ষস বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল—"আমার পরম সৌভাগ্য যে, মহারাজ আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন। আপনার রাজ্যে বাস করি, আমি আপনার প্রজা—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন—"রাক্ষস! তোমার ভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন বল দেখি, এই ব্রাহ্মণীকে কেন আনিয়াছ? এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভক্ষণও কর নাই—অথচ ছাড়িয়া দেও নাই কেন"?

এ কথায় রাক্ষস বলিল—"মহারাজ! আমরা মানুষভোজী রাক্ষস নই—আমরা শুধু মানুষের স্বভাব ভোজন করিয়া থাকি! এই ব্রাহ্মণীর স্বামী একজন শ্রেষ্ঠ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সমস্ত যজ্ঞে ইনি পুরোহিতের কাজ করেন। আর 'রক্ষোঘ্ন' (যাহাতে রাক্ষস মারা যায়) মন্ত্র পড়িয়া আমার মনে ভয় লাগাইয়া দেন। ভয়ে আমি ক্ষুধা পাইলেও কোথাও যাইতে পারি না। সেজন্যই ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে সরাইয়া লইয়াছি—কারণ, স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ কখন যাগ যজ্ঞ করিতে পারে না।"

রাক্ষসের কথা শুনিয়া রাজার মন বড়ই বিষণ্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন—"রাক্ষস বলিল, স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ কখন যাগ যজ্ঞ করিতে পারে না। এই কথা বলিয়া সে আমাকেই নিন্দা করিয়াছে"।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় রাক্ষস বলিল—"মহারাজ এখন আমাকে কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করুন।" তখন রাজা বলিলেন—"তুমি বলিয়াছ মানুষের স্বভাব ভোজন কর। তবে আমার অনুরোধে এই ব্রাহ্মণীর উগ্র স্বভাবটী ভোজন করিয়া তাঁহার কর্কশতা ও কুলক্ষণ দূর কর। তারপর তাঁহাকে এখনই স্বামীর গৃহে রাখিয়া আইস।"

রাজার অনুরোধে বলাক, মায়া বলে সেই ব্রাহ্মণীর মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্বভাব ভক্ষণ করিল। তারপর রাজাকে বলিল—"মহারাজ! আমি এখনই ব্রাহ্মণীকে তাঁহার স্বামীর নিকট লইয়া যাইতেছি। আজ্ঞা করুন আপনার আর কোন কাজ করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন—"বলাক! তুমি যাহা করিলে তাহার জন্যই আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি। ভবিষ্যতে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি আসিও।" একথায় রাক্ষস সম্মত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে তাঁহার স্বামীর গৃহে লইয়া চলিল।

ব্রাহ্মণীকে লইয়া রাক্ষস চলিয়া গেলে পর রাজা পুনরায় সেই ঋষির নিকট গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—"ঠাকুর! রাণীর সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়াছি—কিন্তু তিনি বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়াছেন কিংবা কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইব—এ সব কিছুই জানি না। তাই আপনার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।" মুনি বলিলেন—"আপনার মন্ত্রী রাণীকে বনে রাখিয়া চলিয়া গেলে, নাগরাজ কপোতক তাঁহাকে দেখিতে পান। দেখিয়াই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাতালে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিন্তু নাগরাজের কন্যা নন্দা বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, তিনি রাণীকে এমনই কৌশলে নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন যে নাগরাজ কিছুতেই তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তারপর কন্যাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে রাগিয়া কন্যাকে শাপ দিলেন—'তুমি বোবা হইয়া থাক।' সেই অবধি নন্দা বোবা হইয়াছেন; কিন্তু তবু তিনি আপনার রাণীকে গোপন রাখিয়া পরম যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন।"

ইহার পর মুনিঠাকুরকে বন্দনা করিয়া রাজা উত্তম রাজধানীতে ফিরিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত! সুশীলা স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই; তিনি রাজাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বলিলেন—"ঠাকুর! আপনি ত স্ত্রীকে পাইয়া এখন সুখে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছেন—কিন্তু আমার উপায় কি? অবশ্য রাণীর সন্ধান পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহাকে আনিলেও যে আমি সুখী হইব না—কারণ আমার প্রতি তাঁহার ত কিছু মাত্র শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ! আয়োজন করিয়া দিন, আমি 'মিত্রবিন্দা' যজ্ঞ করিব। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের দুজনের মধ্যে মনের মিল হইবে।"

ব্রাহ্মণের উপদেশে রাজা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিলে, ব্রাহ্মণ মিত্রবিন্দা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে রাণী এখন

রাজার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! রাণী আপনার প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে আনিয়া সুখে রাজত্ব করুন।"

ইহার পর রাজা রাক্ষস বলাককে স্মরণ করিবামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহার নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলে পর, বলাক মুহূর্ত্তমধ্যে পাতাল হইতে রাণীকে লইয়া আসিল! রাণী বেহুলা রাজাকে দেখিরাই বলিলেন—"মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল পরে রাণী আরও বলিলেন—"মহারাজ! আমার সখী নাগরাজকন্যা মন্দা, আমার জন্যই পিতার শাপে বোবা হইয়াছেন। এখন যাহাতে তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসে তাহার উপায় করুন।" একথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সে জন্য ভাবনা কি? আমি এখনই সরস্বতীর পূজা করিয়া তাহাকে শাপমুক্ত করিব।"

ব্রাহ্মণ সরস্বতীর পূজা করিতেই পাতালপুরীতে রাজকুমারী নন্দা পুনরায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন! ইহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! নন্দাও নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তখন গর্গ ঋষি বলিলেন—"নন্দা! আমি তপোবলে জানিয়াছি, তোমার সখী বেহুলা তাঁহার স্বামীর সাহায্যে তোমার এই উপকার করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজকুমারী নন্দা তখনই উত্তমরাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাণীকে আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আপনি আমার যে উপকার করিলেন তাহার উপযুক্ত প্রতিদান আর কি দিব! যাহা হউক, আমার বরে আপনার মহাবলবান্, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র মন্বন্তরাধিপতি মনু হইবে।"

ইহার পর যথাসময়ে রাজা উত্তমের পরমসুন্দর এক পুত্র জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দুন্দুভি বাজিল, পুষ্পবৃষ্টি হইল। উত্তমের পুত্র, সুতরাং উপস্থিত মুনি ঋষিগণ তাঁহার নাম রাখিলেন—ঔত্তম। ইনিই পরে 'ঔত্তম মনু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সাতচাল আর একচাল

(সাঁওতালি গল্প)

সাতচাল আর একচাল দুজনে ভারি বন্ধুতা। লোকে বল্‌ত সাতচালের চাইতে একচালের বেশী বুদ্ধি। কিন্তু সাতচাল ভাব্‌ত—লোকে বল্‌লে কি হয়, আমার নাম দিয়েইত বুঝা যায় কে বেশী চালাক। যাহোক একদিন এই বুদ্ধির পরীক্ষা কর্‌বে বলে সাতচাল চল্‌ল একচালের বাড়ীতে।

একচাল বাস্তবিকই ভারি চালাক ছিল। সে যখন দেখ্‌ল তার বন্ধু সাতচাল আস্‌ছে, তখন সে একটি ছোট্ট মেয়েকে বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে রেখে, স্ত্রীকে বল্‌ল— "শীগ্‌গির ভাল করে রান্না কর, বন্ধু আস্‌ছেন।" ক্রমে সাতচাল এসে উপস্থিত! আদর অভ্যর্থনার পর একচাল বল্‌ল, "বন্ধু! দুপুরের আহারটা আজকে আমার বাড়ীতেই কর্‌তে হবে।"

স্নানের পর দুই বন্ধুতে বসে খাচ্ছে এমন সময়, হঠাৎ যেন ভারি রেগে, একচাল



তার স্ত্রীকে বল্‌ল—"ডালে নুন দিস্ নি, রেঁধেছিস্ কি তোর মুণ্ডু? যত বয়স বাড়ছে ততই

যেন দিন দিন বোকা হচ্ছিস। তোকে ঠেঙ্গিয়ে আজ তোর বয়েস বা'র করে দিব!" এই বলেই একটা লাঠি নিয়ে স্ত্রীর পিঠে এক ঘা! (অবশ্যি বেশী জোরে নয়)। তারপর তাকে তাড়া ক'রে ঠেলে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। মনে হলো যেন ভিতরে গিয়েও খুব ঠেঙ্গাচ্ছে। খানিক পরেই, সেই যে বাড়ীর ভিতরে ছোট মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে হিড় হিড় করে বাইরে টেনে এনে সে আবার খেতে বস্‌ল।

সাতচাল ভাবল, তাইত! ঠ্যাঙার চোটে অনেকটা বয়স ঝরে গেছে দেখ্‌ছি। সে অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌ল—"যাবার সময় লাঠিটা চুরি করে বাড়ীতে নিয়ে যাব। দেখ্‌ব আমার স্ত্রীকেও পিটলে ছোট হয় কিনা!" এই ভেবে সে সুযোগ বুঝে লাঠিখানা সরিয়ে নিল। পরের দিন খেতে বসে সে হঠাৎ রেগে স্ত্রীকে বল্‌ল—"কি, ডালে নুন দিস্‌নি?" বলেই সেই লাঠিটা দিয়ে দমাদম্ প্রহার! মারতে মারতে বাড়ীর ভিতর ঠেলে নিয়ে আবার বাইরে টেনে এনে দেখ্‌ল—কই! বয়স ত এক দিনের মতও কমেনি! তখন সে ভাবল, হয় ত ভাল ক'রে ঠ্যাঙ্গান হয়নি। তাই আবার সে এমনি প্রহার দিল যে স্ত্রী বেচারির হাড় মট্‌কে গেল! কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। তখন সে নিতান্ত নিরাশ হয়ে বসে বসে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সাতচাল আবার একদিন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত! সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর একচাল বল্‌ল—"চল বন্ধু, শিকার করে আনি গিয়ে।" শিকারে যাবার আগে একচাল স্ত্রীকে বল্‌ল—"পাড়া থেকে একটা খরগোস্ কিনে এনে বাড়ীতে রেখে দিও।" তারপর দুই বন্ধুতে বনে গিয়েই একটা খরগোস্ দেখ্‌তে পেয়েছে। একচাল সঙ্গে করে তার কুকুর এনেছিল। কুকুরটা ভীতু আর অপদার্থের একশেষ! খরগোস্‌টাকে দেখেই একচাল কুকুরের গলার শিকল খুলে দিয়ে বল্‌ল—"যা, ঐ খরগোস্‌টাকে তাড়িয়ে পথ দেখিয়ে বাড়ী নিয়ে যা।" ভীতু কুকুর ছাড়া পাওয়ামাত্র বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে লেজ গুটিয়ে বাড়ীর পানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! তখন একচাল বল্‌ল—"চল বন্ধু বাড়ী যাই। ও আমার শেখান কুকুর, এতক্ষণে খরগোস্‌টাকে ঠিক বাড়ী নিয়ে হাজির করেছে"।

বাড়ী এসেই একচাল তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁ গা! কুকুরটা কি খরগোস্ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে?" তখন তার স্ত্রী—'হাঁ, ঐ ঘরে খরগোস্‌টাকে রেখে দিয়েছি'— এই ব'লে সেই কেনা খরগোস্‌টাকে এনে দেখাল। সাতচাল মনে মনে ভাব্‌ল— "এমন গুণের কুকুরটিকে চুরি না করলে চল্‌ছে না!" এই ভেবে সে পরদিন রাত্রেই

এসে কুকুরটাকে চুরি করে নিয়ে গেল। সকাল বেলা সে কুকুর নিয়ে বনে গেল শিকার করতে। তারপর একটা খরগোস্ দেখে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল। সাতচাল ধীরে আস্তে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করল—"কুকুরটা কি খরগোস্ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে ?" তখন স্ত্রী বল্‌ল—"কুকুরটা ফিরেছে বটে কিন্তু খরগোস্ টরগোস্ নিয়ে ত ফেরেনি"। একথায় সাতচাল ভাব্‌ল, "খরগোস্‌টাকে বোধ করি পথে খেয়ে ফেলেছে। কুকুরটার সঙ্গে সঙ্গে আমার আসা উচিত ছিল।" এই ভেবে কুকুর নিয়ে আবার বনে গেল। এবার খরগোস্ দেখে, কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা যখন ছুট্ দিল তখন সাতচালও তার পিছনে পিছনে তাড়া করল! শিকার ফেলে কুকুরের পিছনে তাড়া! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সকলে হেসে গড়াগড়ি! যাহোক্, এবারেও বাড়ী গিয়ে সাতচাল যে খরগোস্ দেখ্‌তে পায়নি সেটা ত বুঝতেই পার!

এর পর আর একদিন যখন সাতচালি বন্ধুর বাড়ী গেল তখন একচাল তাকে নিয়ে গেল ছিপ্ দিয়ে মাছ ধর্‌তে। যাবার আগে সে স্ত্রীকে বলে গেল—"কতগুলো জ্যান্ত কৈ মাছ এনে হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে দিও।" তারপর খানিক দূর গিয়ে একচাল একটা পুকুরে ছিপ্ ফেল্‌ল। ফেলতে না ফেলতেই একটা কৈ মাছ এসে টোপ খেয়েছে। অমনি সে এক টান্ মেরে সূতোটুতোশুদ্ধ মাছটাকে পিছনে বাড়ীর দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েই সাতচালকে বল্‌ল—"দেখেছ, মাছ ধরবার কায়দা! এখন বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বে, ওর জানা যত কৈ মাছ, সব বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে"।

তখন দুই বন্ধুতে বাড়ী ফিরে এলে পর একচাল তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—"কৈ মাছটাকে ব'লে দিয়েছিলাম তার দলবলশুদ্ধ বাড়ী আস্‌তে। সেটা এসেছে কি ?" অমনি তার স্ত্রী "দেখ্‌ছি" বলে বাড়ীর ভিতর থেকে এক ঝুড়ি জ্যান্ত কৈ এনে হাজির! সাতচাল এই অদ্ভুত ছিপ্‌টাও চুরি করল। পরদিন মাছ ধরতে গিয়ে সেও একটা কৈ মাছ তুলেই ঠিক সেইরকমে সূতোশুদ্ধ ছুড়ে ফেলে দিয়ে, বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—"কি গো! কৈ মাছের বন্ধুরা এসেছে কি ?" একথা শুনে তার স্ত্রী ত হেসেই গড়াগড়ি!

তখন থেকে সাতচালও বুঝতে পারল যে একচাল তার চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

নানা প্রসঙ্গ

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখী মারিতে গিয়াছিল। পাখী শীকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবলমাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখী মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবল-মাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপী মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটী মিট মিট করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ার ত সে কোন দিন খাইতে যায় নাই;—তবে বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ 'কিম্ভূত কিমাকারের' সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।



* * *

একজন লোক নানাপ্রকার শব্দ ও "বিদ্‌ঘুটে" মুখভঙ্গী করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই, এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল। আমরা যে রকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা

নোঙাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল ; আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনও করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটী সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটী করিল। সিংহ





থামিল এবং চিন্তান্বিত হইল ; আর এক মুখ বিকৃতি, আর এক চীৎকার—সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর এক চীৎকার—সিংহ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

* * *

এক একটা জানোয়ারের এক এক প্রকার দুর্ব্বলতা থাকে। একজন শুনিল যে, গায়ের পিরান খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া উল্টাইয়া মাথার উপর পর্য্যন্ত আনিয়া, তার পর মাথা নোয়াইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া, কুকুরের কাছে গেলে, বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটী সুন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশীর অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার এক প্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। সুতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবার কোন আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে।



যাহা ভাবিল, কাজেও তাহাই করিল। আস্তে আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল বুঝি কুকুর পলাইয়াছে—বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর



কিন্তু ভয় পায় নাই ; তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ্

মারিয়া ছিল। উল্টোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যাই ইনি তাহার কাছে আসিয়াছেন, অমনি সে ইঁহার পিছন হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

* * *

কতকগুলি আইরিশ সাহেব একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কাণ্ড কারখানা অন্য রকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেক বার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিচাইলেন, কিন্তু মশারা কোনমতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি চ্যাচাইয়া উঠিলেন, "ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে ? ঐ দেখ জানোয়ারগুলির একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে !"

[সখা—১৮৮৬

খাই খাই *

খাই খাই কর কেন, এস ব'স আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙ্গালীর ভাষাতে,
জড় করে আনি সব,—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারী ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড় সিধে সে !

* নুতন প্রকাশিত গ্রন্থ "পার্ব্বণী" হইতে এই কবিতাটি গৃহীত হইল।

জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধ'রে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাং খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্ম্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্‌রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা—
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেখে খাও, যেটা চায় রসনা ;
তা না হ'লে কলা খাও—চটো কেন ? ব'সনা—
সবে হ'ল খাওয়া সুরু, শোন শোন আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চ'ড়ে জুড়ী-গাড়ীতে
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি ?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি ?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা ;
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারীটা তাড়া খায় ভিখ্ নাহি পায়রে—
"দিন আনে দিন খায়" কত লোকে হায়রে।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, "সেরে গেছে, আর না।"
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কীল চড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।

জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্‌,
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ ঝিম্‌।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কাণটা,
কাণমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোন, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়োনা—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেয়োনা।
'ফেল্‌' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে;
আদা-নূন খেয়ে লাগো, পাশ কর এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ো নাক', যেয়োনাক ভড়কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে "ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়"। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণরা যখন পারিস্‌ সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন পারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু

পারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর সহরেও লোকে সখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর "ঠেলায় পড়িবার" দরকার হয় না।

এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া যোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই—সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্ত্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া জোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমানে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের লোকেরা মাংসখোর জাতি, প্রতিবৎসর তাহারা লক্ষ লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা? বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে সব খাবার জিনিষ চালান আসে জার্ম্মান জলদস্যুর ডুবুরি জাহাজ সেই গুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড় চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার জন্য বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোন খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে চায় না, সেই জন্য আমেরিকার একদল লোকে বক্তৃতা করিয়া কাগজেপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া, এবিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙ্গিতেছেন। আমেরিকার কোন কোন সহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই, তাহারা যে তিমি খাইতে বেশীদিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও-জিনিষটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গোমাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোন তফাৎ বুঝিবে কিনা সন্দেহ।

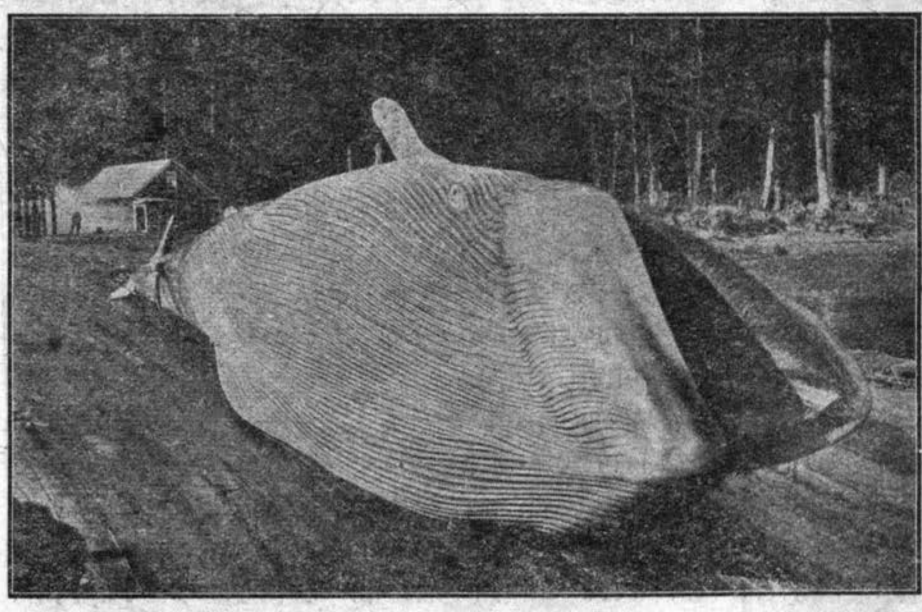
সব রকম তিমির মাংস খাইতে ভাল নয়। যেগুলি বিশেষ ভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোট খাট তিমি—অর্থাৎ মোটে ২০।২৫ হাত লম্বা! মোম তিমি বা Sperm whale লম্বায় খুব বড় হয়—এক একটা ৬০ হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব চাইতে বড় যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা



মোম তিমি ও রাক্ষুসে অক্টোপাস

লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক একটি বড় তিমির ওজন চার হাজার মণেরও বেশী হয়—অর্থাৎ ত্রিশ চল্লিশটা বড় বড় হাতীর সমান। এই সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ এখন প্রায় উজাড় হইয়া আসিয়াছে।

তিমি নানারকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যে গুলার দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মত একটা জিনিষ থাকে, তাহাকে বলে কাচকড়া



দন্তহীন অতিকায় তিমি।

বা Whalebone। এই জিনিষটা মানুষের অনেক সৌখিন কাজে লাগে, এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তা ছাড়া এক একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চর্ব্বি থাকে তাহার দামও বড় সামান্য নয়। যে মোমতিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাচকড়া নাই, কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌববাচ্চা

ভরা মোম থাকে! এই মোমের চমৎকার বাতি হয়, এবং নানারকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চর্ব্বি ও কাচকড়ার জন্য মানুষে সমুদ্রের নানাস্থানে বড় বড় তিমিগুলিকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া এখন ছোট খাট তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যে সব "ছোট খাট" তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক একটাকে মারিলে প্রায় তিন চার শত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজ কাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বার শতের বেশী তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরও লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চর্ব্বি চামড়া সমস্তই কাজে লাগান চলিবে। এতকাল চর্ব্বি ও কাচকড়া বাহির করিবার পর অত বড় প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদর পূর্ত্তি হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তারপর, কঙ্কালটুকুও ফেলিবার জিনিষ নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমীর সার ও নানারকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চর্ব্বি ভরা বলিয়া তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চর্ব্বি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুত চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মত এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়ত এখনও বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে।

এত বড় প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে; তাহাদের একটাকে মারিলে বাকীগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে-দল মারিয়া ফেলা খুব সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোন কোন দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমত বদ্‌রাগী। এবিষয়ে মোমতিমির দুর্নাম সব চাইতে বেশী। মাঝে মাঝে এক একটা দল-ছাড়া মোমতিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সেই জানে। কখন সে ঢুঁ মারে, কখন সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখন তার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা

ল্যাজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝিমাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের "নিরীহ তিমি" বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্ করে, তখন সেও একটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।



তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক এক বারে হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক শুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয়; তারপর সেই কাচকড়ার ঝালরের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলা সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার ফুঁটা এত ছোট যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোন বড় মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতাল তিমিরা এ রকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা বড় বড় সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোমতিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখানকার বড় বড় বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলাকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক একটি পা হাতীর পায়ের সমান মোটা! সে জন্তুটা যে আট দশটা হাতীর সমান বড় ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"তিমি মাছ" যে আসলে মাছই নয়, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক একটি ছানা হয় ঘোড়ার মত মস্ত; তাহারা জন্মিয়া

মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সে রকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের উপরে উঠিতে হয়। কখন কখন জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময়, তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

কৃপণের সাজা

এক কৃপণ ছিল; তার অনেক জমিজমা। তার ক্ষেতভরা শস্য, আর গোলায় ভরা ধান; তবু তার চাকর বাকরদের সে ভাল করে খেতে দেয় না। বেচারারা কিছুদিন কোনরকমে আধপেটা খেয়ে কাজ করে; কিন্তু শেষে তারা খাওয়ার অভাবে এমন কাহিল হ'য়ে পড়ে যে আর কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। তখন পালান ভিন্ন আর উপায় থাকে না। মাইনে চাইতে গেলে কৃপণ লোকটি বলে "কাজ ফেলে পালিয়েছিস্, আবার মাইনে কিরে?" এমনি ক'রে বেচারারা বিনে মাইনেয় কাজ ক'রে নাকাল হ'য়ে ফেরে।

তাদের গাঁয়ে কোরা ব'লে একটি লোক ছিল; তার গায়ে যেমন জোর, তেম্‌নি তার বুদ্ধি। তার বাড়ীতে খাওয়া পরার অভাব ছিল না, কিন্তু তবু সে সেই কৃপণের কাছে গিয়ে বল্‌ল, "হুজুর, আমি আপনার কাছে চাক্‌রি কর্‌ব। আমার গায়ে খুব ক্ষমতা আছে—চার জনের কাজ একাই কর্‌তে পারি। আমি মাইনে টাইনে চাই না; আপনি খালি একটি পাতা ভ'রে রোজ আমাকে ভাত দেবেন; সে কলাপাতাও আমি নিয়ে আসব, আপনার দিতে হবে না। তা ছাড়া একটি ধান আর একটি ভুট্টার দানা থেকে চাষবাস ক'রে যে কয়টি ধান আর দানা পাওয়া যায়, সেগুলি বুন্‌বার মত যথেষ্ট জমি আমাকে দেবেন! আমি যদি কাজ ছেড়ে পালাই, কি এর চেয়ে বেশী কিছু চাই, কিম্বা মাইনের জন্য গোলমাল করি, তাহ'লে আমার ডান হাতের তিনটে আঙ্গুল কেটে নেবেন। আর আপনি যদি আমাকে ছাড়ান কিম্বা কথামত কাজ না করেন, তা হ'লে আমিও আপনার ডান হাতের তিনটে আঙ্গুল কেটে নেবো।" কৃপণ ভাবল, এক বেলা ভাত খাইয়ে লোকটাকে বেশ ফাঁকি দিয়ে কাজ করান যাবে! তাই সে খুসী হ'য়ে বল্‌ল, "হাঁ, আমি তোমার কথায় খুব রাজি আছি। তুমি এখনই একটা ধান আর ভুট্টার দানা নিয়ে যাও, আর তোমার পাতা নিয়ে এস।"

কোরা ভুট্টার দানা আর ধান নীচু জমিতে পুঁতে রাখ্‌ল ; আর একটা প্রকাণ্ড কলাপাতা নিয়ে কৃপণের কাছে হাজির হ'য়ে বল্‌ল "এখন পাত ভ'রে ভাত দিন।" কৃপণের ত চক্ষু স্থির ! কিন্তু 'না' বল্‌বার জো নাই। সে তো আগেই বলেছে একটি



পাতা ভ'রে ভাত দিতে হবে ! এম্‌নি ক'রে রোজ কোরাকে প্রকাণ্ড কলাপাতা ভর্ত্তি ক'রে ভাত দিতে হ'ত। সে একা এক বেলায় চার জনের ভাত খেয়ে ফেল্‌ত।

ক্রমে সেই ধান আর ভুট্টার দানা থেকে গাছ হ'য়ে তা' থেকে এক মুঠো ধান আর দুটো মোটা মোটা ভুট্টা হ'লো। সেগুলি পুঁতবার জন্য খানিকটা উঁচু জমী কোরাকে দিতে হ'ল। তার প্রত্যেকটা ধান আর প্রত্যেকটা ভুট্টার দানা থেকে আবার সে এক মুটো ক'রে ধান আর দুটো ক'রে আস্ত ভুট্টা পেলে। প্রথম যেখানে একটি ধান ছিল, তার জায়গায় ৫০০ ধান হ'ল। সেই পাঁচশ' ধান থেকে আবার তার পাঁচশ গুণ অর্থাৎ আড়াই লক্ষ ধান হ'ল। ভুট্টার দানাগুলোও এই রকম ভাবে বেড়ে চলেছে। এ সমস্ত ধান আর ভুট্টাই সেই প্রথম দুটি দানারই ফসল, সুতরাং তার জন্য কৃপণকে

ক্রমেই অনেক খানি জমী ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এমনি ক'রে দু'এক বছরের মধ্যেই কৃপণের সমস্ত জমিই কোরার ধান আর ভুট্টার ফসলের জন্য দখল হ'য়ে গেল।

কৃপণ বেচারা আর করে কি? তার অবস্থা দিন দিনই খারাপ হ'তে লাগ্‌ল। শেষে তাকে বাধ্য হয়ে কোরার কাছে চাকরী চাইতে হ'ল। কিন্তু কোরা বল্‌ল, "আমার কাছে চাকরী কর্‌লেও কিন্তু আমাকে মাইনে দিতে হবে, আর রোজ এক এক পাতা ভরে ভাত দিতে হবে। তা না হ'লে তোমার তিনটে আঙ্গুল কাটা যাবে।" কৃপণ তো এ কথা শুনে কেঁদেই ফেল্‌ল। সে বল্‌ল, "দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার অর্দ্ধেক জমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি; আর যত লোকের যা-কিছু মাইনা বাকি, সব আমি চুকিয়ে দিচ্ছি। আর কখনও আমি কাউকে এ রকম অন্যায় ক'রে কষ্ট দেবো না।" তখন কোরা তাকে নাকে খৎ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিল।

শ্রীসুবিনয় রায়।

বিলাতী হাতুড়ে

রাস্তা দিয়ে এক বুড়ী চ'লেছে, আর চেঁচিয়ে বল্‌ছে, "বাত ভাল কর্‌ব; দাঁতের পোকা বার্ কর্‌ব!" সেই বুড়ী নাকি ভারি ওস্তাদ বদ্যি। তাকে বল্‌লেই সে 'দাঁতের পোকা' বার করবে! তোমার দাঁতে ব্যথা হোক আর নাই হোক, সে এসেই তোমার দাঁতের মধ্যে থেকে পোকা ধ'রে দিয়ে তোমার ব্যারাম দূর করবে! জোঁক লাগিয়ে তোমার বাতের রক্ত শুষে নিয়ে বাত সারিয়ে দেবে! সব অসুখই নাকি সে শরীর থেকে টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারে। তার ভিজিট ও খুব কম;—দু'চার আনা হ'লেই তার চলে; তবে, তেমন-তেমন বড়লোক রোগী হ'লে আলাদা কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অনেক লোকে এ সব হাতুড়ে বদ্যিকে খাতির করে। কেবল আমাদের দেশেই যে এসব হাতুড়ে চিকিৎসা চলে তা' নয়; পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই এ রকম দেখা যায়। দুই শ' বৎসর আগে ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই যে সব আনাড়ি বদ্যির হাতে চিকিৎসার ভার থাকত তাঁরাও হাতুড়ে বিদ্যায় এক একটি কম ওস্তাদ ছিলেন না।

তাঁদের এক একজনের বিদ্যার দৌড় যতটুকুই হোক, ভড়ং আর বুজরুকিটা ছিল ষোল আনা। ডাক্তারের ঘর যেন একটা আস্ত "যাদুঘর"! সেখানে কত অদ্ভুত

জিনিষই দেখা যেত! কয়েকটা মরার মাথা, মরা কুমীর, বানরের কঙ্কাল, লাল, নীল, হলদে, সবুজ, বেগুনী, নানা রঙের জল, নানারকম গ্রহ নক্ষত্রের নক্সা, আর কত পুরাণো পুথি, তার ভাষা ডাক্তার নিজেই পড়তে পারেন না! এ সবের মাঝে ডাক্তার মশাই গম্ভীরভাবে ব'সে রোগীর উপর তাঁর হাতুড়ে বিদ্যে প্রয়োগ করতেন।

ওষুধেরই বা ভড়ং কত! ইঁদুরের চর্ব্বি, বেড়ালের চর্ব্বি, ছুঁচোর চর্ব্বি, খরগোসের চর্ব্বি, হাঁসের চর্ব্বি, কেঁচোর রস, শামুকের আরক, পোকা মাকড়ের পাঁচন—আরো কত রাজ্যের বিদ্‌ঘুটে জিনিষ! যদি কারো মৃগী রোগ হয়, তাকে কালো বেড়ালের ল্যাজের ডগার তিন ফোঁটা রক্ত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে, দিনে একবার ক'রে তিন দিন খাওয়াতে হবে। তা'তে যদি না সারে, তবে পা দুটো উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটিয়ে, দিনে তিনবার তিন দিন ক'রে, তিন ধাপ সিঁড়ি নামাতে হবে! যদি তোমার জ্বর হয়, তা হ'লে তোমাকে সাদা কাপড়ে জড়ান হবে, সাদা জিনিষ খেতে দেওয়া হবে, সাদা ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তেও দেওয়া হবে না। সাদা নাকি জ্বরকে জমিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়! যদি তোমার বসন্ত হয়, তবে তোমাকে কেবলই লাল জিনিষ খেতে দেওয়া হবে, লাল জল দেওয়া হবে, লাল কাপড় পরান হবে, লাল বিছানায় শোয়ান হবে, জানালায় লাল পর্দ্দা দেওয়া হবে, বেদনার লাল দানা, লাল তুঁত ফল খেতে দেবে। লাল কি না আগুনের রং, তাই লালে শরীর গরম করে বসন্তের ভূতকে তাড়াবে।

কেবল ওষুধেই শেষ নয়—মার-ধর কর্‌তেও তাঁরা খুব মজবুত ছিলেন। যদি তোমার পালাজ্বর হয়, তবে তোমায় ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙিয়ে জ্বর তাড়ান হবে! যদি কোন লোক যুদ্ধে আঘাত পায়, তবে তখনই তার চামড়া ফুঁটো ক'রে রক্ত বের ক'রে তার আঘাত সারান হবে! তাতেও নিস্তার নেই, প্রতি বৎসর সেই তারিখে একবার ক'রে তার গায়ের রক্ত নেওয়া হবে—তা সে যতই সুস্থ হোক্ না কেন!

এত কাণ্ডকারখানা ক'রেও যদি অসুখ না সারত, তা হ'লে বদ্দিমশাই আকাশের কোন গ্রহ নক্ষত্রের উপর সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মাথা ধরলে তাঁরা বলতেন, "চাঁদের ছোঁয়া লেগেছে"। বুকে বেদনা হ'লে সেটা বুধ কিম্বা সূর্য্যের দুষ্টামি। সুতরাং অসুখ করলে আগে গ্রহশান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ওষুধ দেওয়া হ'ত না। তোমায় যদি পাগ্‌লা কুকুরে কামড়ায়, তবে পূর্ণিমা না আসা পর্য্যন্ত তার চিকিৎসা হ'তে পারবে না! এতে তুমি যদি আপত্তি কর, বা তোমার অবস্থা যদি সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়ায়—চিকিৎসক বলবেন "কি করব? চাঁদের উপরে ত আমার হাত নেই"! আর গ্রহ নক্ষত্রের যদি

দোষ পাওয়া না যায় তা হ'লেও ভূত বা ডাইনী একটা কিছুর উপর দোষ চাপালেই হ'ল। বিশেষত, গ্রামে যদি বুড়ী কেউ থাকে, আর দু'দশজন লোক হাতুড়ের হাতে মারা পড়ে, তা হ'লে ত সেই বুড়ীর উপর সন্দেহ পড়বেই। এরকম ক'রে কত নির্দোষী বেচারাকে যে ডাইনী ব'লে পুড়িয়ে মারা হ'ত তার আর সংখ্যা নেই। কি ভাগ্যি যে এসব হাতুড়ের অত্যাচার আর নেই—নইলে আমাদের কি মুস্কিল হ'ত, ভাব দেখি।

শ্রীসুবিনয় রায়।

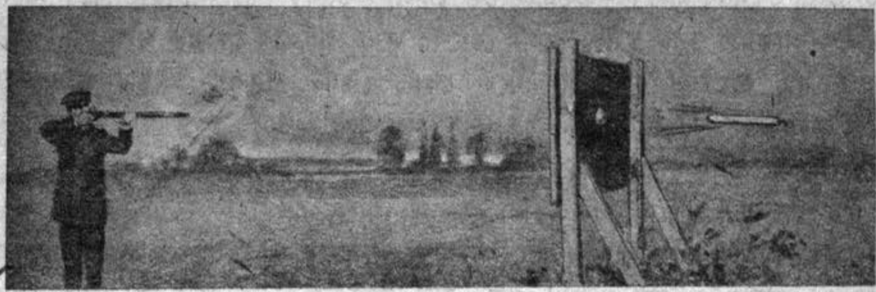
বেগের কথা

যে লোক সৌখিন, সামান্য কষ্টেই কাতর হইয়া পড়ে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় "ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়"। রঘুবংশে আছে যে দশরথের মা ইন্দুমতী সত্যসত্যই ফুলের ঘায়ে, কেবল মূর্চ্ছা নয়, একেবারে মারাই গিয়াছিলেন। ইন্দ্রের পারিজাতমালা আকাশ হইতে তাঁহার গায়ে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যখন এই বর্ণনাটা শুনিয়াছিলাম, তখন ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।

তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ করিয়া পিঠে পড়ে, তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয় ; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তাল গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারাগাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট্ লাগিত না। কেন লাগিত না ? কারণ, তাহার বেগ কম হইত। কোন জিনিষ যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে, ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। যে হাড়ের টুকরাটি দোতালা হইতে এক তলায় মানুষের মাথায় পড়িলে বিশেষ কোনই অনিষ্ট হয় না—সেইটিই যখন চিলের মুখ হইতে পড়িতে পড়িতে অনেক নীচে প্রবল বেগে আসিয়া নামে, তখন তাহার আঘাতে মানুষ রীতিমত জখম হইতে পারে। ফুলের মালাটিকেও যদি যথেষ্ট উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার আঘাতটি যে একেবারেই মোলায়েম হইবে না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঘূর্ণী বায়ুর সময় সামান্য খড়কুটা পর্য্যন্ত যে ঝড়ের বেগে গাছের ছালে বিঁধিয়া যায়, ইহা অনেক সময়েই দেখা যায়। একটা নরম মোমবাতিকে বন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গুলির মত করিয়া ছুটাইলে, সে যে পুরু তক্তা ফুঁটা করিয়া যায়, ইহাও মানুষে পরীক্ষা

করিয়া দেখিয়াছে। বন্দুকের গুলি জিনিষটা আসলে খুব মারাত্মক নয়; হাতে ছুঁড়িয়া



মারিলে তাহাতে চোট্ লাগিতে পারে, কিন্তু সে চোট খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিষ যখন বন্দুকের ভিতর হইতে বারুদের ধাক্কায় প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন আস্ত মানুষটাকে এপার ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার রোখ থামিতে চায় না।

জলের কল হইতে যে জলধারা পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেখ—যেটুকু বাধা বোধ করিবে তাহা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু ঐ রকম সরু একটী জলের ধারা যখন খুব প্রবল বেগে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন মনে হয় সে যেন লোহার মত



শক্ত—তখন তাহাকে কুড়াল দিয়াও কাটা যায় না! ফ্রান্সের একটা কারখানায় চারশত হাত উঁচু পাহাড় হইতে জলের স্রোত আনিয়া তাহার জোরে কল চালান হয়। সেই জল যখন এক আঙ্গুল মোটা একটি নলের ভিতর হইতে ভীষণ তোড়ে বাহির হয়—তখন তাহাতে তলোয়ার দিয়া কোপ মারিলে, তলোয়ার ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। এমন কি, বন্দুকের গুলিও তাহাকে ভেদ করিতে পারে না—তাহাতে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। আমেরিকার কোন কোন কারখানার নর্দ্দামা দিয়া যে জল পড়ে, তাহার উপর কুড়াল মারিয়া দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে কুড়াল বসে না—জলের এমন বেগ!

চলন্ত জিনিষ মাত্রেরই এইরূপ একটা ধাক্কা দিবার ও বাধা দিবার শক্তি আছে।

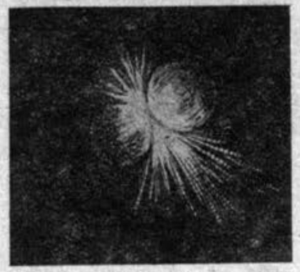
পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে যা-কিছু তেজ দেখি, যে-কোন শক্তির পরিচয় পাই, সমস্তই এই চলার রকমারি মাত্র। বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি শব্দ আসিয়া কানে আঘাত করিল—আকাশে তরঙ্গ ছুটিল, অমনি চোখের মধ্যে আলোর ঝিলিক্ জ্বলিল। কেবল তাহাই নয়, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরের এই ছুটাছুটি বাড়িলেই সব জিনিষ গরম হইয়া উঠে। যখন ঠাণ্ডা হয়, তেজ কমিয়া আসে, তখন বুঝিবে এই পরমাণুর ছুটাছুটি ঢিমাইয়া পড়িতেছে।

যে জিনিষটা ছুটিতে চায়, তাহাকে বাধা দিলে সে গরম হইয়া উঠে। তাহার বাহিরের বেগ বন্ধ হইয়া তখন ভিতরে পরমাণুর বেগকে বাড়াইয়া তোলে। বন্দুকের গুলিটা লোহায় লাগিয়া থামিয়া গেল—হাত দিয়া দেখ, এত গরম যে হাতে ফোস্কা পড়িবে। একটা শক্ত জিনিষের উপর ক্রমাগত হাতুড়ি মার, হাতুড়ির বেগ যতবার বাধা পাইবে ততই দেখিবে হাতুড়িটা গরম হইয়া উঠিতেছে—আর যাহার উপর আঘাত করিতেছে, তাহাকেও গরম করিয়া তুলিতেছে। রেলগাড়ী যখন লোহার রেলের উপর দিয়া যায় তখন চাকার সঙ্গে রেলের ঘষা লাগিয়া, সে ক্রমাগত বাধা পাইতে থাকে। ট্রেণ চলিয়া যাইবার পর যদি রেলের উপর হাত দিয়া দেখ, দেখিবে লোহাগুলি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেণ যখন ষ্টেশনে আসিয়া থামে, তখন তাহার চাকায় হাত দিলে দস্তুর মত গরম বোধ হয়।

কেবল যে কঠিন জিনিষেই বাধা দেয় তাহা নয়, বাতাসের মত হাল্কা জিনিষেরও বাধা দিবার শক্তি আছে। খুব বড় একটা পাখা লইয়া জোরে চালাইতে গেলে বেশ বোঝা যায় যে বাতাসের ঠেলা লাগিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই উল্কা দেখিয়াছ। মাঝে মাঝে আকাশে যে তারার মত জিনিষ গুলি হঠাৎ কোথা হইতে বোঁ করিয়া ছুট্ দিয়া পালায়, সেগুলিই উল্কা। উল্কাগুলি এই পৃথিবীরই মত ভীষণ ভাবে ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। বাহিরের আকাশ তাহাকে বাধা দেয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে অমনি বাতাস তাহাকে বাধা দিতে থাকে। এই বাধাতেই তাহার বেগ কমিয়া যায়, সে গরমে জ্বলিয়া আগুন হয়। সেই আগুনকে ছুটিতে দেখিয়া আমরা বলি, "ঐ উল্কা পড়িল"।

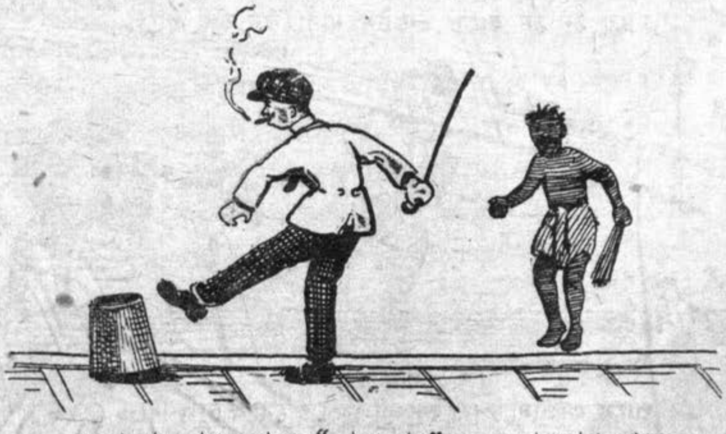
পৃথিবীর তুলনায় উল্কাগুলি নিতান্তই ছোট। তাই তাহাদের ধাক্কায় পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না, উল্কাগুলিই মরিয়া শেষ হয়। কিন্তু দুইটা বড় বড় পৃথিবী যদি এই রকম ছুটাছুটি করিয়া ধাক্কা লাগায় তবে কাণ্ডটা কি রকম হয়! মানুষের কল্পনা তাহার ধারণাই

করিতে পারে না। দুইটার মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে, তখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ বাধা পাইবামাত্র জ্বলিয়া আগুন হইয়া বাহির হয়। সেই আগুন হইতে পাহাড়-প্রমাণ স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে হাজারে হাজারে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দুই পৃথিবীর শেষ চিহ্ন ঘুচিয়া গিয়া, কেবল লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া আগুনের শিখা জ্বলিতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে একেবারেই হয় না তাহা নয়; কিছু দিন আগে যে "নূতন তারা" দেখা গিয়াছিল, তাহাও এইরূপ একটা লুপ্তবেগের আগুনমাত্র। কবে ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কিনারে এই আগুন জ্বলিয়াছিল; তাহারই জ্বলন্ত কিরণ আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে-ছুটিতে এতদিনে আমাদের চোখে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল। সেই যে আলোকের বেগ, তাহার কাছে আর সমস্ত বেগই হার মানিয়া যায়। কামানের গোলা এত যে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায়, তাহার গতিও আলোকের গতির তুলনায় যেন রেলগাড়ীর কাছে শামুকের চলার মত।



তেজিয়ান্!

চলে খচ্‌খচ্ রাগে গজ্‌গজ্ জুতা মচ্‌মচ্ তানে,
ভুরু কট্‌মট্ ছড়ি ফট্‌ফট্ লাথি চট্‌পট্ হানে।



দেখে বাঘ-রাগ লোকে "ভাগ্ ভাগ্" করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফ ঝাঁপ বলে "বাপ্ বাপ্" সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জ্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত ক'রে হুট্‌পাট্ চলে ফুট্‌পাথ্ পরে।



ঝাড়ুবর্দ্দার হারুসর্দ্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ—দেখে ফাল্ দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।
রেগে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তাল্‌ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্ ঠন্ হাড়ে টন্ টন্ মাথা ঝন্ ঝন্ কাঁপে!



পায়ে কাল্‌সিটে! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল্ দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

মজার খেলা

একবার একটা মজার দৌড় খেলা দেখিয়াছিলাম। কতগুলা লোককে বড় বড় ছালার মধ্যে গলা পর্য্যন্ত ভরিয়া মাঠের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—কে আগে যাইতে পারে। কয়েকজন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদ্ভুত ভঙ্গীতে পেঙ্গুইন্ পাখীর মত হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, আর কয়েকজন মাটিতে পড়িয়া একেবারে "কুমড়ো গড়ান" গড়াইতেছে! মাঠশুদ্ধ লোক একেবারে হাসিয়া অস্থির! ফ্রান্সে একটি "মোটা মানুষের সমিতি" আছে; অন্তত সাড়ে তিন মণ ওজন না হইলে তাহাতে ভর্ত্তি হওয়া যায় না। তাহারা একবার মোটা লোকদের জন্য দৌড় খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যাহাদের ওজন পাঁচ সাত মণের কম হইবে না—এমন অনেক লোকে তাহাতে দৌড়িয়াছিল। সে দৌড় আমি দেখি নাই, কিন্তু তাহার যে ফটো দেখিয়াছি, সে অতি চমৎকার—দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না।

বহুকাল আগে একটা বিলাতী পত্রিকায় এই রকম কতগুলি অদ্ভুত মজার খেলার কথা পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা ছিল খাওয়ার পাল্লা। কতগুলি রেকাবি সম্মুখে লইয়া সকলে টেবিলের কাছে বসিয়াছে; 'এক-দুই-তিন' বলিতেই তাহাদের পাতে একেবারে উনান হইতে সাংঘাতিক গরম 'চপ্' ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাঁটা চামচ নাই, খাবারে হাতও লাগাইতে পারিবে না—এখন যে আগে খাইতে পারিবে তাহারই জিৎ! যে লোকটা জিতিয়া ছিল সে প্রথমেই মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চপ্‌টাকে চ্যাপ্টাইয়া জুড়াইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। মাথায় চুল আছে, তাই সহজে গরম লাগে না। আর একটা খেলাতে কোন ফল কিম্বা অন্য কোন খাবার সূতায় বাঁধিয়া ঠিক নাকের সামনেই ঝুলাইয়া রাখা হয়। যে হাত না দিয়া সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া খাওয়া শেষ করিবে তাহার জিৎ। কাজটা শুনিতে বেশ সহজ, কিন্তু কাজে তেমন সহজ নয়। সূতাটা শূন্যে ঝুলিতেছে, মুখ ঠেকাইতে গেলে সেটা আরও দুলিতে থাকে।

একটা গল্প পড়িয়াছিলাম যে এক জায়গায় খেলা হইতেছিল, কে কত উৎকট মুখভঙ্গী করিতে পারে। এক জনের উপরে ভার ছিল, তিনি বিচার করিয়া বলিবেন, কাহার মুখের ভঙ্গী সকলের চাইতে বিশ্রী ও বিদ্‌ঘুটে। খেলার জায়গায় এক বেচারা তামাসা দেখিতেছিল, তাহার মুখখানা বাস্তবিকই কদাকার। বিচারক তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে ইনি 'ফার্ষ্ট্ প্রাইজ্' পাইবার যোগ্য"! সে লোক আশ্চর্য্য

হইয়া বলিল, "আমি ত এ খেলায় যোগ দিই নাই"। বিচারক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাই নাকি ? তা, আপনি কোন চেষ্টা না করিয়াই 'ফার্ষ্ট' হইয়াছেন। আপনি থাকিতে ও প্রাইজ আর কেউ পাইতে পারে না"! লোকটি প্রাইজ পাইয়া খুসী হইবে কি দুঃখিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঘরে বসিয়া অনেকজনে মিলিয়া খেলা যায়, এমন দুএকটা খেলার কথা বলি। কতগুলা খেলা আছে তাহাতে বেশ চট্‌পটে এবং সতর্ক হওয়া দরকার। তার মধ্যে একটা খেলা এই—একজন লোক বেশ ধীরে ধীরে একটি গল্প বলিয়া বা পাঠ করিয়া যাইবে। সেই গল্পটি এমন হওয়া চাই যে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বেখাপ্পা কথা থাকে। অর্থাৎ এক জায়গায় যে রকম বলা হইয়াছে, আর এক জায়গায় তার উল্টা রকম কথা থাকিবে। যেমন, এক ভদ্রলোকের বর্ণনা দেওয়া গেল তার মাথা ভরা টাক, তারপরে আর এক জায়গায় হয়ত বলা হইল যে তিনি আয়নার সামনে বাহার করিয়া টেরী ফিরাইতেছেন। এই রকম গল্পের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

"রবিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্থী। সন্ধ্যার আকাশ দেখিতে দেখিতে মেঘে ঢাকিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। গৃহহীন পিতৃমাতৃহীন যোগেশচন্দ্র আফিসের বেশে বিনা ছাতায় ভিজিতে ভিজিতে নির্জ্জন পথ দিয়া চলিতেছেন—সঙ্গে ট্রামের পয়সাটি পর্য্যন্ত নাই। স্কুল কলেজ হইতে ছুটি পাইয়া ছাত্রগণ কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে—যোগেশচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ভিড় ঠেলিয়া চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, কতক্ষণে পৌঁছিব। একে শীতকাল, তার উপর গায়ে কেবল শত ছিন্ন পাৎলা ফুটবলের সার্ট, যোগেশচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কে যেন ডাকিয়া উঠিল "অন্ধ নাচারকে ভিক্ষে দেও।" যোগেশচন্দ্র দেখিলেন এক হস্তপদহীন ভিখারী কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভিখারীর হস্তে গুঁজিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভিজা জুতা ও ছাতা বারান্দায় রাখিয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পতন শব্দে তাঁহার বাপ মা 'হায় হায়' করিয়া ছুটিয়া আসিলেন"।

ইহার মধ্যে কি কি ভুল আছে বাহির কর ত ? খেলিবার সময়ে: কতগুলা কাগজ পেন্সিল দিয়া সকলকে বসাইয়া দিবে, এবং ধীরে ধীরে দুইবার গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইবে। তারপর দু তিন মিনিট সময় দিবে, তাহার মধ্যে যে সব চাইতে বেশী ভুল

ধরিতে পারিবে, সেই বাহাদুর। অনেকটা এই ধরণেরই আর একটা খেলা আছে, তাহাতে কথা মনে রাখার উপর হারজিত নির্ভর করে। একটা কোন জিনিষের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া তারপর সকলকে বলিতে হয় সমস্ত বর্ণনাটা শুনিয়া আবার মন হইতে লিখিয়া দাও। যেমন, একজন মানুষের কথা বলিলাম,—তাহার বয়স পঁচিশ হইবে চোখে কাল চশমা, মাথার সামনের দিকে টাক, খোঁচা খোঁচা ভুরু ও ঝাঁটার মত গোঁফ, দাড়ি কামান, মোটা বেঁটে চেহারা, হাতে একটি সবুজ ক্যাম্বিসের ব্যাগ্, গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে কালো গরম কোট, তার পকেটে লাল রুমাল, হাতে একটি বাঁশের ছাতা, পায়ে প্রকাণ্ড বুট্ জুতা, কাণে শোনেন কম, চলেন খোঁড়াইয়া—তার উপর গলার আওয়াজখানা যেন ভিজা ঢাকের মত। এখন এইটুকু ধীরে ধীরে দুবার পড়িয়া তারপর বেশ ভাবিয়া লিখ ত—দেখিবে এতটুকু বর্ণনার মধ্যে হয়ত কিছু কিছু ভুল হইয়া যাইবে।

এবারে অন্য রকমের আর একটি খেলার কথা বলি যাহা শুনিতে খুব সহজ শোনায়, কিন্তু কাজে ভারি শক্ত। একখানা আয়নার সামনে একটা কাগজ—আয়নার ছায়া



দেখিয়া কাগজে কিছু আঁকিবার অথবা লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখ। ভারি একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। হাতটা যেন কিছুতেই বাগ্ মানিতে চায় না। অনেক লোককে দেখাইতে হইলে একটা বোর্ডের উপর বেশ বড় করিয়া একটা সহজ V আঁকিয়া, সকলকে বল বোর্ডের দিকে না তাকাইয়া কেবল আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহার উপর দাগ বুলাইতে। বিশেষতঃ যাঁহারা খুব ভাল 'ড্রয়িং' জানেন বলিয়া প্রশংসা পান তাঁহাদের ধরিয়া এই সামান্য কাজে লাগাইয়া বেশ জব্দ করিতে পার।

এবারে আর একটা মজার কথা বলিয়া শেষ করিব। বারো আঙ্গুল লম্বা দুখানি ঝাঁটার কাঠিকে মোচড়াইয়া দুটি ইংরাজি V তৈয়ারি কর। তারপর আর একটি লম্বা কাঠির উপর তাহাদের চড়াইয়া, একখানা সমান ব্লটিং বা



অন্য কোন খস্‌খসে কাগজের উপর এই ছবির মত করিয়া ধরিয়া রাখ। Λ দুটি

যেন্ ভিতরের দিকে হেলিয়া থাকে। হাতটাকে একেবারে আল্‌গা রাখিও যেন কিছুর উপর ভর করিয়া না থাকে। তাহা হইলে দেখিবে আস্তে আস্তে ঝাঁটার কাঠি দুইটা কাছাকাছি আসিতেছে তোমার হাত যতই কাঁপিবে, সে কাঁপুনি যতই সামান্য হোক না কেন, কাঠিটা ততই কাগজের ঘষায় ঘষায় ভিতর দিকে সরিতে থাকিবে।

গান

(স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত)

বিভাস—কাওয়ালি

১। সা গা গা গা | পা পা গা রা | গা পা গা পা | ধা -া পা -া I
রাৎ পো হা ল   উ ঠ স বে;   আঁ ধার্ চ লে   গে - ল -;

ধা ধা ধা ধা | না ধা পা গা | পা না ধা পা | গা রা সা -া II
ফু লের্ গ ন্ধ   পা খীর্ গা ন্   ল য়ে বা তাস্   এ - ল -।

২। সা ধ্া সা রা | গা গমা গা রা | গা ধা ধা -া | পা গা রা -া I
রা ঙা মে ঘের্   চা দর্ যে ন   আ কা শে র   গা - - য়্;

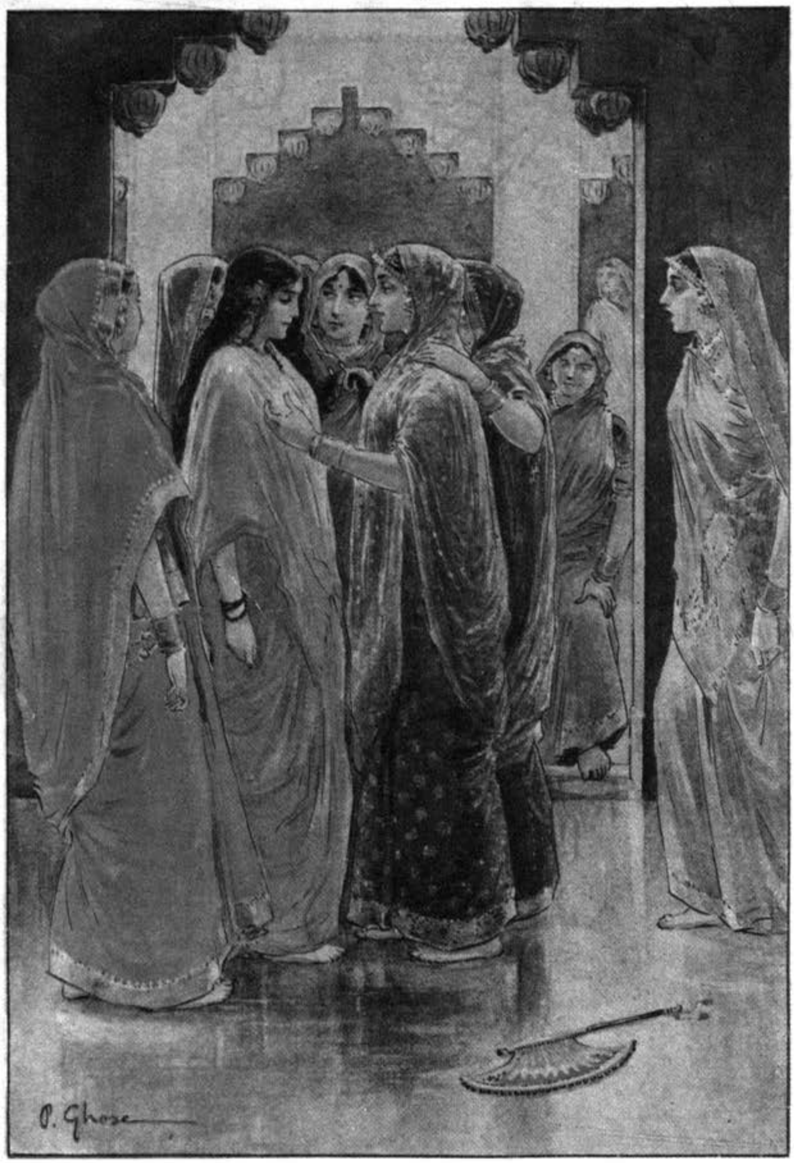
সা সা রা গা | ধা ধধা প প | গা গরা গা মা | গা রা সা -া II
রা ঙা সূ র্য্যের   টি প্প রে ছে   দে খ্বি য দি   আ - - য়্।

৩। পা গা পা ধা | না নর্সা না ধা | না র্সা না ধা | পা ধা -া -া I
চ ড়াই ব লে   কি চির্ মি চির্   কা ক্ ব লে   কা - - -;

না নর্সা না ধা | পা ধা ধা ধা | পা না ধা পা | গা রা সা -া II
কো কিল্ ব লে   কে মন্ মি ষ্টি,   উ ঠে শু ন   না - - -;—

৪। গা -া পা -া | গা -া পা -া | গা -া ধা -া I পা -া ধা -া I
কু - হু -   কু - হু -   কু - হু -   কু - হু -

র্সা র্সা ধা ধা | র্সা র্সা ধা ধা | র্সা র্সা ধা ধা | গা রা সা -া II
কু হু কু হু   কু হু কু হু   কু হু কু হু   কু - হু -।



পিতৃগৃহে সতীর পুনরাগমন

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

চিত্রের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু ।



ষষ্ঠ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ অষ্টম সংখ্যা

"দোহা"

সুন্দর সে জন,
বিদ্যা ও বিনয় যার অঙ্গের ভূষণ।
সে জন সুধীর,
বিপদে সম্পদে যার মতি রহে স্থির।
সেই ত সরল,
সত্যের আলোকে যা'র হৃদয় উজ্জ্বল।
সেই বটে বীর,
ষড়রিপু যা'র ভয়ে সতত অস্থির।

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

বেহদ্দ বোকা

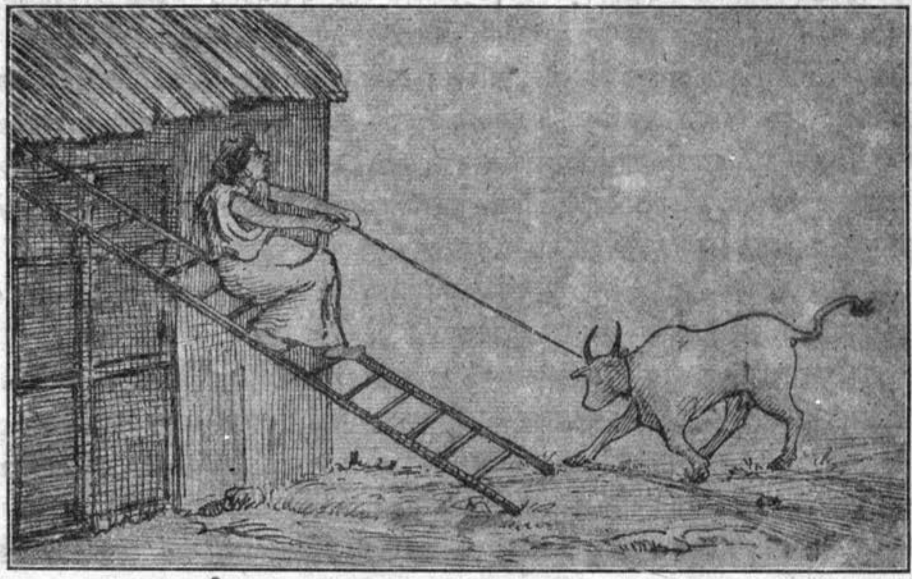
বিদেশী এক গৃহস্থ, তার স্ত্রী, আর মেয়ে। মেয়েটি বড় হয়েছে, একজনের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হ'য়েছে। লোকটি প্রায়ই গৃহস্থের বাড়ী আসে, গল্প সল্প করে, রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে বাড়ী যায়। গৃহস্থের বাড়ীর তলায় মাটির নীচে ভাঁড়ার ঘর, তাতে প্রকাণ্ড পিপের মধ্যে মদ থাকে। জলের কল খুলে দিলেই যেমন জল পড়ে, তেমনি সেই বড় পিপেতেও কল থাকে, তাই খুলে মদ নিয়ে আবার কল বন্ধ করে দিতে হয়।

একদিন গৃহস্থের বাড়ী খুব ভোজ হ'য়েছে। ভোজের পর গৃহস্থের মেয়ে গিয়েছে মদ আনতে। সে মদের জন্য ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে কল খুলে হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখে—কড়িকাঠে ঠিক তার মাথার উপরে একটা কুড়ুল ঝুল্‌ছে। কুড়ুলটা অনেক দিন থেকেই ওখানে দড়িতে ঝুল্‌ছিল, এতদিন তার চোখে পড়েনি। হঠাৎ সেটা দেখেই মেয়ে ভাবল—"তাইত! আমার বিয়ের পর যদি আমার ছেলে পিলে হয়, আর সেই ছেলে ক্রমে বড় হয়ে যদি মদ নিতে ভাঁড়ার ঘরে আসে, আর যদি দড়ি ছিঁড়ে কুড়ুলটা তার মাথার উপর পড়ে যায়! হায় হায়! তবেত সে মরে যাবে!" এই ভেবেই সেই মেয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌ল। এদিকে তার দেরী দেখে গৃহস্থের স্ত্রী ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত! মদের পাত্র আর আলো মাটিতে রেখে মেয়ে বসে কাঁদছে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—"কিরে, তোর হলো কি, কাঁদ্‌ছিস্ কেন?" তখন কড়িকাঠে কুড়ুলটা দেখিয়ে মেয়ে বল্‌ল—"আমার বিয়ের পর তোমার নাতি হলে কোন দিন যদি সে মদ নিতে আসে আর কুড়ুলটা তার মাথায় পড়ে, তবেইত সে মরে যাবে! তাই ভেবে আমি কাঁদ্‌ছি।" একথা শুনেই 'ওমা তাইত! কি হবে গো!' বলেই মেয়ের পাশে বসে বসে মাও বিষম কান্না জুড়ে দিল।

খানিক বাদে গৃহস্থ এসে যখন সব ব্যাপার জান্‌তে পারল, তখন সেও স্ত্রী আর মেয়ের পাশে বসে কাঁদতে লাগ্‌ল! এদিকে বসে বসে হয়রান হয়ে, গৃহস্থের যে জামাই হবে সেই লোকটিও ভাঁড়ার ঘরে গেল। গিয়ে দেখে—স্বামী, স্ত্রী আর মেয়েতে কাঁদ্‌ছে আর খোলা কল দিয়ে মাটিতে মদ পড়ে পিপে প্রায় খালি হ'য়ে গেছে! তারপর কান্নার কারণ শুনে হাসতে হাসতে তার পেট ফাটবার জোগাড়! যাহোক, তাড়াতাড়ি পিপের কল বন্ধ করে দিয়ে, একটানে দড়ি ছিঁড়ে কুড়ুলটাকে ফেলে দিয়ে সে গৃহস্থকে বল্‌ল—"অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু আপনাদের তিন জনের মত মূর্খ কোথাও

দেখিনি। যাহোক্, এখন আবার দেশ ঘুরে বেড়াতে চল্লাম! যদি আপনাদের চেয়েও বোকা তিন জন লোক দেখ্তে পাই তবে ফিরে এসে আপনার মেয়েকে বিয়ে করব।"

এর পর ভাবী বর অনেক জায়গা ঘুরে এক বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত! বুড়ীর কুঁড়ের চালে একরাশ সুন্দর সবুজ ঘাস গজিয়েছিল। সে দেখ্ল—বুড়ী চালে মৈ লাগিয়েছে আর সেই মৈ দিয়ে চালে উঠবার জন্য তার গাইটার গলার দড়ি ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে কিন্তু গাই বেচারি কিছুতেই মৈ বেয়ে উঠতে রাজি হচ্ছে না! গাইটাকে



অমন ভাবে টানাটানি করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী বল্ল—"দেখছ না, চালের উপর কেমন সুন্দর ঘাস গজিয়েছে? এই ঘাস খাবার জন্য গাইটাকে চালে তুলবার চেষ্টা করছি।" বর বল্ল—"কেন, ঘাসগুলো কেটে এনে গাইকে খেতে দাও না?" বুড়ী—"তার চেয়ে গাইটা চালে উঠে ঘাস খেলেই ত সোজা হয়!" একথা শুনে বর বুঝতে পারল—বুড়ী একের নম্বরের বোকা!

তারপর আবার চল্তে চল্তে অনেক দূর গিয়ে সন্ধ্যার সময় সে এক সরাইখানায় উপস্থিত। সেদিন সরাইয়ে বড্ড ভিড় হয়েছিল, প্রত্যেক ঘরে দুটি করে খাট পাতা

হয়েছে, তা নইলে জায়গায় কুলায় না। রাত্রে বর দেখ্ল, তার ঘরের সঙ্গীটি বেশ আমুদে লোক। দুজনে অনেক রাত অবধি গল্প গুজব করে তারপর আরামে ঘুমাল। ভোরবেলা তখনও বর বিছানা থেকে উঠেনি, সে শুয়ে শুয়ে দেখ্ল—সঙ্গীটি ঘরের এক কোণে তার পায়জামা ঝুলিয়ে, দৌড়ে লাফ দিয়ে তার মধ্যে পা ঢুকাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠ্ছে না। এই ব্যাপার দেখে বর ভদ্রলোকটিত একেবারে অবাক্! সে বুঝতে পারল না সঙ্গীটি কেন এমন অদ্ভুত কাজ করেছে। তারপর শুন্ল খানিক লাফালাফি করে, ঘেমে ঝোল হয়ে, মুখ মুছ্তে মুছ্তে সে লোকটা বল্ছে—"বাবা! এই পায়জামার মত এমন বেখাপ্পা পোষাক আর নাই! কোন্ হতভাগা লোক না জানি এই পোষাকের সৃষ্টি করেছিল! প্রতিদিন সকাল বেলা এই বিট্‌কেল পোষাক পরতে আমার একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়—ঘেমে কাহিল হয়ে পড়ি, নাকালের একশেষ হই"। একথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বরের পেটে খিল ধ'রে গেল—সে উঠে পায়জামার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিল যে পোষাক পরার জন্য ছুটোছুটি ক'রে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়বার দরকার হয় না—বেশ আরামে বসে বসেই পোষাক পরা যায়। তখন লোকটা বল্ল "তাইত! এ ত বেশ উপায় বল্লেন! আপনার খুব বুদ্ধি যাহোক"! তখন বর ভাবল—এ ব্যক্তি দু নম্বরের বোকা!

তারপর আবার অনেক ঘুরে ফিরে সে এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত! সেখানে দেখ্ল—একটা পুকুরের ধারে চার পাঁচশ লোক—কারো হাতে ঝাঁটা কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে কাস্তে কোদাল—সকলেই যেন জল থেকে কি তুলবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কি? তখন জিজ্ঞাসা করবামাত্র সকলে চেঁচামেচি করে বল্‌তে লাগ্‌ল—"মশায়! ভয়ানক কাণ্ড! আকাশ থেকে আমাদের চাঁদটি কখন জলে পড়ে গিয়েছে, কত চেষ্টা করেও তুলতে পারছি না।" একথা শুনে বরের ত চক্ষু স্থির! সে বল্‌ল—"হ্যাঁরে, তোদের গ্রাম শুদ্ধ সবাই কি হাঁদা বোকার দল রে? জলে যে ওটা চাঁদের ছায়া তাও কি তোদের হুঁস্ নেই? ঐ দেখ, আকাশের চাঁদ আকাশেই আছে।"

এরপর আর দেশ ঘুরবার দরকার কি? সুতরাং বর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে সেই গৃহস্থকে বল্‌ল, "না মশাই, আমার ভুল হ'য়েছিল'—আপনারা ত তেমন কিছু বোকা নন্। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আর আমার কোন আপত্তি নেই"।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সয়তানীর সাজা

পান্তু-ভূতের স্বভাবটা বড় ভাল। সে অনেক যাদু জানে, কিন্তু কখনও কারো অনিষ্ট করে না। এক হাত লম্বা তার শরীর, আর মেজাজটা ভারি ঠাণ্ডা। মিচ্‌কোপটাস্ কুম্‌ড়োপটাসের ছোট ভাই, মিচ্‌কে সয়তানের একশেষ। রাতদিনই কেবল সে একে খোঁচা দিচ্ছে, ওকে খোঁচা দিচ্ছে। আধ-হাত লম্বা তার চেহারা, ভুঁড়ো পেট, সরু ঠ্যাং।

একদিন পান্তভূত রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌তে পেল, একটা ছোট ঝোপের নীচে মিচ্‌কোপটাস্ লুকিয়ে আছে, তার হাতে একটা রামগরুড়ের পালক। সে পালক বড় মজার জিনিষ ;—বাতাসের মত হাল্কা, কিন্তু যে জিনিষের নীচে রাখা যায়, সে জিনিষ যতই ভারী হোক না কেন, বাতাসে তাকে উল্‌টে ফেলে দেবেই।



মিচ্‌কোপটাস্ সেই পালকটা রাস্তার মাঝখানে রেখে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে রইল। খানিক বাদে আলুওয়ালী বুড়ী তার ঠেলা-গাড়ী ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে সেখানে এসে হাজির হ'লো। বেচারা তো কিছুই জানে না ;—একেবারে রামগরুড়ের পালকের উপর দিয়েই গাড়ী চালিয়ে দিয়েছে। অম্‌নি আর কোথায় যাবে, ধর্ ধর্ কর্‌তে না কর্‌তেই গাড়ী বোঁ ক'রে ডিগ্‌বাজা খেয়ে উল্‌টে গেল ; আর আলুর যে কি দশা হ'লো তা' আর কি বল্‌ব ! চারিদিকে খালি আলুই গড়াচ্ছে !

বুড়ী বেচারা ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ; বেচারার হাটে যাবার তাড়া ছিল, কিন্তু আলুগুলো না তুলে সে যাবেই

বা কি ক'রে, আর আলু তুলতে তুলতেও তার হাটে যাবার অনেক দেরি হ'য়ে যাবে। সে কাঁদতে কাঁদতে দু'হাতে আলু তুলতে লাগল। এদিকে পান্তভূত বেচারা বুড়ীর কষ্ট দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে সাহায্য করতে লাগল। দেখতে দেখতে সব আলু তোলা হ'য়ে গেল, আর বুড়ীও হাটের দিকে চ'লে গেল।

মিচ্‌কোপটাস্ তো আলুর গাড়ী উল্টাতে দেখে হেসেই কুটপাট। হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধ'রে গেল; মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। তারপর সে ছুটে পালাল।

পান্তভূতের মনে ভারি রাগ হলো। সে মনে মনে বলল, "মিচ্‌কোপটাসের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে! পরকে কষ্ট দিয়ে সে মনে করে ভারি তামাসা করল! দাঁড়াও না! ওর সয়তানী ভেঙে দিচ্ছি!" এই ব'লে সে একটা যাদুর মন্তর তৈরী করল। তার মধ্যে ছিল একটা আলু, এক ডেলা মাটি, তোষকের খানিকটা তুলো, একটা মুক্তো, আর একটা পুলি-পিঠে। সেই মন্তর ধোঁয়ার মধ্যে পুরে সে চুপি চুপি মিচ্‌কোপটাসের বাড়ীতে ফেলে এল।

মিচ্‌কোপটাস্ সারাদিন তার দুষ্টুমির কথা অন্য ভূতেদের কাছে ব'লে বেড়িয়েছে। অন্যেরা হাসুক আর নাই হাসুক, সে তার গল্প ব'লেছে আর হেসে গড়াগড়ি দিয়েছে। সব ভূতেদের কাছেই তার গল্প বলা হয়েছে—কেবল পান্তভূতের কাছে বলা হয় নি, কারণ সে তো সেখানে উপস্থিতই ছিল। বিকালবেলা মিচ্‌কোপটাস্ মুচ্‌কি হাসি হাসতে হাসতে তার বাড়ীতে ফিরল। তার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই সে তখনই একটা মস্ত বড় পুলিপিঠে বানাতে আরম্ভ করল। পুলি-পিঠে খেতে সে বড়ই ভালবাসত। এমন সময় হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে যেতে লাগল। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, কিন্তু অমাবস্যার রাত্রের মত ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়েছিল। মিচ্‌কোপটাস্ তাড়াতাড়ি পুলিপিঠেটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে, বাতি জেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে কি তার দরজার সামনেই একটা প্রকাণ্ড আলুর গাছ হয়েছে; সেটা তার বাড়ীর চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। তখনি সে একটা কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে দিল। ওঃ, সে কি বিষম গাছ! খুঁড়েই যাচ্ছে খুঁড়েই যাচ্ছে, তবু তার শিকড়ই মেলে না। শেষটায় তার পিঠে ব্যথা হয়ে গেল, গা হাত ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, পা ধরে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল! তখন সে দেখতে পেল যে গাছটা শুখিয়ে গেছে, আর একটা প্রকাণ্ড আলু সেখানে রয়েছে। সেই আলুটা তখনই তাকে বলল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী

থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি, তাই আমি তোর বাড়ীর সামনে মাটিতে ঢুকে মস্ত গাছ হ'য়ে গিয়েছিলাম। এখনই আমাকে আলুবুড়ীর কাছে নিয়ে যা; না হলে আমি আবার আরো বড় গাছ হ'য়ে তোর বাড়ীকে ঢেকে ফেল্‌ব।"

মিচ্‌কোপটাস্ বল্‌ল, "দোহাই আলুদাদা! আজ আর আমি পারছি না; কাল সকালে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বুড়ীর কাছে নিয়ে যাব।" এই কথা ব'লে সে আলুটাকে ঘরে তুলে রেখে পুলি-পিঠে খেতে গেল। তার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, আর পুলি-পিঠের গন্ধও বেরিয়েছিল চমৎকার; তাই খাবারের লোভে তার জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। হাঁড়ি খুলেই সে পুলিপিঠে বের করতে গেল, কিন্তু বেরুল একটা মস্ত আলু! এবার বেচারা আর সহ্য করতে পার্‌ল না—সে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্‌ল। আলুর কিন্তু তাতে কিছু দয়া হ'লো না; সে বল্‌ল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি, তাই আমি তোর পুলিপিঠের মধ্যে ঢুকেছি। এখনই আমাকে বুড়ীর কাছে দিয়ে আয়; নইলে রোজ আমি তোর পুলি-পিঠের মধ্যে ঢুকে থাক্‌ব।" মিচ্‌কোপটাস্ বল্‌ল, "দোহাই আলুদাদা! আজকে আমাকে মাপ কর; কাল সকালে তোমাকে নিশ্চয়ই আলুবুড়ীর কাছে নিয়ে যাব।" এই বলে সে আলুটাকে তুলে রেখে দিল।

খাওয়া তো তার আর সে দিন হ'লই না। বেচারা আর কি করে? ঢক্ ঢক্ ক'রে দু'তিন ঘটি জল খেয়ে পেট ভরিয়ে বিছানায় শুতে গেল। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি! তোষকের মধ্যে কি জিনিষ ঢুকেছে কে জানে? যেম্নি শক্ত সেটা, তেম্নি উঁচু। বেচারা একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ করতে লাগ্‌ল; কিন্তু ঘুম আর হয়ই না। শেষটায় তার গায়ে ব্যথা হ'য়ে গেল। শেষ রাত্রে সে বিছানা থেকে উঠে, তোষক কেটে ফেল্‌ল আর তার মধ্যে থেকে বের কর্‌ল—একটা মস্ত আলু! তখন তার যা কান্না!

আলুর কিন্তু একটুও দয়া হ'ল না। সে বল্‌ল, "আলুবুড়ীর ঠেলাগাড়ী থেকে তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিলি, তাই আমি তোর এই তোষকের মধ্যে এসে ঢুকেছি। এখনই যদি তুই আমাকে বুড়ীর কাছে দিয়ে না আসিস্ তবে আমি রোজ তোর তোষকের মধ্যে ঢুকে ব'সে থাক্‌ব।"

মিচ্‌কোপটাস কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "দোহাই আলুদাদা! আজ আমাকে মাপ কর ভাই। রাত্রে খাওয়া হয় নি, ঘুম হয় নি, আমি আর চল্‌তেই পারছি না। কাল

সকালে নিশ্চয়ই তোমাকে আলুবুড়ীর কাছে পৌঁছে দেবো।" এই বলে সে আলুটা তুলে রেখে ঘুমোতে গেল।

কয়েক ঘণ্টা খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে, যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেশ রোদ উঠেছে। বিছানা থেকে উঠেই, কিছু খেয়ে নিয়ে, সে ভাব্‌ল, "এই বেলা আলুগুলোকে একটা থলেয় ক'রে বুড়ীর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

থলে নামাতে গিয়ে দেখে, তার মধ্যে মুক্তো ভরা রয়েছে। হেঁই-হো রাক্ষস তাকে ব'লেছিল, "আমার হাতের এক-মুঠো ভর্‌তি মুক্তো যদি আমায় দিতে পারিস্‌ তবে আমার ছোট মেয়ে ছুঁচোমুখীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো।" তাই সে অনেকদিন ধ'রে মুক্তো জমিয়ে রাখ্‌ছিল। তখন সে মনে মনে ভাব্‌ল "আগে হেঁই-হোকে মুক্তো দিয়ে আসা যাক্‌—সেটাই বেশী দরকারী কাজ। তারপর, থলে খালি হ'লে, আলুগুলো বুড়ীকে দিয়ে আসা যাবে এখন।" একথা ব'লেই সে থলে কাঁধে নিয়ে ছুট্টে একেবারে হেঁই-হোর বাড়ী গিয়ে হাজির! হেঁই-হোকে দেখেই সে বল্‌ল, "দেখি তোমার মুঠো! এই থলের মধ্যে এত মুক্তো আছে যে, দু'মুঠো ভ'রে যেতে পারে!"

হেঁই-হো হাত পেতে দিল; মিচ্‌কোপটাসও থ'লের সব জিনিষ তার হাতে ঢেলে দিল। কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ! থলের মধ্যে যে কেবলই একটা আলু ছিল! সেটাই ধপাৎ ক'রে রাক্ষসের হা'তে পড়্‌ল।

রাগে দু'চোখ লাল ক'রে, দুহাতে ঘুঁসি বাগিয়ে, হেঁই-হো বল্‌ল, "ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাস্‌ নি! বেরো এখনি এখান থেকে! নইলে ঘুঁসির চোটে তোকে আলু-ভাতে বানিয়ে দেবো!"

মিচ্‌কোপটাস্‌ তখন আর কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছে না; তার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে, মাথা ঘুর্‌ছে, কাণ ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে! চারিদিকে সে কেবল আলু, আলু, আলু দেখ্‌তে পাচ্ছে! এই অবস্থাতেই সে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী এসে, এক দৌড়ে বুড়ীর কাছে আলু নিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "দোহাই তোমার! আর আমি কখনও কারো সঙ্গে কোন দুষ্টুমি কর্‌ব না!"

শ্রীসুবিনয় রায়।

গয়াসুর

(মহাভারত)

ত্রিপুর দৈত্যের কথা তোমরা "সন্দেশ" কাগজে পড়িয়াছ। এই দুষ্ট দৈত্যকে মহাদেব বধ করিয়া 'ত্রিপুরারি' নাম পাইয়াছেন। এই ত্রিপুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে একদিন নারদ মুনি আসিয়া দৈত্যরাজকে বলিলেন—"মহাদেব তোমাকে বধ করিতে আসিতেছেন; তোমার বংশে বাতি দিবার লোকও তিনি জীবিত রাখিবেন না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার রাণী প্রভাবতীর শীঘ্রই একটি পুত্র জন্মিবে এবং সে ভবিষ্যতে অতি অদ্ভুত কাজ করিবে। এই বেলা রাণীকে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দাও—নতুবা তুমি নির্ব্বংশ হইবে।"

মহর্ষি নারদের উপদেশে দৈত্যরাজ অবিলম্বে রাণী প্রভাবতীকে তাঁহার পিতা শুকদৈত্যের পুরীতে পাঠাইয়া দিল। তারপরেই মহাদেব দারুণ যুদ্ধে ত্রিপুরকে বিনষ্ট করেন। এদিকে শুকদৈত্যের বাড়ীতে যথাসময়ে রাণী প্রভাবতীর পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম হইল 'গয়াসুর'। গয়াসুর বড় হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিল। একদিন সে গুরুর বাড়ী হইতে মুখখানি ভারি বিমর্ষ করিয়া মায়ের নিকট আসিয়া বলিল—"মা! গুরুর কাছে যখন পড়িতে যাই তখন অন্য ছেলেরা আমাকে বড় জ্বালাতন করে। আমাকে মিছামিছি মারে; আমি কিছু বলিলে বলে, —'তোর ত আর বাবা নাই যে আমাদিগকে সাজা দিবেন!'—হাঁ মা—আমার বাবা নাই কেন?"

পুত্রের কথায় রাণী প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা! ধন্দ বংশের বিখ্যাত দৈত্যরাজ 'ত্রিপুর' ছিলেন তোমার পিতা। তিনি দেবতাগণকে জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে পৃথিবী কাঁপিত। তুমি যখন আমার গর্ভে ছিলে তখন একদিন মহর্ষি নারদ আসিয়া তোমার পিতাকে বলিলেন—"দেবগণের অনুরোধে মহাদেব তোমাকে বধ করিতে আসিতেছেন। সে জন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছি। তোমার রাণীর শীঘ্রই মহাবীর এক পুত্র জন্মিবে। এই বেলা রাণীকে তাহার পিতার নিকট রাখিয়া আইস তারপর শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে'।"

"তোমার জন্মের পূর্ব্বেই তোমার পিতা নারদের উপদেশে আমাকে এখানে পাঠাইয়া মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যান। সেই দারুণ যুদ্ধে তোমার তিনি এবং অসুরকুল

ধ্বংস হইয়াছে। এখন ত্রিপুরবংশে একমাত্র তুমিই জীবিত আছ।” এই বলিয়া রাণী প্রভাবতী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মায়ের কথা শুনিয়া গয়াসুরের ক্রোধের সীমা রহিল না। সে তখনই গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া নিজের পরিচয় দিল। শুক্রাচার্য্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম যত্নে তাহাকে অস্ত্র শস্ত্র এবং পৃথিবীর অন্য সব বিদ্যা শিখাইলেন। এইরূপে অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলে পর গয়াসুর গুরুর পদধূলি লইয়া মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া ত্রিভুবনের সমস্ত অসুর আসিয়া গয়াসুরের সঙ্গে মিলিল। তখন বিশাল দৈত্যসেনা লইয়া গয়াসুর সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। যেখানে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে জয় করিতে তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। তারপর মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হইল—মহাদেবের অস্ত্রেও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। এইরূপে গয়াসুর ত্রিভুবনে একছত্র রাজা হইল, দেবতারা মনের দুঃখে উদাসীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুকাল এই ভাবে কাটিল। তারপর একদিন দেবতারা সকলে পরামর্শ করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেলেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। পূজায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু দেখা দিলে পর, দেবতারা বলিলেন—“প্রভু! দুষ্ট গয়াসুর আমাদিগকে রাজ্যছাড়া করিয়াছে, আমরা নিরাশ্রয়ের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছি—আপনি ইহার উপায় করুন।” বিষ্ণু বলিলেন—“কোন চিন্তা নাই। তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি গয়াসুরকে শাসন করিতেছি।”

এইরূপে দেবতাগণকে ভরসা দিয়া নারায়ণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং গয়াসুরের নিকটে গিয়া যুদ্ধ চাহিলেন। বিষ্ণুর ডাক শুনিয়া ক্রুদ্ধ অসুর সাজিয়া বাহির হইল এবং বিষ্ণুকে বলিল—“আমি ত্রিপুরের পুত্র। দেবতাগণের সঙ্গে বিবাদ করিয়া পিতার মৃত্যু হইয়াছে; সেজন্য পিতার শত্রু দেবতাগণকে পাইলে আমি বধ করি। তুমি নাকি সকল দেবতার উপরে বড় দেবতা? আজ আমার সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ কর, দেখি তোমার কতদূর ক্ষমতা!” এই বলিয়াই গয়াসুর বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল, বিষ্ণুও হাসিতে হাসিতে অস্ত্র ছাড়িলেন। সে যুদ্ধের তুলনা হয় না। ক্রমাগত একশত বৎসর দুই জনের যুদ্ধ হইল। তবু কেহ কাহাকেও নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন দৈত্য নারায়ণকে ডাকিয়া বলিল—“তোমার আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন আমার নিকটে বর চাহিয়া লও।”

গয়াসুরের কথায় বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—"আমাকে তুমি বর দিবে! আচ্ছা এই বর দাও যে এখন হইতে তুমি দেব আর মানবকে হিংসা করিবে না। আর পাষাণ শরীর হইয়া তুমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে চিরকাল বিশ্রাম কর।"

গয়াসুর নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিল। বিষ্ণু যে বর চাহিলেন তাহাই সে দিল। বিষ্ণুও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দৈত্য পুত্র! তুমি আমাকে বর দিয়াছ, তবে এখন আমার নিকটে মুক্তির বর চাহিয়া লও। তোমার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে অক্ষয় হইয়া থাকুক।" তখন দৈত্যরাজ বিষ্ণুর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"হে প্রভু! আমাকে দয়া করিয়া এই বর দাও যে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হউক, তোমার আদেশে আমি পাষাণ হইয়া আমি এখানে থাকি। এই ক্ষেত্র আমার নামে গয়াক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হউক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগতের সমস্ত লোক এই ক্ষেত্রে পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিলে তাহাদের পিতৃগণ যেন সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া অমর লোকে বাস করে। এই ক্ষেত্রে পিণ্ডদানে যদি কাহারও মুক্তি না হয় তবে তখনই উঠিয়া আমি পৃথিবী ধ্বংস করিব।" নারায়ণ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই হইতে নাকি গয়াসুর পাষাণ হইয়া চিরকাল গয়াক্ষেত্রে রহিয়াছে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

দারজিলিঙ্গের পথে।

বিকালে ৪ টার সময় শিয়ালদহ হইতে দারজিলিঙ্গের গাড়ী ছাড়ে। ৮৷৷০ টার সময় দামুকদিয়াঘাটে রেল হইতে নামিয়া ষ্টীমারে পদ্মা পার হইতে হয়। তারপর আবার রেল। এই রেল সমস্ত রাত্রি চলিয়া ভোর বেলা শিলিগুড়ি পৌঁছায়। সেখান হইতে আবার আর এক রকম খুব ছোট রেলগাড়ীতে চড়িয়া বেলা ১৷৷০ টার সময় দারজিলিঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়।*

এবারে আমি দারজিলিং আসিবার সময় একটি ভিন্ন তেমন বড় ঘটনা ঘটে নাই। সে ঘটনা হচ্ছে এই যে, জানালার ভিতর দিয়া হাওয়া ঢুকিয়া আমার সেই সুন্দর টুপিটা

*ইহা ১৫ বৎসর আগেকার কথা।

উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। টুপিটাকে আমি সেই জাল দেওয়া 'ইয়ে'টার উপর রাখিয়া দিয়া যারপর নাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইহার মধ্যে কোথা হইতে এক জানালার ভিতর দিয়া হাওয়া ঢুকিয়া, নিবি ত নে আমার টুপিটাকেই লইয়া, আর এক জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানালায় আমার একজন অতিশয় প্রিয় বন্ধু দাঁড়াইয়া অন্ধকার রাত্রির শোভা দেখিতে ছিলেন। আমি কোনরূপে অপ্রতিভ হইলে আমার সেই বন্ধুটির আর আনন্দের সীমা থাকে না। টুপিটা বাহির হইয়া যাইবার সময় বন্ধুর গালে এক চড় মারিয়া আমার শেষ উপকার করিয়া গিয়াছে!

শিলিগুড়ি হইতে দারজিলিং প্রায় ৫০ মাইল। এই পথটুকু যাইতেই এই রেলের ৬৷৷০ ঘণ্টার কম সময়ে কুলায় না। প্রথমে খানিকটা মাঠের উপর দিয়া যাইতে হয়। 'শুক্‌না' ষ্টেশন ছাড়াইয়া খানিক দূর গেলেই গাড়ী খুব ঘন বনের ভিতর প্রবেশ করে। এই বনের নাম তরাই। তরাই যে কোন একটা বিশেষ বনের নাম তাহা নয়। হিমালয় পর্ব্বতের গোড়ায় সর্ব্বত্রই এইরূপ বন দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহার সবগুলিকেই তরাই বলে। এই সকল স্থানের জল ও হাওয়া বড়ই অস্বাস্থ্যকর। সমস্ত পাহাড়ের আবর্জ্জনা বৃষ্টিতে ধুইয়া এই তরাইএর ভিতরে আনিয়া ফেলে, এই জন্যই এই স্থানের জল হাওয়া এত খারাপ। লোকে বলে যে তরাইএর ভিতর দিয়া শুধু চলিয়া আসাতেই অনেক সময়ে জ্বর হইতে পারে। এ সকল বনে বড় বড় জানোয়ারেরও অভাব নাই। বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার সবই আছে। একবার একদল হাতী রেল আটকাইয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। হাতীগুলি রেলের লাইনের উপরেই দাঁড়াইয়াছিল; রেল আসিতে দেখিয়া, তাহাদের অনেকগুলি ভয়ে পলাইয়া গেল। কিন্তু একটা দাঁতাল হাতী কিছুতেই যাইতে চাহিল না। শেষটা বেগতিক দেখিয়া গাড়ীর ড্রাইভার হাতীর দিকে খুব জোরে গাড়ী চালাইয়া দিলে পর হাতীটা ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইল।

দারজিলিং যাইবার জন্য রেল অতি অল্পদিন যাবৎই হইয়াছে। প্রথমে ওখানে যাইবার কোনরূপ পথই ছিল না, এমন কি পাহাড়ের উপরে যে এরূপ সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, নীচেকার লোকে তাহা জানিতই না। পাহাড়ের নীচের লোকেরা তরাইএর জল খাইয়া খালি জ্বর, প্লীহা, লিভারে ভুগিত, আর পাহাড়ী লোকগুলিকে এত সুস্থ ও সবল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। বনের ভিতরে জানোয়ার চলিবার যে সামান্য পথ থাকে, তাহার ভিতর দিয়া পাহাড়ী লোকেরা নামিয়া আসিত, আর নীচের লোকদের বলিত যে, পাহাড়ের উপরের জায়গা বড় চমৎকার।

পাহাড়ের নীচেই গোরা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। শুনিয়াছি সেইখানকার একজন সাহেব নাকি প্রথমে পাহাড়ী মুটের ঝাঁকায় চড়িয়া দারজিলিং দেখিতে যান। এইরূপ করিয়া প্রথমে সাহেবরা দারজিলিঙ্গের কথা জানিতে পারিলেন। ক্রমে এখন সেখানে মস্ত সহর হইয়াছে, আর তথায় যাইবার জন্য সুন্দর রাস্তা হইয়াছে, এখন আর জানোয়ার চলিবার পথ দিয়া সেখানে যাইবার দরকার হয় না। কিন্তু পাহাড় কাটিয়া প্রথমে একটি ভাল রাস্তা প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা (শুনিয়াছি প্রতি মাইলে নাকি ৬০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ এখনকার দরে প্রায় ৯০০০০ হাজার টাকা) লাগিয়াছিল। ইহার অনেকদিন পরে এই পথের উপরে লাইন বসাইয়া দারজিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এখন রেলে চড়িয়া পরম সুখে দারজিলিঙ্গে যাতায়াত করিতেছি। এই রেল প্রস্তুত করিতে কতখানি বুদ্ধি খরচ হইয়াছিল, তাহা আর আমাদের ভাবিয়া দেখিবার দরকার হয় না।

দার্জিলিঙ্গের রেলের মত সুন্দর রেল পৃথিবীতে অল্পই আছে। সাধারণ সুবিধা অসুবিধার হিসাবে বলিতে গেলে ইহার প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। আমাদের খোকাত এই রেল দেখিয়াই চটিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক ইহার গাড়ীগুলি এত ছোট ছোট, যে কলিকাতার একটা বাস্ গাড়ীতেও বোধ হয় ইহার চেয়ে বেশী বসিবার জায়গা আছে। অন্য কোন স্থানে যদি এরূপ গাড়ী চড়িতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিতান্ত বিশ্রী লাগে, আর বোধ হয় দশ মিনিটের বেশী সেই গাড়ীর ভিতরে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু দারজিলিঙ্গের পথে এই ছোট গাড়ীতেই লোকে খাঁচার ভিতরে মুরগী থাকিবার মত প্রায় সাত ঘণ্টা বন্ধ হইয়া থাকে। তাহাদের নাকে ধোঁয়া ঢোকে, চোখে মুখে চুলে কাপড়ে কয়লার গুঁড়া পড়িয়া দুর্দ্দশার একশেষ হয়, একটু হাত পা ছড়াইয়া বসিতে না পারার দরুণ কোমরে বেদনা ধরিয়া যায়, তথাপি তাহারা মনে করে, যে পরম সুখে যাইতেছি।

শিলিগুড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া প্রথম দশ মাইল যাইতে একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু শুক্না ষ্টেশন ছাড়াইয়া যখন গাড়ী বনের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন হইতেই মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়।

বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ গাড়ী একটা খোলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন দেখা দেখা যায়—ইস্ কত উঁচুতে উঠিয়া আসিয়াছি। মাঠের পর মাঠ আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। বড় বড় নদীগুলিকে সেই মাঠের উপরে আঁচড়ের মত দেখা যাইতেছে। আঁচড়টি আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমে ঝাপ্সা হইয়া শেষে গিয়া কোথায়

মিলিয়াছে, বুঝিতে পারা যায় না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আবার গাছপালার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তখন আশ্চর্য্য হইয়া গাছের তামাসাই দেখিতে লাগিলাম। সকলগুলি গাছ চেনা যায় না। মাঝে মাঝে আবার এক একটা পরিচিত গাছও আছে। বাঁশগুলি প্রায় কলাগাছের মত মোটা, কদম গাছের মত ঢেঙ্গা। বাস্তবিক পাহাড়ের গাছগুলির কেমন ঢেঙ্গা বাই আছে। গাছে গাছে ঠেসাঠেসি, পাশাপাশি বাড়িবার যো নাই। সুতরাং সকলেই খালি উঁচু হইবার জন্য ব্যস্ত, যেন কি একটা মস্ত তামাসা দেখিবার জন্য তাহারা পাহাড়ের 'গ্যালারি'তে দাঁড়াইয়া আছে। এক জনের ঘাড়ের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া আর এক জনের কেবল সেই তামাসা দেখিবার চেষ্টা। কেবল যে খুব বড় বড় গাছই আছে তাহা নহে। নীচের দিকে তাকাইলে ঝোপ জঙ্গলেরও অভাব নাই। সেই ঝোপের ভিতর দিয়া সকল জায়গায় নজর চলে না। এক এক জায়গায় আবার বেশ পরিষ্কারও আছে। সেখানে চাহিয়া দেখিলে, দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গা, উঃ! সেই কতদূর অবধি নামিয়া গিয়াছে। একবার যদি রেল হইতে পড়িয়া গড়াইতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে কোথায় গিয়া আটকাইব, তাহার ঠিকানা নাই। বাস্তবিক এইরূপ খাদের ধার দিয়া চলিবার সময় মনে কেমন একটা ভয় আসে। চঞ্চল ছেলেপিলেদিগকে গাড়ীর পাশে বসিতে দিতে সাহস হয় না। এইরূপে ক্ষণেক বনের ভিতর দিয়া ক্ষণেক খোলা জায়গা দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। খোলা জায়গায় আসিলেই মাঠের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যতই উপরে উঠিতে থাকি, ততই সে দৃশ্য আরও সুন্দর লাগে। কত বড় বড় পাহাড় ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছি। যে পাহাড়গুলিকে প্রথমে ভয়ানক উঁচু বোধ হইয়াছিল, সেগুলি এখন উই ঢিপির মত হইয়া গিয়াছে।

কত উঁচুতে উঠিয়াছি জান? যদি মেঘলা হইত, তবে এতক্ষণে মেঘের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতাম। এবারে আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই এ যাত্রা আর মেঘের ভিতরে ঢোকা হয় নাই। অন্য অন্য বারে (ইহার পূর্ব্বে আরও কয়েকবার দারজিলিঙ্গে আসিয়াছিলান) এই ব্যাপারটা দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত। পাহাড়ের আগায় মেঘ দেখা গেলেই মনে হইত, কতক্ষণে ইহাদের ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া যাইব। শেষে সেই মেঘগুলিকে দেখিয়া মনে হইত যেন তাহারা মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে।

এত উঁচুতে উঠিয়া আসিতে পারিলে বাস্তবিকই বোধ হয় যে একটা নূতন দেশে আসিয়াছি বটে। গাছপালার আর একটাকেও চিনিতে পারা যায় না।

তোমরা যে মেঘের দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাও, এখানে সেই মেঘের ভিতর

চলা ফেরা করিয়া বেড়াইতে হয়। তোমাদের ওখানে এই সময়ে পাখার বাতাস আর বরফ পানিতে কুলাইতে পার না, আর এখানে আমরা মস্ত লেপ গায়ে জড়াইতেছি। এমন, কি এদেশের ঘর, বাড়ী, পথ, ঘাট কিছুই তোমাদের ওখানকার মত নহে। তোমরা কোথাও যাইতে হইলে সোজা সুজি পথ চলিয়া যাও, সুতরাং পাহাড়ে পথ চলিবার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পার না (যাঁহারা পাহাড়ে গিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে মাপ করিবেন, এই কথাগুলি তাঁহাদের বলি নাই)। এখানে অনেক সময়, যদি তোমার ঠিক উত্তরমুখী যাইবার দরকার হয়, তবে সোজাসুজি যাইবার কোন বাধা না থাকিলেও তোমার সোজাসুজি যাওয়া চলিবে না। তোমার যাওয়া চাই উত্তরমুখী, কিন্তু তোমার পথ তোমাকে উত্তর-পশ্চিমমুখী লইয়া যাইবে। খানিক দূর গিয়া আবার তাহা উত্তর পূর্ব্বমুখী ফিরিবে। এইরূপে ক্রমাগত একবার এপাশ একবার ওপাশ করিয়া লাজুক ছেলের মিষ্টান্নের নিকটবর্ত্তী হওয়ার কায়দায়, তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার কারণ এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে পাহাড়ে চলিবার সময়ে লোকের ভারি লজ্জা হয়। পাহাড়ে উঠা নাকি বড়ই পরিশ্রমের কাজ, সেই পরিশ্রম কমাইবার জন্যই ঐরূপ করিয়া চলার রীতি হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমাগত নূতন শোভা দেখিতে দেখিতে দারজিলিঙ্গে পথে অগ্রসর হওয়া যায়। 'দারজিলিঙ্গ হিমালয় রেলওয়ে'র মধ্যে "ঘুম" ষ্টেশন সর্ব্বাপেক্ষা অর্থাৎ প্রায় দেড় মাইল উঁচু। এইস্থানে আসিলে খুব শীত বোধ হয়। নীচে হইতে রওয়ানা হইবার সময় পাত্‌লা কাপড় পরা থাকিলে এখানে আসিয়া গরম একটা কিছু গায়ে না দিলে চলে না।

"ঘুম" হইতে দারজিলিঙ্গ তিন মাইল নীচমুখে যাইতে হয়। এতক্ষণ যে ইঞ্জিনের শব্দে কাণ ঝালাপালা হইতেছিল, এর পর হইতে সে শব্দ একেবারে থামিয়া গেল, কারণ নীচমুখে গাড়ী আপনিই গড়াইয়া চলে, ইঞ্জিনের তাহার জন্য বেশী পরিশ্রম করিবার দরকার নাই, সুতরাং তখন আর তাহাকে এত হাঁস্ ফাঁস্ করিতে হয় না।

দারজিলিঙ্গ হইতে শিলিগুড়ি যাইবার সময় "ঘুম" হইতে শুক্‌না পর্য্যন্ত আগাগোড়া ট্রেনখানি এইরূপে গড়াইয়া চলে।

ঘুম হইতে খানিকদূর আসিয়া হঠাৎ যখন দারজিলিঙ্গের সহর চক্ষে পড়ে, তখন তাহা অতি সুন্দর দেখায়! ঠিক যেন ময়রার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আগুন

আজ কালকার সভ্য মানুষ, যাহারা দিব্য আরামে ঘরে বসিয়া দিয়াশালাই ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়, তাহারা ভাবিয়াই দেখে না যে এই আগুন মানুষের কত তপস্যার ধন। যে আগুন বনে জঙ্গলে দাবানল হইয়া জ্বলে, যে আগুন আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জিভ মেলিয়া ধুকিতে থাকে—সেই আগুনকে মানুষ যখন আপনার শক্তিতে জ্বালাইতে শিখিল, সেই দিন মানুষ এমন বিদ্যা শিখিল যাহা মানুষ ছাড়া আর কেহ জানে না। চকমকি পাথর ঠুকিয়া বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া সেই যে কোন্ কালের আদিম মানুষ আগুন জ্বালাইবার উপায় বাহির করিয়াছিল, আজও পৃথিবীর কত অসভ্য জাতি ঠিক সেই উপায়ে প্রতিদিন আগুন জ্বালিতেছে। এই কাজ করিতে কৌশল ও পরিশ্রম দুয়েরই দরকার হয়। কাঠের মধ্যে কাঠ ঘুরাইয়া আগুন জ্বালিবার প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল—বেদে এবং পুরাণে তার কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার এইভাবে আগুন জ্বালান বড় সহজ কথা নয়, সেই জন্য একবার আগুন জ্বালান হইলে তাহাতে বার বার কাঠ কুটা শুক্‌না পাতা ইত্যাদি সেই আগুনকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার হইত। কেবল আমাদের দেশে নয়, এই রকম আগুন রক্ষার আয়োজন, রোম গ্রীস ইজিপ্ট প্রভৃতি সকল দেশেই ছিল। অনেক সময়ে রীতিমত মন্দির গড়িয়া পুরোহিত রাখিয়া এই আগুনের তদ্বির করা হইত। লোকে সেই সকল মন্দির হইতে প্রতিদিন আগুন লইয়া আসিত এবং সকলে মিলিয়া আগুনের সম্মান ও পূজা করিত।

আগুন না থাকিলে মানুষের অবস্থা কি হইত? আগুন ছিল তাই মানুষ শীতের মধ্যেও টিঁকিতে পারিয়াছে, কত হিংস্র জন্তুর হাতে হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, রান্না করিতে শিখিয়াছে, মাটি পোড়াইয়া বাসন গড়িতে শিখিয়াছে, লোহা তামা প্রভৃতি ধাতুকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে। সহরে গ্রামে ঘরের আশে পাশে সর্ব্বদা যে সব জিনিষ কাজে লাগে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, আগুন না হইলে তাহার কোন্‌টা তৈয়ারি করা সম্ভব হইত? মাটির হাঁড়ি, কাঁসার বাসন, সোণা রূপার অলঙ্কার এসব ত ছাড়িয়াই দিলাম। জুতাটি যে পায়ে দিয়াছ, তাহার কাঁটাগুলিত লোহার, ঐ জুতা সেলায়ের জন্য লোহার ছুঁচ দরকার হইয়াছিল ত? আগুন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত কিরূপে? ঘরে এত যে সাবান সুগন্ধি ওষুধ পত্র ব্যবহার কর, তাহার মালমশলার

জন্য কত কারখানায় কত চুল্লী জ্বালিতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখত। রাত্রে যে আলো জ্বালাইয়া পড়াশুনা কর, সেই আলোটুকু যদি না থাকিত তবে কেমন অসুবিধা হইত বল দেখি। আর ঐ যে কাচের চশমা পর, কাচের "থার্ম্মমিটার" দিয়া জ্বর মাপ, আর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য কাচের যন্ত্র ব্যবহার কর, ক্ষার চূন ও বালি আগুনে না গলাইলে সে কাচ আসিত কোথা হইতে? আগুন ছাড়া পৃথিবী যদি কল্পনা করিতে চাও ত এই সমস্ত জিনিষ বাদ দিতে হয়—এই সমস্ত জিনিষের সাহায্যে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে সে সমস্ত লোপ করিতে হয়; আর মানুষকে কল্পনা করিতে হয়, সেই আদিমকালের অসভ্যের মত—যাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস খাইয়া, গাছের ছাল বাকল ও জানোয়ারের চামড়া পরিয়া, গাছ পাথরের অস্ত্রে সাজিয়া, গাছে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে লুকাইয়া ফিরিত। সে সময়ের পৃথিবীতেও কাঠ ছিল, কয়লা ছিল, আগুন জ্বালিবার মাল মশলা সবই ছিল। ছিল না কেবল আগুন—ছিল না কেবল সেই জ্ঞানটুকু যাহাতে আগুন জ্বালিবার সঙ্কেতটি জানা যায়। সেই মানুষ, আর এখনকার এই মানুষ! এ দুয়ের মধ্যে এত যে প্রকাণ্ড তফাৎ দেখিতেছ, তাহার প্রধান কারণ এই আগুনের আবিষ্কার।

আমাদের দেশে আগুনকে বলে "সর্ব্বভুক্"। একবার যদি সে জিভ মেলিয়া বাহির হইল, তবে তাহার ক্ষুধার আর শেষ নাই—সে তখন সব খাইয়া উজাড় করিতে পারে। আগুনকে যদি তুষ্ট করিতে চাও, কাজে লাগাইতে চাও, তবে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার খোরাক দেওয়া চাই। কাগজ দাও, খড় দাও, কাঠ দাও, কয়লা দাও, তেল ঘী কেরোসিন যাহা সে হজম করিতে পারে তাহাই দাও—একটা কোন খোরাক না জোগাইলে সে জ্বলিতে পারে না। আগুন জ্বালিবার জন্য মানুষে প্রতি বৎসর কত বন জঙ্গল উজাড় করে, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খুঁড়িয়া তোলে, কত বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া কেরোসিন প্রভৃতি খনির তেল দেশ বিদেশে চালান দেয়, কত মোম চর্ব্বি ঘী তেল খরচ করিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়, তাহার হিসাব লইতে গেলে অবাক হইতে হয়। আজ কালকার নিতান্ত অসভ্য যে মানুষ—লঙ্কা দ্বীপের ভেদ্দা বা আফ্রিকার "বুশ্‌ম্যান"—তাহারাও আগুনের ব্যবহার জানে। অতি প্রাচীন কালে আগুনছাড়া মানুষ যাহারা ছিল, তাহারা যে আগুনওয়ালা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া টিকিতে পারিত না, একথা সহজেই বোঝা যায়। শীতের অত্যাচারে, শত্রুর

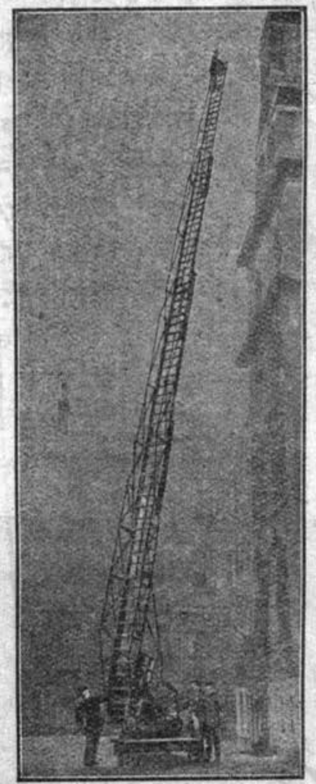
অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে—নানা রকম বিপদে আপদে, আগুনের সাহায্য না পাইলে আজকালকার এই মানুষ আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? হয়ত মানুষ জাতিটাই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবার জোগাড় হইত।


আদিমকালের আগুনওয়ালা মানুষ।

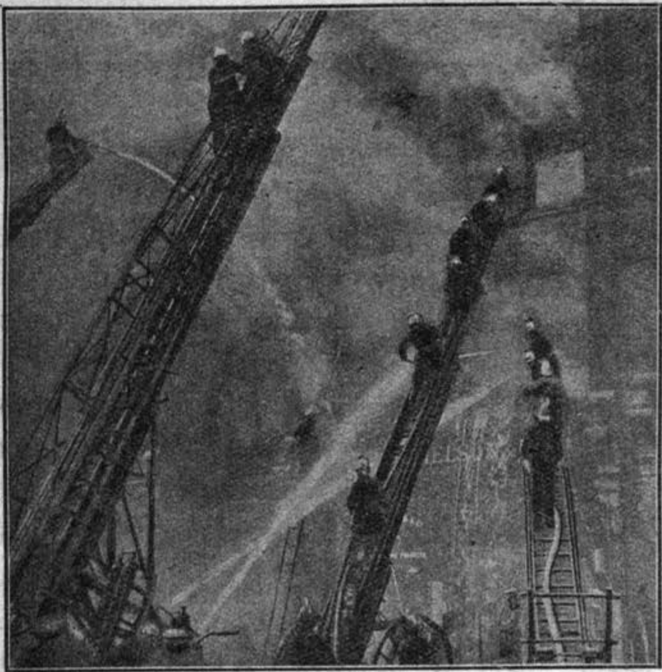
হিংস্র জন্তু পোষ মানিলেও তাহার হিংস্রতা একেবারে দূর হয় না। সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, কখন তাহার হিংসা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। আগুনকে বাগ মানাইতে গিয়াও মানুষকে পদে পদেই এই রকম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আমরা একবার শিলং পাহাড়ে গিয়াছিলাম; সেখানে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ওগুলি বুঝি পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা। পরে কাছে গিয়া বুঝিলাম ওগুলি রাস্তা নয়, জঙ্গলের মাঝে মাঝে চওড়া ফিতার মত ফাঁকা জমী;—ঠিক যেন পাহাড়ের মাথার উপর ক্ষুর চালাইয়া খালের মত করিয়া চাঁচিয়া রাখিয়াছে। শুনিলাম, আগুনের ভয়ে নাকি ওরকম করা হইয়াছে; কোথাও আগুন লাগিলে, ঐ ফাঁকা জায়গা পর্য্যন্ত আসিয়া

আগুন আর ছড়াইতে পারে না। আমেরিকার বড় বড় Prairie বা ঝোপ-জমীতে কেবল ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—সেখানে আগুন লাগিলে এক এক সময়ে ব্যাপার ভারি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সে আগুন এমন হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে যে মানুষে অনেক সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়াও তাহার হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে না।

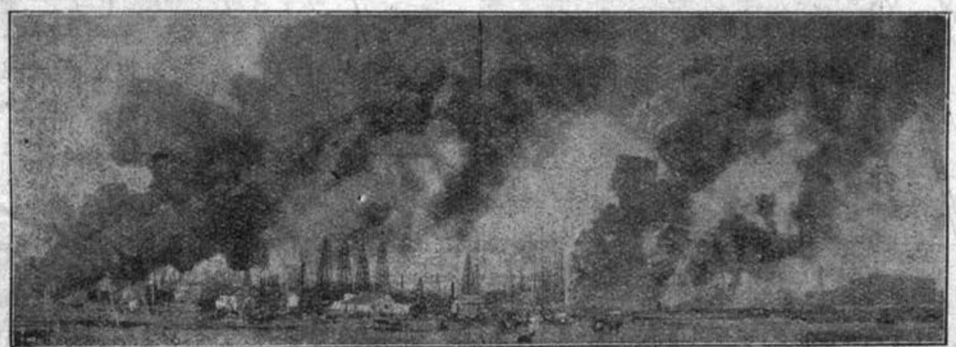
এসব ত গেল বাহিরের আগুনের কথা। মানুষের ঘরে ঘরে সংসারের কাজের জন্য প্রতিদিন যে আগুনের দরকার হয়, সেই আগুন যখন এক একবার ছাড়া পাইয়া ঘরবাড়ী সহর গ্রাম সব খাইয়া শেষ করে, তাহাও কি কম সাংঘাতিক! কখন কাহার অসাবধানতায় আগুন ছড়াইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কত রকমে মানুষকে সতর্ক হইতে হয়। বড় বড় সহরে দমকলের ষ্টেশন থাকে, আগুন নিভাইবার জন্য কত লোক লস্কর ও কত রকম আয়োজন রাখিতে হয়। বড় বড় দমকল, যাহা হইতে জলের ফোয়ারা ছুটিয়া আগুনের মধ্যে গিয়া পড়ে; তিনতলা চারতলার সমান লম্বা লম্বা মই, যাহাকে দূরবীণের মত গুটাইয়া রাখা যায়; আর বড় বড় মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী, যাহাতে আগুনের জায়গায় চট পট ছুটিয়া যাওয়া যায়; আর আগুন লাগিলে পর আগুনের আফিসে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছাইবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা। টেলিফোনের আফিসে একটিবার "ফায়ার!" ("Fire") বলিয়া খবর দাও, অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে আগুনষ্টেশনের সাড়া শুনিবে—"কোথায় আগুন?" বাস্! এক মিনিটের মধ্যে ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটিয়া বাহির হইবে। সে শব্দ শুনিলে রাস্তার গাড়ী ঘোড়া মোটর সাইকেল সব শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। যাহারা আগুনের পল্টনে কাজ করে, তাহাদের



শিক্ষা এবং সাহস দুই দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বীরত্বের অনেক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।



বড় বড় আগুনের দৃশ্য একদিকে যেমন ভয়ানক, আর একদিকে তেমনি সুন্দর। আগুনে সহর বাড়ী পুড়াইয়া কত মানুষের সর্ব্বনাশ করে, তাহাতে মানুষ হাহাকার করে, আবার সেই আগুনেরই প্রচণ্ড গম্ভীর তেজ দেখিয়া বিস্ময়ে মানুষ অবাক হইয়া থাকে। এম্‌ডেন (Emden) নামে জার্ম্মানদের একটা যুদ্ধ জাহাজ কয়েক দিন বঙ্গসাগরে ভারি উৎপাত করিয়াছিল। সেই জাহাজের একটা গোলা মান্দ্রাজের একটা



প্রকাণ্ড কেরোসিনের চৌবাচ্চায় পড়িয়া সমুদ্রের ধারে যে অগ্নিকাণ্ড লাগাইয়াছিল, "তামাসা" হিসাবে সে দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার হইয়াছিল! আর কেরোসিনের জন্ম যেখানে,—যেখানে ব্যবসার জন্য খনি খুঁড়িয়া, কূয়া বসাইয়া, কেরোসিনের হ্রদ বিল ও কেরোসিনের ফোয়ারার সৃষ্টি করা হয়—সেখানে যখন আগুন ধরিয়া যায়, আর লক্ষ লক্ষ মণ কেরোসিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন ব্যাপারটি যে কেমন হয়, তাহার আর বর্ণনা হয়না। পেটুক আগুন তখন মনের মত খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ জিভ মেলিয়া ধোঁয়ার হুঙ্কার ছাড়িয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য গ্রাস করিতে চায়। (আগের পৃষ্ঠায় ছবি দেখ)। তাহার কাছে লঙ্কাকাণ্ডই বা কি আর, খাণ্ডব দাহনই বা লাগে কোথায়!

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বল্‌ল, "ভাই ক'দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখ্‌তে পার্‌বে"? সওদাগর বল্‌ল, "পার্‌ব না কেন? তবে কি জান, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বল্‌বার কি আছে, আমার ঐ সিন্ধুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না"। তখন মহাজন তার থলে'ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্ধুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্তমনে বাড়ী গেল।

এদিকে হ'য়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্‌খুস্ কর্‌ছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাব্‌ছে আর তার মনে হচ্ছে যে বন্ধু না জানি কত কি রেখে গেছে! একবার খুলে দেখ্‌তে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্ধুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখ্‌ল—থলি ভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হ'ল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভ'রে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখ্‌ল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্পসল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বল্‌তে লাগ্‌ল, "কাজটা ভাল হয় নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস ক'রে টাকাটা রাখ্‌ল, তাকে ঠকান উচিত হয়নি"। একথা সেকথার পর মহাজন বল্‌ল, "তাহ'লে বন্ধু আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে"?

সওদাগর বল্‌ল, "হ্যাঁ বন্ধু সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে —আমি থলিটা আর সরাই নি"। বন্ধু তখন সিন্ধুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বল্‌ল, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বস্‌লে কেন"? বন্ধু বল্‌ল, "ভাই, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখ্‌ছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা"! সওদাগর বল্‌ল, "তাও কি হয়? মোহর কখনও পয়সা হ'য়ে যায়"? সওদাগর চেষ্টা কর্‌ছে এরকম ভাব দেখাতে, যেন সে কতই আশ্চর্য্য হ'য়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখ্‌ল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে! ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকী রইল না—তবু সে কোন রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বল্‌ল, "আমিত মোহর মনে ক'রেই রেখেছিলাম—এখন দেখ্‌ছি কোথাও কোন গোল হ'য়ে থাক্‌বে। যাক্, যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই"। এই ব'লে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়ীতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দুমাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ী এসে বল্‌ল, "বন্ধু, আজ আমার বাড়ীতে পিঠে হ'চ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও"। বিকাল বেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়ীতে রেখে এল, আর বল্‌ল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব"। মহাজন কর্‌ল কি, ছেলেটার পোষাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোষাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মত করে বল্‌ল "ভাই! একটা বড় মুস্কিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস নুদুস ফুট্‌ফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি কি রকম হ'য়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মত দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলত বন্ধু!" ব্যাপার দেখে সওদাগরের ত চক্ষুস্থির! সে বল্‌ল "কি পাগলের মত বকছ? মানুষ কখনও বাঁদর হ'য়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভাল মানুষের মত বল্‌ল "কি জানি ভাই! আজ কাল কি সব ভূতের কাণ্ড হ'চ্ছে, কিছু বুঝবার যো নেই। এই দেখ্‌না সে দিন আমার সোণার মোহরগুলো খামখা বদ্‌লে সব তামার পয়সা হ'য়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ



করতে। কাজির হুকুমে চার চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বল্লেন "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কি করেছ"? শুনে চোখ দুটো গোল করে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বল্‌ল, "আমি? আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর! ওর বাড়ীতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হ'য়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ী আস্‌তে না আস্‌তেই ল্যাজ ট্যাজ্ গজিয়ে দস্তুর মত বাঁদর হ'য়ে উঠেছে। কি রকম যে হ'চ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড। এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। তিনি বল্লেন, "আচ্ছা তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকীর ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর

কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর সয়তানী আছে। সাবধান! তা'হলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলেত মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সব শুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চল্‌ল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফিরল। ভোর না হ'তেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভ'রে মহাজনের বাড়ী গিয়ে বল্‌ছে "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য্য দেখে যাও! তোমার পয়সা গুলো আবার সব মোহর হ'য়েছে"। মহাজন বল্‌ল "তাই নাকি? কি আশ্চর্য্য! এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হ'য়ে গেছে।" তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বল্‌ল "দেখ্‌ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বল্‌বি ত মেরে তোর থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"

ঠকানে প্রশ্ন

গণেশদাদা বল্‌লেন, "একটা গরুর গলায় দশ হাত লম্বা মোটা দড়ি বাঁধা। সেখান থেকে পঁচিশ হাত দূরে এক আঁটি ঘাস আছে। কেউ ঘাস এগিয়ে দিল না, দড়ি ছিড়তে হ'ল না, অথচ গরু অনায়াসে সেই ঘাস খেয়ে ফেল্‌ল। বলত এটা কি করে সম্ভব হয়"? দামু বল্‌ল, "বুঝেছি। খুব হাওয়া হ'ল, আর ঘাস উড়ে এসে পড়ল"। গণেশদা বল্লেন, "তাহ'লেই ত এগিয়ে দেওয়া হ'ল"। গদাই অনেক ভেবে বল্ল, "এরকম হ'তেই পারে না"। গণেশদা বল্লেন, "কেন হবে না? গরুর গলায় দড়ি বাঁধা ব'লেছি, দড়িটা যে খোঁটায় বাঁধা তা'ত আর বলিনি—দড়িটা আল্‌গাই ছিল"। তা' শুনে সকলে বল্‌ল, "এটা নেহাৎ ফাঁকি হ'ল"।

তখন মতিলাল বল্‌ল, "দুটো গাধা ছিল—তাদের ভয়ানক জেদ। খাওয়াবার সময় একটা পশ্চিমমুখো, আর একটা পূবমুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—ঠেল্‌লে সরবে না, মার্‌লে নড়বে না। এখন একটা বাল্‌তিতে ক'রে দুটোকে এক সঙ্গে খড় খাওয়াতে হবে। কি করা যায়? করা যা হ'ল তা কিছুই কঠিন নয়, অথচ গাধা দুটো যেমন উল্টো দিকে মুখ ক'রে ছিল, ঠিক তেমনিই রইল"। দামু বল্‌ল, "ওটা আমি জানি"।

আর সবাই বল্‌ল, "জানিস্ ত চুপ ক'রে থাক্ না। আমাদের ভাবতে দে।" তারা ভাবছে, সেই সঙ্গে তোমরাও একটু ভেবে নেও।

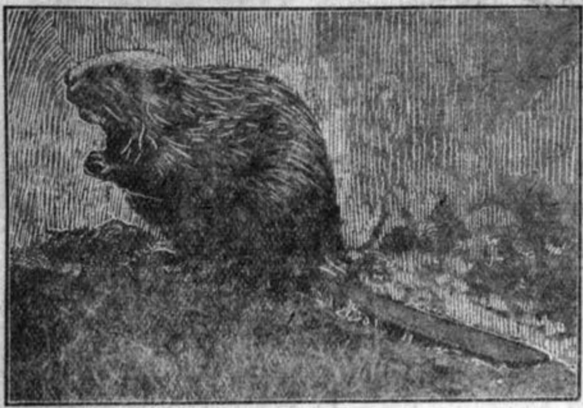
যা হোক্ এটাতে সকলকে ঠকান গেল না। তখন বিপিন বল্‌ল, "আমি একটা কৌশলের ধাঁধা জানি। এক সুলতান, আটহাত লম্বা আট হাত চওড়া একখানা শতরঞ্চি বিছিয়ে, তার উপরে ঠিক মধ্যখানে একটী হীরের কৌটা রেখে, বল্লেন,—ঐ শতরঞ্চিতে না মাড়িয়ে কিম্বা তার উপরে হাত পা বা শরীরের কোন রকম ভর না দিয়ে, আর লাঠি দড়ি বা কোন যন্ত্রের বা অন্য লোকের সাহায্য না নিয়ে, যে পার সে কৌটোটি উঠিয়ে নাও।' কত ওস্তাদ ডন্‌গীর এসে কতরকম কসরৎ করে নেবার চেষ্টা করল, কত ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা লোক এসে, কত রকম কায়দা ক'রে ঝুঁকে প'ড়ে সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। শেষটার একটা বেঁটে রোগা লোক এসে চট্‌পট্ অতি সহজে কৌটোটিকে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল।" বলত কি রকম ক'রে হ'ল?

গোপাল মামা এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন "ভারিত বল্লি! এই যে সরবতের গেলাস দেখছিস্, এটাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখ্; আমি ধামায় হাত দেবনা, তুলবনা, অথচ সরবৎ খেয়ে ফেল্‌ব।" তখন সকলে ছুটোছুটি ক'রে একটা ধামা এনে গেলাসটাকে চাপা দিয়ে তামাসা দেখ্‌তে বস্‌ল। মামা তখন মাথায় চাদর ঢেকে ধামার কাছে ব'সে খানিকক্ষণ ঢক্ ঢক্ শব্দ ক'রে ব'ল্লেন "বাস্! সরবতের দফা শেষ।" সবাই বল্‌ল "কই দেখি?" ব'লে যেই তারা ধামা তুলেছে অম্‌নি মামা খপ্ ক'রে গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে সরবৎ খেয়ে বল্‌লেন, "কেমন! ধামা ধরলাম না, ছুঁলাম না, সরবৎ খেয়ে ফেল্লাম! হ'ল ত?"

জানোয়ার ইঞ্জিনিয়ার

পাখীর মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল—বুদ্ধির জন্য মানুষে ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশী কি না, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ী উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকায়। ন্যাজশুদ্ধ দু হাত লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা ইঁদুর বা

"গিনি পিগে"র মত,—তার চেহারায় বিশেষ কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড় কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড় "এঞ্জিনিয়ার" আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।



মৌমাছির চাক, মাকড়ষার জাল, পিঁপড়ের বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধিকৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের "লাক্‌ড়ি" বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়। খাল কাটিয়া একজায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র, বাটালির মত ধারাল চারটি দাঁত। বড় বড় গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমত পরিশ্রম লাগে—বীভার তাহার ঐ দাঁত দুটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলবলে বসতি করে, তাহার আশে পাশেই দেখা যায় যে অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমী হইতে হাত খানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক একটা গাছ প্রায় পড়' পড়' অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটিলেই পড়িয়া যাইবে। এসমস্তই বীভারের কাণ্ড। গাছটি যখন কাটা হইল, তখন তাহাকে ছোট বড় নানা রকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায় যখন চলাফেরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেই জন্য শীত আসিবার পূর্ব্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধূম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

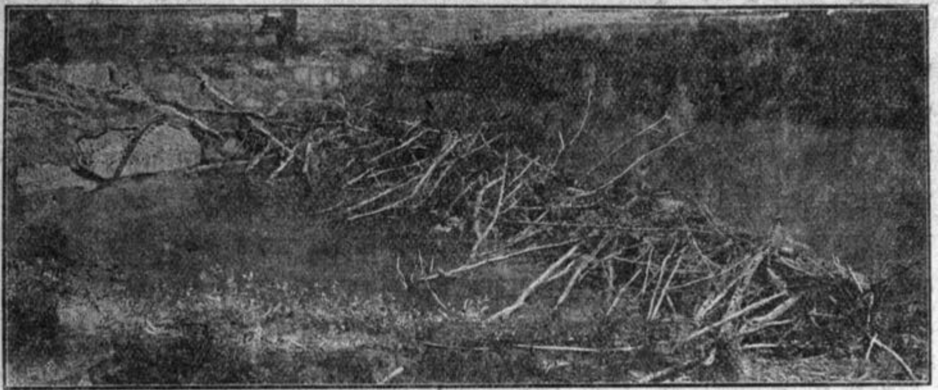
বীভারের প্রধান আশ্চর্য্য কীর্ত্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাঠ কুটা ও মাটির ঢিপি

বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচাল সুরঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুরঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোন উপায় নাই। বাসার উপরে যে ঢিপির মত ছাদ থাকে, তাহাও দু তিন হাত বা তাহার চাইতে বেশী পুরু এবং খুবই মজবুত। এক একটা ঢিপি প্রায় পাঁচ সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুরঙ্গ পথ কাটিতে আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব মোটা হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুরঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা আপন আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড় বড় বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি চারটি বা আট দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেজের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোন কোন জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটদের ঘর, বড়দের ঘর, ইত্যাদি নানারকম আল্‌গা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতালা তিনতালা করিয়াও ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড় সুরঙ্গটার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায়, সেই সময়ে বাহির হইবার জন্যও অনেক সময়ে একটা আল্‌গা সুরঙ্গের দরকার হয়। এই সুরঙ্গটা থাকে বাসার বাহিরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙ্গার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া, তারপর এই সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া, তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।

বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে জলে থাকার অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মত চ্যাটাল পা, নৌকার বৈঠার মত চওড়া চ্যাপ্টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপর আবার লম্বা তেল্‌তেলা লোমের ঢক্‌নি—এ সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহার চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারোমাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড় বড় বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে, অথচ স্রোত বেশী নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেই রকম জায়গা তাহাদের

খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জ্জন চাই, তবেই তাহা ষোল-আনা মনের মত হয়। দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমতঃ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া জায়গা ঠিক করে; তারপর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠাল মাটি আর ছোট বড় লাকড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে



থাকে। এক পরৎ মাটি দিয়া তার উপর এক সার লাকড়ি চাপায়; তার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডাল পালা শিকড় জড়াইয়া মজবুৎ করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুই দিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময়ে জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে কাছে আরও দু একটা ছোট খাট বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এই কাজটিও বীভারেরা খুব হিসাবমত বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোন্ দিকে, কোথায় কতখানি জল, ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার। ক্যানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন চারটা বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে তাঁহার উপর ওকাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যে রকম ভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন, বীভারেরাও ঠিক সেই সব জায়গায় তেমনি ভাবে বাঁধ বসাইয়াছে! এই রকম এক একটি বাঁধ এক এক সময়ে একশ' বা দুইশ' হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত

উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাসা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া ভাঙ্গিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙ্গা বাঁধের ফাঁক দিয়া হুড় হুড় করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তারপর দেখিতে দেখিতে ৮।১০টি বীভার অতি সাবধানে এদিক ওদিক কাণ পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তারপর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তারপর একটা বীভার তার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মত কোথায় সরিয়া পড়িল, আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের আওয়াজের মত শুনায়—এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট্ শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড় বড় লাকড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেই জন্য বীভারেরা এমন জায়গায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমন ভাবে কাটে যে গাছগুলা পড়িবার সময় ঠিক নদীমুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে উপায় কি? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমত খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্য্যন্ত, দু হাত চওড়া ও দু হাত গভীর, একটি খাল কাটিয়া যায়। তারপর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনই মুস্কিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়ই সুন্দর ও মোলায়েম—সৌখিন লোকের লোভ হইবার মত জিনিষ। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দুপয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের

সখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনও যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

আবোল তাবোল



রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা, তার উপরে বস্‌ল রাজা ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা, পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা রাজা বলে বৃষ্টি নামা—
নৈলে কিচ্ছু মিলছে না॥

থাকে সারা দুপুর ধ'রে ব'সে ব'সে চুপ্‌টি ক'রে হাঁড়ি পানা মুখটি ক'রে
আঁক্‌ড়ে ধ'রে শ্লেট্‌টুকু।
ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে ভ্যাবাচ্যাকা এক্‌লা নিজে হিজিবিজি লিখ্‌ছে কি যে
বুঝ্‌ছে না কেউ একটুকু ॥
ঝাঁঝাঁ-রোদ আকাশ জুড়ে মাথাটার ঝাঁঝরা ফুঁড়ে মগজেতে নাচ্‌ছে ঘুরে
ঝমর্‌ ঝমর্‌ ঝনর্‌ ঝন্‌।
ঠাঠা'-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে আর বাঁচিনে ছুটে আন্‌ বরফ কিনে
ক'চ্ছে কেমন গা ছন্‌ ছন্‌ ॥
সবে বলে, হায় কি হ'লো রাজা বুঝি ভেবেই মোলো ওগো রাজা মুখটি খোলো
কও না, ইহার কারণ কি ?
রাঙামুখ পান্‌সে যেন তেলে-ভাজা আম্‌সি-হেন রাজা এত ঘাম্‌ছে কেন—
শুন্‌তে মোদের বারণ কি ?
রাজা কয়, "কেইবা শোনে—যে কথাটা ঘুরছে মনে মগজের নানান্‌ কোণে
আন্‌ছি টেনে বাইরে তায়—
সে কথাটা বল্‌ছি শোন—যত ভাব যতই গোণ' নাহি তার জবাব কোন—
কূল কিনারা নাই রে হায় ॥
লেখা আছে পুঁথির পাতে "নেড়া যায় বেলতলাতে"—নাহি কোন সন্ধ তাতে
—কিন্তু প্রশ্ন, "ক'বার যায়" ?
সে কথাটা এদ্দিনেও পারেনিক বুঝতে কেও লেখেনিক পুস্তকেও
দিচ্ছে না কেউ জবাব তায়।
লাখো বার যায় যদি সে, যাওয়া তার ঠেকায় কিসে ? ভেবে তাই পাইনি দিশে
নাইক কিচ্ছু উপায় তার" ?
একথাটা যেম্নি বলা রোগা এক ভিস্তিও'লা ঢিপ্‌ ক'রে বাড়িয়ে গলা
প্রণাম কল্লে দুপায় তার !
হেসে বলে "আজ্ঞে, সেকি ! এতে আর গোল হবে কি ? নেড়াকেত নিত্যি দেখি
আপন চকে পরিষ্কার—
আমাদেরি, বেল্‌তলা সে, নেড়া সেথা খেল্‌তে আসে, হরে দরে হয়ত মাসে
নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার ॥"

নূতন ধাঁধা

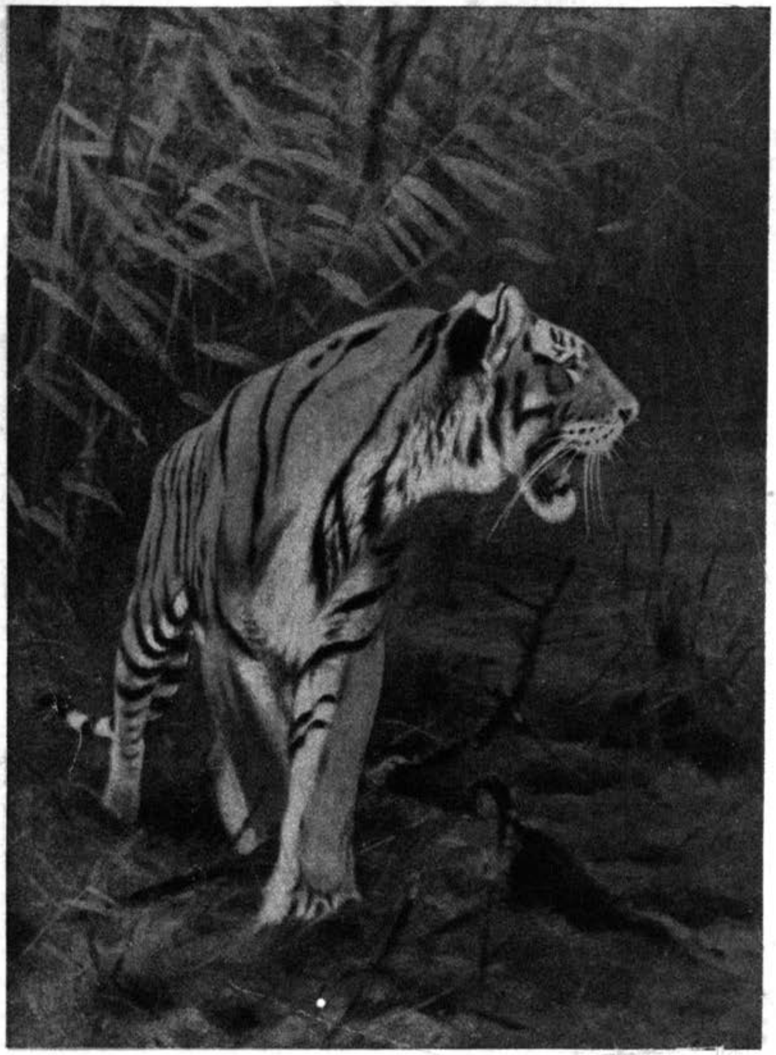
শব্দ চৌকি (তিন অক্ষরের)

শব্দ চৌকির সঙ্কেত বৈশাখের সন্দেশে বলা হইয়াছে।

১। প্রথম ঘেরিয়া আছে এ বিশ্বজগৎ
দ্বিতীয় বলিতে পারে ভূত ভবিষ্যৎ
তৃতীয়ে আসল বলি দেয় লোকে ফাঁকি—
সবি ত দিলাম বলি'—বুঝিতে কি বাকী ?

২। প্রথমে পালন করি আজ্ঞা বলে মানি
দ্বিতীয়ে খাতির করি রাজপুত্র জানি।
তৃতীয়ে ভাবিয়া লোকে ভীত হয় সবে
এখন বাঁধিয়া দেখ, খাসা চৌকি হবে।

৩। প্রথম সে লালে লাল যেন রক্তে গাঁথা
দ্বিতীয়ের অঙ্কে ভরা দোকানীর খাতা
তৃতীয়ের শব্দ শুনি সঙ্গীতের তালে
চটাপট্ চৌকি বাঁধ চুমিনিট্ কালে



ক্ষুধিত বাঘ



ষষ্ঠ বর্ষ | পৌষ, ১৩২৫ | নবম সংখ্যা

বাতাসের গান

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ;
মোরা নাচি সুরধুনী কুলে কুলে।

কখনো চলি বেগে কভু মৃদুচরণে,
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে ;
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে ;
মাতি নিধি সনে কভু রণে
ভাসি আকাশে নীরদ সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে থাকে ঘুমে ধরণী
গহন, নদী, নিধি, নভে মেঘ তরণী ;
পুনঃ জাগে হরষে মোদের পরশে
নয়ন খুলে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

সচ্চরিত্রতা

(মহাভারত)

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দুর্য্যোধন ছিলেন ধনভাণ্ডারের কর্ত্তা। সেই যজ্ঞে সভার মধ্যে দুর্য্যোধন কিরূপ লজ্জা পাইয়াছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিল, সেই সব কথা তোমরা মহাভারতে পড়িয়াছ। অভিমানী দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সেই অবধি মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর মলিন ও শুষ্ক হইতে লাগিল। ক্রমে এই কথা জানিতে পারিয়া, একদিন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন—"বৎস! তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই—ধন রত্ন, দাস দাসী, অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সুস্বাদু খাদ্য—কিছুরই ত তোমার অভাব নাই; তবে কেন তুমি দিন দিন রোগা ও মলিন হইয়া যাইতেছ?" দুর্য্যোধন বলিলেন—"পিতা! পাণ্ডবদিগের তুল্য ভাগ্যবান্ আর নাই; তাহাদিগের গৃহে প্রতিদিন সহস্র ব্রাহ্মণ সোণার থালায় আহার করে, কুবেরের ন্যায় তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য— ইহাই আমার কষ্টের কারণ!"

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"তুমি যদি যুধিষ্ঠিরের সমান কিংবা তাহাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে এখন হইতে সচ্চরিত্র হও। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রির মধ্যে, জনমেজয় তিন দিনে এবং নাভাগ সাত দিনের মধ্যে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজারা অতিশয় সচ্চরিত্র ও দয়ালু ছিলেন বলিয়াই পৃথিবী তাঁহাদিগের বশ হইয়াছিল।"

দুর্য্যোধন বলিল, "এই সচ্চরিত্রতা কিরূপে পাইব?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—"পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন, শুন—দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ নিজের চরিত্রবলে ইন্দ্রের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ত্রৈলোক্যের রাজা হইয়াছিলেন। ইন্দ্র মনের দুঃখে বৃহস্পতির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুদেব! কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে? বৃহস্পতি বলিলেন—যে জ্ঞান পাইলে মুক্তিলাভ হয় সেই জ্ঞানই পরম মঙ্গলের কারণ। ইন্দ্র কহিলেন—ইহা অপেক্ষা উত্তম উপায় আর কিছু আছে? বৃহস্পতি বলিলেন—শুক্র আমা অপেক্ষা জ্ঞানী, তুমি তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর। দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া সব কথা বলিলে পর তিনি বলিলেন—মহাত্মা প্রহ্লাদের নিকট যাও, এ বিষয়ে তিনিই তোমাকে উপদেশ দিবেন।

শুক্রাচার্য্যের কথায় ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া প্রহ্লাদের নিকট গিয়া বলিলেন—'দানবরাজ! আমি তোমার নিকট মঙ্গল লাভের উপায় জানিতে ইচ্ছা করি।' প্রহ্লাদ

কহিলেন—'আমি ত্রৈলোক্য শাসনে বড় ব্যস্ত, আমার একেবারেই অবসর নাই।' ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন—'বেশত, আমি তোমার বাড়ীতেই রহিলাম, তোমার যখনই একটু অবসর হইবে, তখনই না হয় আমাকে উপদেশ দিও!' এ কথায় প্রহ্লাদ সম্মত হইলেন এবং তখন হইতে একটু অবসর পাইলেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণও ভক্ত শিষ্যের মত অতিশয় বিনয়ের সহিত প্রহ্লাদের সেবা করিয়া উপদেশ লইতে লাগিলেন!

এইরূপে কিছুদিন গেলে পর, একদিন ব্রাহ্মণ দৈত্যরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য অধিকার করিলে?' তখন প্রহ্লাদ বলিলেন—'আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনরূপ অহঙ্কার নাই। জ্ঞানী ও সাধু সজ্জনগণের প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগের উপদেশ আমি সর্ব্বদা মানিয়া চলি—তাহাতে আমার মনের অন্ধকার দূর হইয়া যায়। আমার মনে ক্রোধ নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিতে এবং পরের সেবা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সে জন্যই সাধু ব্রাহ্মণগণ সরল মনে আমাকে সর্ব্বদা সচ্চরিত্রতা ও মঙ্গললাভের উপদেশ সকল দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের উপদেশ মানিয়া চলি বলিয়াই, পরাক্রান্ত দৈত্যগণের রাজা হইতে পারিয়াছি।'

ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রহ্লাদ কহিলেন—'ঠাকুর! আপনার নিষ্ঠা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন—যাহা চাহিবেন তাহাই আপনাকে দিব।' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তুমি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে আমাকে এই বর দান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি।' ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া প্রহ্লাদ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন তেমনই তাঁহার মনে ভয়ও হইল। যাহা হউক বর দিতে তিনি মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। বর পাইয়া ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেলেন।

বরদান করিয়া প্রহ্লাদের মনে দুঃখের সীমা রহিল না। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর তিনি গভীর চিন্তায় সময় কাটাইতে লাগিলেন; কি যে করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই অবসরে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় একটি তেজ বাহির হইল। তাহা দেখিয়া প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিত্র। তুমি আমায় তোমার সেই শিষ্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছ; সেজন্য এখন তাঁহার শরীরেই গিয়া বাস করিব।

তাহার পর দৈত্যরাজের শরীর হইতে আর একটি তেজ বাহির হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্র, তুমি কে ? তেজ উত্তর করিল—আমি ধর্ম্ম, যেখানে চরিত্র আমি সেখানেই বাস করি ; এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণের নিকট গিয়াছে, সুতরাং আমিও সেখানে চলিলাম। এই বলিয়া ধর্ম্ম চলিয়া গেলে পর প্রহ্লাদের শরীর হইতে আর একটি তেজ বাহির হইল। তাহাকে দেখিয়া প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? তেজ বলিল, আমি সত্য ; এখন তোমাকে ছাড়িয়া আমি ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম ! তার-পর প্রহ্লাদের শরীর হইতে মহা বলবান্ এক পুরুষ বাহির হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাপুরুষ ! তুমি কে ? পুরুষ কহিল—আমি সৎকার্য্য ; যেখানে সত্য সেখানেই আমার বাস।

সৎকার্য্য চলিয়া গেলে প্রহ্লাদের শরীর হইতে মহাশব্দে আর একটি তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদের প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল—মহারাজ ! আমি বল ; সৎকার্য্যের সহিত একসঙ্গে বাস করিয়া থাকি। এই বলিয়া বল প্রস্থান করিলে, প্রহ্লাদের দেহ হইতে পরম সুন্দরী এক দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবি ! তুমি কে ? দেবী কহিলেন, আমি লক্ষ্মী। আমি এতদিন তোমার শরীরে বাস করিতে ছিলাম ; এখন আমি বলের সঙ্গে যাইতেছি।

লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া প্রহ্লাদের মনে মহা ভয় হইল। বলিলেন—'দেবি ! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, সেই ব্রাহ্মণ কে ?' তখন লক্ষ্মী বলিলেন—'দানবরাজ ! যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র ; ত্রিলোক—মধ্যে তোমার যত ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি সমস্ত চুরি করিয়াছেন। সচ্চরিত্রতা দ্বারা তুমি ধর্ম্ম ও ত্রিভুবন অধিকার করিয়া-ছিলে ; দেবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া, তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি—আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।' এই বলিয়া লক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

আখ্যানটি শেষ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"বৎস ! আমি সংক্ষেপে এই সচ্চরিত্রতা লাভ করিবার উপায় বলিতেছি—কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা, উপযুক্ত পাত্রে দান করা ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাই সচ্চরিত্রতার লক্ষণ বলা যাইতে পারে। অতএব তুমি যদি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান হইতে ইচ্ছা কর, তবে সচ্চরিত্র হও।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

অহঙ্কারী রাজা।

এক রাজা ছিলেন; তাঁর বিশাল রাজ্য, কিন্তু তবু তাঁর রাজ্যের সখ মেটে না। দেশের পর দেশ জয় ক'রে শেষে তিনি সমস্ত দেশের সম্রাট্ হ'লেন। তখন তিনি মনে মনে অহঙ্কার ক'রে বল্‌লেন, "আমার মত বড় আর কেউ নাই।"

একদিন রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখ্‌লেন, আকাশ খুব পরিষ্কার; চারিদিকে চমৎকার জ্যোৎস্না। অমনি লোকজনদের ডেকে বল্‌লেন, "চল, আজ শিকারে যাওয়া যাক্।" রাজার খেয়াল, অমান্য করে কার সাধ্য!

শিকারী, ঘোড়া, লোকজন, সব এসে হাজির হ'লো, শিঙা বেজে উঠ্‌ল। শিকার করতে করতে রাত ভোর হ'য়ে গেল, রোদ উঠে গেল, ততক্ষণে সকলে এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়ল। রাজামশাই বল্‌লেন, "তোমরা সবাই এখানে গাছতলায় বসে বসে বিশ্রাম কর, আমি ঐ পুকুরে স্নান ক'রে আসি।"

পুকুরের ধারে এসে তিনি দেখ্‌লেন যে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল। তখন গাছের গোড়ায় ঘোড়া বেঁধে রেখে, জমকালো পোষাক ছেড়ে, তিনি জলে ডুব দিলেন। অমনি একটি লোক কোত্থেকে এসে সেখানে হাজির হ'ল, তার চেহারা ঠিক রাজামশায়েরই মতন। সে এসেই রাজার পোষাক প'রে, রাজার বর্ম্ম এঁটে, রাজার ঘোড়ায় চ'ড়ে, দে ছুট্! রাজামশাই খুব খানিক ডুব দিয়ে উঠে দেখেন তাঁর পোষাক, তলোয়ার, ঘোড়া, সব চুরি হ'য়ে গেছে। চারিদিকে কোন লোকজন নাই; ডেকেও কারো সাড়াশব্দ পেলেন না।

তখন আর তিনি কি করেন? মনে মনে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে, গামছা পরেই বনের পথ দিয়ে রওয়ানা হ'লেন। একটু পরেই তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এল; তিনি বল্‌লেন, "কাছেই আমার এক উজির আছে। এইতো সেদিন আমি তাকে উজির বানিয়ে মস্ত বড় এক বাড়ী দিয়েছি। তার কাছে গেলেই সে খুব খুসী হ'য়ে আমাকে পোষাক দেবে।"

উজিরের বাড়ী পৌঁছেই তিনি দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে দরোয়ানকে ডাক্‌লেন। দরোয়ান এসে ফটকের পিছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কে ডাকে?"

রাজামশাই বল্‌লেন, "দরজা খুলে দেখ কে আমি।"

দরোয়ান দরজা খুলে দেখেই তো অবাক! এ আবার কে দাঁড়িয়ে? সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কে তুমি?"

রাজামশাই বল্‌লেন, "চোপ্‌রাও, বেয়াদব! দেখ্‌ছিস্‌ না তোদের রাজামশাই দাঁড়িয়ে? তোর মনিবকে গিয়ে বল্‌ যে আমার সাজ পোষাক ঘোড়া হাতিয়ার সব চুরি গিয়েছে। সে এখনই আমার কাছে ঘোড়া পোষাক নিয়ে আসুক।"

দরোয়ান হেসে বল্‌ল, "বারে, গামছাধারী রাজা! আমাদের রাজামশাই এই তো আধ ঘণ্টা হ'ল তাঁর পাত্র-মিত্র নিয়ে, শিকার থেকে ফির্‌বার সময় এখানে এসেছিলেন। এই মাত্র তিনি আমার মনিবের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। যাক্‌, তবু আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি; এমন রাজাকে তাঁর একবার দেখা দরকার।" এই কথা ব'লে দরোয়ান দাড়ি নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ভিতরে গেল।



উজির মশাই আস্‌তেই রাজামশাই তাকে বল্‌লেন, "এস, আগে আমাকে নমস্কার কর। তারপর তোমার এই বেয়াদব চাকরটাকে শাসন কর। আজ আমি তোমাকে বিশেষ রকম অনুগ্রহ করতে চাই। তোমার

রাজা আজ তোমার পোষাক পরে বাড়ী যাবেন—ভেবে দেখ তোমার কত সম্মান”।

উজির চ'টে গিয়ে বল্‌লেন, “মিথ্যাবাদী! এইমাত্র আমি রাজাইমশাইকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম। দারোয়ান! এ লোকটাকে মেরে বের ক'রে দাও তো!” দারোয়ান তেড়ে দুচার ঘা দিতেই রাজামশাই সেখান থেকে মানে মানে স'রে পড়লেন—আর দারোয়ান তা দেখে হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

রাজামশাই মনে মনে বল্‌লেন, “নিমকহারাম! ওকে আমি এত বড় কর্‌লাম, আর এখন কিনা আমারই সঙ্গে ও এমন বেয়াদবী কর্‌ল! দাঁড়াও একবার সিংহাসনে ব'সে নিই, তারপর ওকে উচিত সাজা দেবো আমি। কাছেই আমার মন্ত্রীর বাড়ী; দেখি, তার ওখানে গেলে সে নিশ্চয় আমাকে চিন্‌বে।”

মন্ত্রীর বাড়ী পৌঁছে রাজা তিনবার দরজার কড়া নাড়্‌লেন। দরোয়ান এসে তখনই দরজা খুলে দিল, আর দেখ্‌ল যে একটি গামছা পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

রাজামশাই তাকে বল্‌লেন, “মন্ত্রীকে গিয়ে বল যে রাজামশাই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পোষাক আর ঘোড়া চুরি হ'য়ে গেছে। যাও, শীগ্গির পোষাক নিয়ে এস!” দারোয়ান হাস্‌তে হাস্‌তে ভিতরে গেল।

মন্ত্রীকে গিয়ে সে বল্ল, “হুজুর, ফটকের কাছে এক পাগল এসেছে। তার পরনে খালি এক গামছা, আর কথাবার্ত্তাও পাগলেরই মত। সে বলে কিনা যে আপনাকে তার কাছে যেতে হবে,—সে নাকি আমাদের রাজামশাই!”

মন্ত্রী বল্‌লেন, “চল যাই, একবার তামাসাটা দেখে আসি।”

রাজা মন্ত্রীকে দেখেই চিন্‌লেন, কিন্তু মন্ত্রী দেখ্‌লেন যে তাঁর সাম্‌নে একটা পাগল দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে কাদা মাখা; পরনে খালি একটা গামছা!

রাজামশাই বল্‌লেন, “আমাকে চিন্‌তে পেরেছ কি? আমি তোমাদের রাজা। আজ সকালেই তুমি আমার সঙ্গে শিকার কর্‌তে গিয়েছিলে। সেখানে এক পুকুরে স্নান কর্‌তে গিয়ে আমার পোষাক ঘোড়া সব চুরি হয়ে গেছে! ঐ ছোট লোক উজিরটা এত বড় বেয়াদব, আমাকে দরোয়ান দিয়ে মার খাইয়েছে!”

মন্ত্রী তাঁর চাকরদের বল্‌লেন, “এ লোকটাকে আটক ক'রে বেঁধে রাখ। এ সব পাগলকে এরকম ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আর কিছু চিঁড়ে গুড় ওকে খেতে দাও।” এই কথা ব'লে মন্ত্রী আপনার ঘরে চ'লে গেলেন। তাঁর কয়েকটি

বন্ধুকে তিনি খেতে ব'লেছিলেন—তাদের কাছে তিনি এই পাগলের পাগলামির গল্প করতে লাগলেন—

এদিকে রাজামশাই একলা অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা হয়ে প'ড়ে আছেন, কাছে কোন লোকজন নাই। তিনি মনে মনে ভাবছেন, "তাই তো, আমার হ'ল কি? এইমাত্র ছিলাম রাজা আর এরই মধ্যে এমন দুরবস্থা! আমার মন্ত্রী পর্য্যন্ত আমাকে চিনতে পারে না! কিন্তু রাজবাড়ীতে কেউ কি আমাকে চিনবে না? রাণী আছেন, মা আছেন, বুড়ো চাকর সুদর্শন আছে, তারা আমাকে চিনবে; আমার যেমন পোষাক, যেমনই চেহারা হোক না কেন।" এ ভেবে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে হাত পায়ের বাঁধন খুলে ফেললেন, আর জানালা দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। লাফাবার সময় প'ড়ে গিয়ে তাঁর হাত-পা ছ'ড়ে গেল—কিন্তু সে দিকে তাঁর হুঁস্ নেই। তিনি ছুটতে ছুটতে একেবারে রাজবাড়ীর ফটকে হাজির!

নিজের বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন তাঁকে দেখেই কেউ নিশ্চয় এসে ফটক খুলে দেবে। কিন্তু ফটক আর খোলেই না। তখন তিনি কড়া নাড়া দিলেন, আর অমনি দারোয়ান কট্‌মট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কেরে তুই? এখানে কি চাস্?"

রাজামশাই বললেন, "আমাকে চিনতে পারছিস্ না? গাধা! আমি যে তোদের রাজা! সর্ সর্ আমাকে ঢুকতে দে!" এই ব'লে যেই তিনি ঢুকতে যাবেন, অমনি দারোয়ান তাঁর ঘাড়ে ধ'রে বলল, "কি বলিস্, তুই আমাদের রাজা! তুই আমার মনিব! চল্ দেখি তোকে রাজার কাছে ধ'রে নিয়ে যাই!" ব'লেই সে রাজাকে টেনে একেবারে সভাঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। রাজামশাই দেখলেন সেখানে সিংহাসনে ঠিক তাঁরই মত এক রাজা ব'সে আছেন, আর তাঁর পাশে রাণীর সিংহাসনে রাণী ব'সে রয়েছেন!

রাজা খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে তারপর হঠাৎ রেগে বললেন, "কেরে আমার সিংহাসনে বসেছিস্? শীগ্গির নাম বলছি।" এই ব'লে হঠাৎ দারোয়ানের হাত ছাড়িয়ে তিনি সভার মাঝখানে ছুটে গেলেন।

গোলমাল শুনে সকলে চমকে উঠল, রাজারাণীও ফিরে তাকালেন। রাজামশাই চীৎকার ক'রে রাণীকে বলতে লাগলেন' "তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ শ্রীশ্রীসর্ব্বমণ্ডলাদিত্য, তুমি যে আমার রাণী।" তারপর যেই রাজা

লাফ দিয়ে সিংহাসনে উঠ্তে যাবে অমনি রাণী ভয়ে এক চীৎকার দিয়ে একেবারে অজ্ঞান।

তখন সকলে "মার মার" ক'রে রাজামশাইকে এমনি তেড়ে এল যে রাজামশাই প্রাণের ভয়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে ছুটতে সেই পুকুরের ধারে এলেন—যেখানে তিনি স্নান ক'রেছিলেন। পুকুর পারে বসে, সব ঘটনা তাঁর স্বপ্নের মত বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে কিছুই স্বপ্ন নয়, কারণ তাঁর ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ কর্‌ছিল, আর পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; একটু একটু শীতও বোধ হচ্ছিল। মাটিতে ব'সে তিনি বুক চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন, আর মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন;—

"সব দেশের রাজা হয়েছি ব'লে আমার মনে একদিন খুব অহঙ্কার হয়েছিল; তা'রই শাস্তি এখন পাচ্ছি। আমার মত হতভাগা আর কে আছে? যেখানে যাই, লোকে আমাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। ভগবান আমাকে অহঙ্কারের সাজা দিচ্ছেন।"

এ কথা বল্‌তে বল্‌তেই তিনি দেখ্‌লেন যে তাঁর পোষাক ঘাসের উপরে রয়েছে; ঘোড়াটা একটা গাছে বাঁধা। রাজামশাই তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে ঘোড়ায় চড়্‌লেন। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ীর পানে চল্‌লেন। রাজবাড়ীর ফটকে আস্‌তেই ফটক খুলে গেল, সিপাই শান্ত্রী দৌড়ে এল। একজন ঘোড়া ধর্‌ল, আরেকজনে তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিল। দরোয়ান তাঁকে নীচু হয়ে সেলাম করে বল্‌ল, "কি আশ্চর্য্য! মহারাজ কখন বেরুলেন, কোথায় গেলেন, আমরা তার কিছুই টের পাইনি!"

সভাঘরে ঢুক্‌তেই পাত্রমিত্র সকলেই উঠে এসে রাজাকে নমস্কার কর্‌ল; রাণীও অমনি তাঁর সিংহাসনে বস্‌তে এলেন! মনে হ'ল সবাই যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিল। রাজামশাই অবাক্ হ'য়ে অন্যমনস্ক ভাবে সিংহাসনে উঠে বস্‌তেই তাঁর মনে হ'ল কে যেন তাঁর কাণে কাণে বল্‌ছে, "কেমন? আর অহঙ্কার কর্‌বে? আমি দেবদূত। তোমার অহঙ্কার ভেঙে দেবার জন্যই তোমার সঙ্গে একটু তামাসা কর্‌লাম। অহঙ্কারীর রাজা হওয়া সাজে না;—তা' হ'লে প্রজাদের কষ্ট হয়।" রাজামশাই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না—খালি মনে হ'ল যেন সাদা পোষাক পরা কি একটা উজ্জ্বল মূর্ত্তি সেখান থেকে স'রে গেল।

তারপর সেই রাজামশাই বহুদিন রাজত্ব কর্‌লেন; কিন্তু একদিনও তাঁর মনে অহঙ্কার আসে নি।

শ্রীসুবিনয় রায়।

কুকুরের গল্প

কুকুরের প্রভুভক্তির কথা তোমরা সকলেই জান। আজ তারই দু একটা সত্য গল্প তোমাদের কাছে বল্‌ব।

এক ধনী সাহেবের কুকুরের নাম ছিল 'ফিডো'। ছোট খাট কুকুরটি ভারি চালাক —সাহেব তাকে বড় ভাল বাস্‌তেন। একদিন সাহেবকে সহরে যেতে হবে—ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবেন। গ্রাম থেকে সহর দূরে তাই ঘোড়ায় রোয়ানা হয়েছেন। মোহরের দুটি থলি গদির সঙ্গে বাঁধা। ফিডো ঘোড়ার পিছন পিছন ছুটে চলেছে।

দুপুর রোদ, ভারি গরম আবার রাস্তায় বেজায় ধূলো; ঘোড়ার পিছনে ছুটে ছুটে ফিডো কাহিল হয়ে পড়েছে। সাহেবও ভাবছেন—একটু ছায়া পেলে বিশ্রাম কর্‌বেন। ক্রমে একটা বনের মধ্যে এসে, বেশ ঠাণ্ডা একটা জায়গায় গাছের ছায়ায় সাহেব ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর তাকে গাছে বেঁধে মোহরের থলি দুটি খুলে মাটিতে রেখে তার উপর মাথা দিয়ে সাহেব শুলেন। ফিডোকে বল্লেন—"ফিডো! থলির উপর নজর রাখিস্।" এই বলে খানিক পরেই তিনি ঘুমালেন। ফিডোর চোখেও ঘুম আস্‌ছিল কিন্তু থলি পাহারা দিবে কে? তাই সে একটা থলির উপর নাক রেখে শুয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে আবার মিট্ মিট্ করে চেয়ে দেখে।

সাহেব ক্লান্ত হয়ে শুয়েছেন তাই অনেকক্ষণ ঘুমালেন। ফিডো দেখ্‌ল, মুনিব আর ঘুমালে চল্‌বে না—ভয়ানক দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। তখন সে মুনিবের গাল চাট্‌তে চাট্‌তে তাঁকে জাগিয়ে দিল। সাহেব জেগে উঠেই দেখেন সর্ব্বনাশ! বেলা প্রায় শেষ, ব্যাঙ্ক খোলা পাওয়া যায় কিনা যায়। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে ফিডোকে ডেকেই ঘোড়া ছুটালেন। এদিকে ফিডোর কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাবার আদবেই ইচ্ছা নাই। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার পায়ে কামড়াচ্ছে আবার ঘেউ ঘেউ কর্‌তে কর্‌তে বনের দিকে ছুটে আস্‌ছে; আবার যাচ্ছে আবার ফিরে আস্‌ছে—ক্রমাগত খালি এ রকমই কর্‌তে লাগ্‌ল। এ সব দেখ্‌বার সময় তখন সাহেবের নাই, বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে। তিনি ভাব্‌লেন—ফিডো আস্‌বে এখন; এই ভেবে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত দুঃখিত ও নিরাশ হয়ে রাস্তার ধারে বসে বেচারি ফিডো দেখ্‌তে লাগ্‌ল—ঐ প্রভু চলে যাচ্ছেন। ক্রমে সাহেব যখন একটা মোড় পার হয়ে গেলেন, আর তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ফিডো এক লাফে উঠেই আবার দে ছুট।

বনের পরে খানিক দূর গিয়ে একটা ঝরণা ছিল। সাহেব সেখানে এসে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবার জন্য রাশটা একটু ঢিলে দিয়ে থামিয়েছেন—এমন সময় ফিডো এসে উপস্থিত। এসেই ঝরণার ধারে দাঁড়িয়ে ভীষণ ঘেউ ঘেউ কর্‌তে লাগ্‌ল। সাহেব তাকে কত ডাক্‌লেন, তার দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিডো তাঁর কাছে এল ত নাই বরং চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে সেই বনের দিকেই আবার ফিরে চল্‌ল!



সাহেব মনে কর্‌লেন—কুকুরটা কি পাগল হলো? তাই ত বুঝি সে জল দেখে ছুটে পালাচ্ছে? এই ভাবছেন এমন সময় ফিডো হঠাৎ ফিরে এসে ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠে তাঁর জুতোর ডগায় এক কামড় দিয়ে আবার তখনই ঘেউ ঘেউ কর্‌তে কর্‌তে সেই বনের দিকে ছুটে চল্ল। এবার আর গৃহস্থের মনে কোন সন্দেহ রইল না—কুকুর নিশ্চয় পাগল হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিস্তল নিয়ে ফিডোকে গুলি

কর্‌লেন। প্রিয় কুকুরের মৃত্যু পাছে দেখ্‌তে হয় এই ভেবে গুলি করেই ঝরণা পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

খানিক দূর গিয়েই সাহেব হঠাৎ ঘোড়া থামালেন। সর্ব্বনাশ! মোহরের থলিত নাই! তবে কি পথে পড়ে গেল? না কি যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন সেখানেই ফেলে এসেছেন? ভাবলেন, নিশ্চয় বনের মধ্যেই ফেলে এসেছেন। তাড়াতাড়ি আস্‌বার সময় যে থলি দুটি তুলে নিয়েছিলেন তাত মনে পড়ছে না? সাহেব তখনই ঘোড়া ফিরিয়ে আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটালেন। ঝরণার ধারে এসেও বেচারি ফিডোকে দেখ্‌তে পেলেন না। ঝরণা পার হয়ে দেখ্‌লেন রাস্তায় ফোটা ফোটা রক্তের দাগ! যত যাচ্ছেন ততই রক্তের ফোটা। তাঁর চখে জল এল, গুরুতর অপরাধ করেছেন ভেবে ভারি দুঃখ হলো; তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, ফিডো কেন ওরকম করেছিল। ফিডো জান্‌ত যে তিনি তাড়াতাড়িতে মোহরের থলে ফেলেই চলে যাচ্ছিলেন; এবং সে কথা তাঁকে বুঝাবার জন্যই বেচারি নানা উপায়ে চেষ্টা করেছিল।

সমস্তটা রাস্তায় রক্তের ফোটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি বনে সেই বিশ্রামের জায়গাটিতে এলেন। তখন দেখ্‌লেন কি? মোহরের থলি দুটির উপর মাথাটি রেখে বিশ্বাসী ফিডো মরার মত পড়ে আছে! সাহেবের তখনকার দুঃখ বর্ণন করার সাধ্য নাই! যাহোক্, সুখের বিষয় ভগবানের কৃপায় অনেক যত্নে ও শুশ্রূষায় আবার ফিডো ভাল হয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল।

(২)

ফ্রান্সের সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নাম তোমরা বোধ করি অনেকেই শুনেছ। এক সময় ইউরোপের সমস্ত দেশের সঙ্গে নেপোলিয়ান যুদ্ধ করেছিলেন। নেপোলিয়নের নিয়ম ছিল, যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা বেড়িয়ে দেখ্‌তেন।

একবার অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের ভীষণ এক যুদ্ধ হয়। অনেক ঘণ্টা পর্য্যন্ত দারুণ যুদ্ধ হয়ে তাঁহার জয় হলো। সে যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত যে সৈন্য মরেছিল তার সীমা সংখ্যা নাই। যুদ্ধ জয়ের পর নেপোলিয়ন বিষণ্ন মনে ঘুরে ঘুরে মৃতের সংখ্যা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এক স্থানে অনেক যোদ্ধা মরে একত্র পড়েছিল; সেখানে এসে নেপোলিয়ন এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌তে পেলেন—একজন মৃত অষ্ট্রিয়ান সেনাপতির বুকের উপর দুখানি পা রেখে তাঁর ছোট্ট কুকুরটি একদৃষ্টে তাঁর

মুখের দিকে চেয়ে আছে—যেন দেখ্‌ছে প্রভুর ঠোঁট নড়ে কিনা, চোখে পলক পড়ে কিনা। সে এতই মন দিয়ে দেখ্‌ছিল যে, অনুচরগণের সঙ্গে নেপোলিয়ন যে সেখানে এসেছেন, সে জান্‌তেই পার্‌ল না।



একজন সঙ্গীকে ডেকে নেপোলিয়ান এই দৃশ্য দেখালেন। তখন তাঁর গলার আওয়াজ শুনে কুকুর তাঁর দিকে তাকাল এবং এমন ভাবে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল যে, যেন সে বুঝতে পেরেছে তিনিই সম্রাট্‌ এবং তাঁর কাছেই সাহায্য পাওয়া যাবে। নেপোলিয়নের মনে যথেষ্ট দয়া মায়া ছিল, তিনি এই প্রভুভক্ত কুকুরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য কর্‌লেন না। অবশ্যি কুকুরের মৃত প্রভুর আর কি উপকার কর্‌বেন? তিনি যত্ন ক'রে তার সমাধি দেওয়ালেন। তাঁর আদেশে আহত অষ্ট্রিয়ানদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। আর তাঁর এক অনুচরের উপর আদেশ হলো, সে নিজে এই প্রভুভক্ত কুকুরের সেবা কর্‌বে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

গ্লাটন

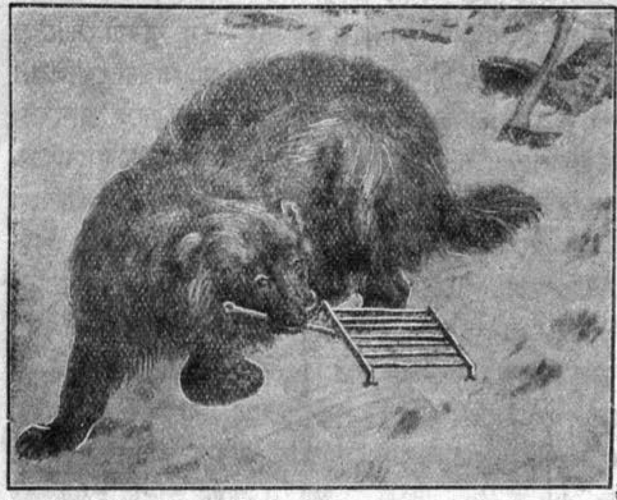
কতবার বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর একটি জন্তুর কথা বলিতে হয় তাহার নাম গ্লাটন্। চুরি বিদ্যায় ফাঁকি বিদ্যায় খাওয়া বিদ্যায় এবং নানা রকম ধূর্ত্ত বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানা রকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে, তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন্ আসিয়া ফাঁদেপড়া জন্তুগুলাকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখন ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মত ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলাকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ড ভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে, গ্লাটন আসিয়াছে! এই গ্লাটনকে না মারা পর্য্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার খালি তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে গ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম্ম সে ভাল করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সুতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময়ে নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোন শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এই রকম জ্বালাতন করিয়াছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত—আর প্রতিদিনই আসিয়া দেখিত, চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, আর ফাঁদগুলি ভাঙ্গা! তাহাতে দু চারটা শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানারকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একই রকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মত খানিকটা ফাঁক, তাহার

পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিশুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর শিকারী খোলা বরফের উপর এক টুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সুতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিলেন—যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সুতায় টান পড়িয়া বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকান। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই। শিকারী আরো বেশী মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ বেশীক্ষণ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে, কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির আড়ালে থাকিয়া সুতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল, কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল যেমন করিয়া হউক এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে তাঁবুর জিনিষ পত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিষ চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ! তারপর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানাস্থান হইতে চোরাই জিনিষ সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক। সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (glutton) কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মত, চেহারাটাও তাহার চাইতে বড় নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটাত আগেই শুনিয়াছ। সে যে কি রকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিষ সে খায় না,

যাহার ব্যবহার সে জানে না, এবং যে জিনিষে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিষও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথ্‌ব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি ঘটিবাটি বা উনানের লোহার শিক পর্য্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।



গ্লাটনের আর একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে, এবং সামনের পা দুখানা চোখের উপরে এমন ভাবে উঠাইয়া ধরে—যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভাল করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রকম বুদ্ধি আর এই সব অদ্ভুত রকম সকম দেখিয়া সে দেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চাল চলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার! ইহাতে বুঝিতে পার যে এই ছোট জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কি রকম ভয় করে।

হিন্দুস্থানী গল্প

(১)

এক ছিল রাজা আর এক ছিল রাণী। রাজা এক খুব বড় রাজা, লোক লস্কর হাথী ঘোড়া, গাড়ী, চৌদোলা। কিন্তু রাজার ছেলেও হয় না মেয়েও হয় না। রাজা তাই ভারী দুঃখে থাকেন। রাণী বলেন—কি কর্‌বে, নারায়ণজীর ইচ্ছে নেই যে ছেলে হয়।

(২)

একদিন বেশ গরম পড়েছে, ভোর বেলা রাজা বাইরের চাতালে গিয়ে বস্‌লেন। রাজার গায়ে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে এমন সময় এক ধোপা এক পুটলি ময়লা কাপড় নিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। রাজার ওপর তার চোখ পড়তেই সে রাস্তারই ওপরে পুটলিশুদ্ধ কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে বল্‌লে, "হায়! হায়! আজ সকালেই এই অলুক্ষুণে রাজার মুখ দেখ্‌তে হ'ল। আজ যদি দিনটা ভাল না কাটে তবে রাজাকে মজা দেখাব"। রাজা এই কথা শুনে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন আর তাঁর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। বল্‌লেন "আমার মাথা ধরেছে"। কত লোকে কত কি বল্‌ল রাজা শুন্‌লেনই না। শেষে রাজার যে বুড়ো রাঁধুনে বামন সে এসে রাজাকে ধ'রে বস্‌ল। বল্‌ল "মহারাজ, যদি মাথা ধরে থাকে তো খান্‌দান্‌ ঘুমোন। নাতো আর রাজা কিসে"। মহারাজ তখন সেই বামনকে একে একে সব কথা বল্‌লেন। বামন শুনে বল্‌ল, "মহারাজ কিছু ভাববেন না। আমি বলছি, আর এক বছরের মধ্যেই আপনার নিশ্চয় একটী মেয়ে হবে"। রাজা বল্‌লেন, "না! আমায় ওসব ব'ল না। ধোপা যে এত ছোট লোক, সেও কিনা বলে, আমার মুখ দেখলে তার দিন ভাল যাবে না। আর দিন ভাল না কাট্‌লে আমায় গাল দেবে। আমি আজিই কলসী গলায় দিয়ে ডুবে মরব"। বামন বল্লে "না মহারাজ, সত্যিই আপনার মেয়ে হবে"। এই রকম বার বার বল্‌তে তবে মহারাজ খুসী হলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন খেলেন দেলেন।

এদিকে বুড়ো বামন রাণীর কাছে গেল, গিয়ে রাণীকে সব কথা বল্‌ল। ব'লে বল্‌ল, "তুমি সোণার খাটে সকাল বিকেল শুয়ে থাকবে, আর রাজাকে দেখলেই বলবে যে তোমার অসুখ করেছে। আমরা রাজাকে বলব যে শীগ্গির তোমার ছেলে হবে"! রাণী বল্লেন "ও বাবা! রাজা যদি সত্যি কথা জানতে পারেন তাহলে আমার গলাই কেটে দেবেন। আমি তা পারব না"। বামন বল্‌লে "সে কি কথা! তা না করলে তুমি রাজাকে পাবে কোথা? রাজা যে এদিকে মনের দুঃখে জলে ডুবে মরে যাবে।" সেই কথা শুনে রাণী শেষটায় রাজি হল। কি করে?

(৩)

এমনি ক'রে সব ঠিকঠাক হ'ল। রাণী তাঁর সোণার খাটে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। রাজা বল্লেন "রাণীর হঠাৎ অসুখ করল কেন"? বামন বল্লে "মহারাজ! রাণীমার ছেলে হবে তাই অমন অসুখ করছে"। রাজা শুনে খুব খুসী হ'লেন। তারপর

দিন যায় মাস যায়। দেখতে দেখতে দশটি মাস কেটে গেল। তখন বামন করলে কি কোথা থেকে এক বুড়ি দাই এনে তাকে হাত ভ'রে মোহর দিল—আর তাকে বলল যে "তুমি রাণীর কাছে দুদিন থাক, তারপর সহরে রটিয়ে দাও যে রাজার এক খুব সুন্দর মেয়ে হয়েছে। তত সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখা যায় না। গোলাপ ফুলের মত সুন্দর"। সেই বুড়ী তখন সহরময় বলে বেড়াল যে রাজার যা সুন্দর মেয়ে হয়েছে অমন সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখা যায় না। যেন গোলাপ ফুল"। সবাই বল্লে, "বাঃ এতদিনে রাজাটার কপাল ফিরল। এতদিনে এক মেয়ে হয়েছে। সে মেয়েও নাকি গোলাপ ফুলের মত সুন্দর"।

এদিকে রাজা মেয়ে দেখতে চাইলেন। বামন বল্লে, "মহারাজ আপনার এখনো মেয়ে দেখাবার সময় হয়নি"। রাজা ভাবলেন, তাতে আর কি এসে যায়। না হয় কদিন পরেই দেখব। আর ত লোকের নিন্দে শুন্‌তে হবে না। এদিকে বামুন এক বেরাল ছানা নিয়ে এল। এনে তার পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিল। সে বেরাল ছানা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল আর ঘুঙুরের শব্দ হ'তে লাগ্‌ল, রাজা বামনকে জিজ্ঞেস করলেন যে ঝুনুক ঝুনুক কিসের শব্দ হচ্ছে ঠাকুর? বামন বল্লে মহারাজ, আপনার মেয়ের পায়ের মলের শব্দ হচ্ছে। রাজা ভাব্‌লেন দেখ কেমন আমার মেয়ে হয়েছে।

(৪)

এম্নি ক'রে রাজা যখনই মেয়ে দেখতে চান্ বামন তাঁকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। বলে এখনও সময় হয়নি। তারপর বারো বছর পরে একদিন বামন বল্ল, মহারাজ মেয়ের বিয়ে দিন। মেয়ে বড় হয়েছে। রাজা তাই শুনে বর খুঁজতে বার হলেন। শেষে খুব বড় এক রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ কোরলেন। আর বরও ভারী সুন্দর দেখতে। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা, লোকজন সঙ্গে নিয়ে আলো টালো জ্বেলে, বাজ্‌না বাদ্যি বাজিয়ে বর এল। তারপর বিয়ে হবার সময় বরযাত্রীরা অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। আর বর ভেতরে ঢুকল। ঢুকতেই রাণী বরের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বল্লে "আমার মান ইজ্জত তোমার হাতে"। পরে বরকে সব কথা বল্‌ল। বর তো কথা শুনে চম্‌কে উঠল। বল্লে "আমি এত করে ধুমধাম করে সেজেগুজে এলাম আর কিনা বউ নেই। আমি বিয়ে করবার জন্যে বাড়ীর ভেতর ঢুকেছি আর কিনা আমার শাশুড়ী আমার পায়ে পড়ছে। ছি ছি কি লজ্জার কথা! হায় হায়! আমি ফিরে গেলে আমার বাপ মাই বা কি বল্‌বে"। কিন্তু বর কাউকে কিছু বল্‌ল না। বর ভাল ছিল। তখন রাণী

একটী মস্ত লাউকে জামাজোড়া চুনরী উনরী পরিয়ে, গহনাগাটী পরিয়ে তার সঙ্গে বরের বিয়ে দিয়ে দিল। বরের ভারী দুখ্‌খু। বিয়ে হোয়ে গেলে বরের বাপ বল্লে, আমি তবে এখন বর কনে নিয়ে যাচ্ছি। তাই শুনে বামন বল্লে, "না মহারাজ, এ হোতে পারে না। আমাদের দেশের এই প্রথা হচ্ছে যে বর বউ চারদিন কনের বাড়ীতেই থাক্‌বে, তারপর বরের বাড়ী যাবে। তা শুনে বরের বাপ চলে গেল। তখন বর গিয়ে এক খাটে বস্‌ল। রাজা তার পাশে বসলেন আর বামন সেই সাজান লাউটীকে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দিল। বর বসে বসে ভাবতে লাগ্‌ল, আমি বাড়ী গেলে আমার মা বাপ কি বল্‌বে। আমি এত বড় রাজপুত্র আর আমার ভাগ্যে এই! হে নারায়ণজী! রাণীও তখন বাইরে বসে কাঁদছে আর বল্‌ছে, "হে নারায়ণজী"! রাজা এদিকে তখন ঘুমে ঢুলছে।



এমন সময়, সেই লাউটা ফেটে গেল আর তার ভেতর থেকে একটী গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মেয়ে বার হয়ে এল। সে মেয়েটী চুনরী উনরী জামা-জোড়া গহনাগাটী সব প'রেছিল। বরের তাকে দেখে আনন্দ হল কিন্তু কিছু বল্‌লে

না, চুপ কোরে বসে রইল। এমন সময় রাণী আর বামন সেখানে এল। বামন মেয়েটীকে দেখেই বলে উঠল "দেখ রাণী মেয়ে হল কিনা। তোমার মান ইজ্জত রইল কিনা। দেখ মেয়ে কেমন সুন্দর"। এমন সময় রাজাও মেয়েটীকে দেখ্‌তে পেলেন। তিনি মেয়েকে দেখেই কোলে তুলে নিলেন। নিয়ে বল্লেন, আহা! এত সুন্দর আমার মেয়ে। এই মেয়েকে আমি শ্বশুরবাড়ী পাঠাবনা। বামন বল্লে, না মহারাজ সে কি হয়, মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতেও থাক্‌বে, বাপের বাড়ীতেও থাক্‌বে। রাণীও মেয়ে দেখে খুব খুসী হলেন। তারপর চারদিন পরে বরের বাপ এল। এসে বর বউকে ধূমধাম কোরে নিয়ে গেল। রাজা, রাণী, বর, বামন সবাই খুব খুসী হলেন।

শ্রীমতী রাণু

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

মঙ্গল গ্রহ

সূর্য্যের সকলের চেয়ে কাছে বুধ গ্রহ, তার পরে শুক্র, তারপর পৃথিবী। পৃথিবীর পরে মঙ্গল গ্রহ। খালি চোখে তাহাকে বেশ উজ্জ্বল ও লাল্‌চে রঙ্গের দেখায়। অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে তাহার বিশেষ তফাৎ আছে, বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে তাহার চেহারা একটু আশ্চর্য্য রকমের। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু খুব উজ্জ্বল সাদা কোন জিনিষে ঢাকা, বাকী অধিকাংশ অনেকটা কমলা রঙ্গের, তাহার মাঝে মাঝে কোথাও হাল্কা, কোথাও গাঢ় নীল কিম্বা সবুজ রং। কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা এই, যে তাহার গায়ে সরু সরু কাল কাল অনেক দাগ আছে। কোন বড় রাস্তার মোড়ে, যেখানে অনেক ট্রামের লাইন মিশিয়াছে, এই রকম কোন জায়গায় দাঁড়াইয়া, উপরের দিকে চাহিলে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামের তারগুলি যেমন দেখা যায়, এই দাগগুলি দেখিতে কতকটা সেই রকম! যেখানে কতকগুলি দাগ একত্র হইয়াছে, সেখানে আবার একটা কাল গোল দাগ; দেখিলে মনে হয়, যেন ইচ্ছা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এ গুলিকে করা হইয়াছে। এই অদ্ভুত দাগগুলি কোথা হইতে আসিল, ভিন্ন

ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন রং কেন, এবং মেরু প্রদেশের ঐ উজ্জ্বল জিনিষটাই বা কি, তাহা লইয়া এত দিন অনেক আলোচনা ও তর্ক হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহে মানুষের ন্যায় কোন বুদ্ধিমান জীব আছে, ঐ কাল দাগগুলি তাহাদেরই কার্য্য।



মঙ্গলে ও আমাদের পৃথিবীতে জলবায়ু হিসাবে বিশেষ তফাৎ নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহার পক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সূর্য্যের উত্তাপ পৃথিবীর উপর যেমন ভাবে কাজ করে, মঙ্গলের উপরেও প্রায় সেইরূপ করে; কাজেই পৃথিবীর ন্যায় এখানেও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু আছে। এই গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণে যে উজ্জ্বল সাদা আছে, তাহা শীতকালে বাড়ে ও গ্রীষ্মকালে ছোট হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ সাদা জিনিষ বরফ ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ যে কারণে বরফে ঢাকা, ইহার মেরুও ঠিক সেই কারণে বরফে ঢাকা। বরফ যখন আছে, তখন মঙ্গলের আকাশে মেঘও আছে এবং মেঘের নীচে সমুদ্র আছে। লাল রংএর মাঝে মাঝে যে ঠাণ্ডা সবুজ রং, তাহাই সমুদ্র। যে স্থান অধিক গভীর, সেখানের রংও গাঢ়। বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠিলে পৃথিবীর সমুদ্রকেও ঠিক এই রকম দেখায়। কোথাও রং এত হাল্কা, যে জলের নীচের মাটি স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের একটা বিশেষ প্রভেদ এই, যে সেখানে জলের চেয়ে মাটিই বেশী। সমুদ্র গুলি খুব বড় বড় হ্রদের মত। সেখানকার নারাঙ্গী রঙ্গের মাটি দেখিয়া মনে হয়, যেন জলের অভাবে উহা মরুভূমির মত হইয়া আছে। কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলা যায়? আমরা আমাদের ছোট পৃথিবী দেখিয়া সমস্ত জগতের ধারণা করিতে চাই। সেখানে হয়ত গাছের পাতা

সুন্দর লাল্‌চে রঙ্গের। আমরা আমাদের সবুজ গাছ পাতা দেখিয়া যত খুসী হই, মঙ্গলের লোকেরা হয়ত তাহাদের গাছ পাতা দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করে।

এখন সেই আশ্চর্য্য দাগগুলিকে আর তত আশ্চর্য্য মনে হইবে না। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে তাহারা সমুদ্রগুলিকে পরস্পরের সহিত যোগ করিয়াছে। জলের অভাব যেখানে, সেখানে মানুষ সুখে থাকিতে পারে না। তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে মঙ্গল গ্রহের জীবেরা জলের কষ্ট দূর করিবার জন্য বড় বড় খাল কাটিয়াছে এবং যেখানে কতকগুলি খাল মিলিয়াছে, সেখানে এক একটি সহর বসাইয়াছে, এই-গুলিকে আমরা সরু সরু এবং গোল গোল দাগের মত দেখিতে পাই। যাহারা এত বড় খাল কাটিতে পারে, তাহাদের না জানি কত অসাধারণ শক্তি। তাহাদের বিষয় আমরা এখনও কিছু জানিতে পারি নাই; কিন্তু হয়ত তাহারা অনেক পূর্ব্বেই আমাদিগকে চিনিয়া রাখিয়াছে।

মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, কাজেই সেখানে জিনিষ হাল্কা। এখানে লোকের ওজন এক মণ, সেখানে তাহার ওজন প্রায় কুড়ি সের হইবে। কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া হুগলী যাইতে হইলে কত পরিশ্রম হয়, কিন্তু সেখানে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রাস্তা অনায়াসে যাওয়া যায়। ছোট বলিয়া মঙ্গলের ভিতরের আগুণ প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, সেইজন্য সেখানকার লোকেরা আমাদের মত এত ভূমিকম্প দেখিতে পায় না। আমাদের আকাশে রাত্রে একটি চাঁদ ওঠে, তাহাদের আকাশে দুই চাঁদ, একটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ও অপরটি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘোরে। আমাদের এক মাসে এক বার পূর্ণিমা ও এক বার অমাবস্যা হয়; তাহাদের একটি চাঁদের এক দিনের মধ্যেই পূর্ণিমা অমাবস্যা হইয়া যায়। আর তাহাদের দুই চাঁদে মিলিয়া যে কতবার চন্দ্রগ্রহণ করে তাহার ত ঠিকই নাই। তাহাদের আকাশে আমাদের পৃথিবী সন্ধ্যাতারা। তাহারা আমাদের এই নীল সমুদ্র এবং সবুজ গাছ পালায় ঢাকা পৃথিবীকে উজ্জ্বল হাল্কা সবুজ রঙ্গের দেখিতে পায়। পৃথিবীর লোক যেমন অন্ধকার রাত্রে লাল মঙ্গল গ্রহকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখে, মঙ্গলের লোকেরাও হয়ত সন্ধ্যার সময় লাল আকাশে এই উজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তেমনই অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

"জোয়ান্"

সে প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার কথা। ফরাসি জাতির তখন বড়ই দুঃখের দিন। দেশের রাজা হ'লেন পাগল—আর অপদার্থ রাজপুত্র সারাদিন আমোদেই মত্ত। দেশের মধ্যে কোথাও শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই—চারিদিকে কেবল দলাদলি আর যুদ্ধবিবাদ। ঘরের শত্রু দেশের লোক, তার উপর বাইরের শত্রু ইংলণ্ডের রাজা। দেশশুদ্ধ সবাই দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ইংরাজরাজ দলবলশুদ্ধ ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে একধার থেকে দেশটা দখল করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁকে বাধা দিবার কেউ নাই। এমনই দেশের দুর্দ্দিন।

ফ্রান্সের এক নগণ্য গ্রামের সামান্য এক কৃষকের মেয়ে, তার নাম জোয়ান্। সমস্ত দেশের দুঃখ যেন এই মেয়েটির প্রাণে এসে বেজেছিল। ফ্রান্সের লোক জন, ফ্রান্সের পাহাড় নদী, ফ্রান্সের ঘর বাড়ী, সব যেন তার আপনার জিনিষ ছিল। ফরাসিবীরদের আশ্চর্য্য কাহিনী শুনতে শুনতে তার উৎসাহ আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠ্ত, আর ফরাসিদের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের জল আর ফুরাত না। ফ্রান্সকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আর ভালবাসত তার আপনার গ্রামটিকে। সেই মিউজ্ নদীর ধারে ছোট্ট ডম্‌রেমি গ্রামটি, তার গির্জ্জার গায়ে কত সাধু "সেইন্ট্" কত মহাপুরুষের পাথর মূর্ত্তি। সেখানে সারাদিন গির্জ্জার ঘণ্টা বাজে আর গির্জ্জার জানালা দিয়ে রঙীন্ আলো বাইরে আসে। সেখানে বুড়ো ওক্ গাছ আছে, আর দেবতার কূয়ো আছে, তাদের সম্বন্ধে কত আশ্চর্য্য গল্প লোকের কাছে শোনা যায়। জোয়ানের কাছে এ সমস্তই সুন্দর আর সমস্তই সত্যি ব'লে মনে হ'ত। সে অবাক হ'য়ে গির্জ্জার কাছে বাগানে এসে বসে থাকত, আর ভাবত কে যেন তাকে ডাক্‌ছে। দেশের দুঃখে সে যখন কাঁদত, তখন কে যেন তাকে বল্‌ত "ভয় নাই, জোয়ান! তোমার এ দুঃখ আর থাকবে না"। জোয়ান চেয়ে দেখত কোথাও কেউ নাই, খালি সেণ্ট্‌মাইকেলের ঝক্‌ঝকে সুন্দর মূর্ত্তিটি যেন তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কারা যেন আলোর পোষাক প'রে তার কাছ দিয়ে চলে যেত। জোয়ান কিছু বুঝ্‌ত না, কেবল আনন্দে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্ত, তার দুচোখ বেয়ে দরদর ক'রে জল পড়ত। এমনি ক'রে কত দিন যায়, একদিন হঠাৎ সে শুন্‌ল কে যেন তার নাম ধরে ডাক্‌ছে। অতি মধুর অতি সুন্দর গলায় কে যেন বল্‌ছে "জোয়ান্!

দুঃখিনী জোয়ান্! ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা জোয়ান্! তুমি ওঠ। তোমার দেশকে বাঁচাও; রাজপুত্র আমোদে বিলাসে ডুবে আছেন, তাঁকে উৎসাহ দাও; সৈন্যদের মনে নূতন সাহস জাগিয়ে তোল; রাজমুকুট রাজাকে ফিরিয়ে এনে দাও"। জোয়ান্ স্তব্ধ হ'য়ে সব শুনতে লাগল। সে যেন সত্যিসত্যিই দেখল সে আর সেই সামান্য কৃষকের মেয়ে নয়। তার মনে অদ্ভুত সাহস আর শক্তি এসেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল যে ফ্রান্সের সৈন্য আবার বিপুল তেজে যুদ্ধ করছে, আর সে নিজে অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে তাদের আগে আগে চলেছে।



এ কি অদ্ভুত কথা! সামান্য চাষার মেয়ে, সে না জানে লেখা-পড়া, না জানে সংসারের কিছু. তার উপর এ কি অসম্ভব আদেশ! কিন্তু জোয়ানের মনে আর কোন সন্দেহ হ'ল না। সে সকলকে বল্‌ল "আমায় রাজার কাছে নিয়ে চল"। একথা যে শোনে সেই হাসে, সেই বলে "মেয়েটা পাগল"। তার বাবা বল্লেন "মেয়েটার বড় সাহস বেড়েছে, কোন্ দিন বিপদ ঘটাবে দেখছি"। গ্রামের যে সর্দ্দার সে বল্‌ল "মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে বন্ধ ক'রে রাখ"। গির্জ্জার যে বুড়ো পাদ্রি সেও এসে জোয়ানকে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেল। কিন্তু জোয়ান তবু তার সেই এক কথাই বলে "আমি

রাজার কাছে যাব"। যা হোক্ শেষে জোয়ানের কথাই ঠিক হ'ল। ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে, কত বাধা বিপদের ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই শ' মাইল পথ পার হ'য়ে একদিন সে সত্যি সত্যিই রাজদরবারে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে সে রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্‌ল "আমি চাষার মেয়ে জোয়ান্। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন শুধু এই কথা বলবার জন্য যে, রীম্‌স্ নগর জয় করে আবার তুমি রাজা হবে।" পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে, তার মুখে এমন কথা শুনে, সভাশুদ্ধ হেসে অস্থির। কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই—তিনি জোয়ানের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছেন আর তাঁর মনে হচ্ছে—এ মেয়ে বড় সামান্য মেয়ে নয়; এ যা বল্‌ছে তা সত্যি হবে। তখনই হুকুম হ'ল "সৈন্যেরা সব প্রস্তুত হও আবার যুদ্ধে যেতে হবে। ঈশ্বরের দূত জোয়ান তোমাদের সেনাপতি হবেন"।

তারপর মহা উৎসাহে সব ফিরে চল্‌ল। যেদিকে ইংরাজ সৈন্য গ্রাম নগর সব দখল ক'রে পথঘাট আগ্‌লিয়ে আছে সেই দিকে সবাই চল্‌ল। ঝক্‌ঝকে সাদা বর্ম্ম পরে যোদ্ধার বেশে চাষার মেয়ে তাদের আগে আগে চলেছে। তার হাতে সাদা নিশান, তার উপর সোনালী-কাজ-করা যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি। চারিদিকের গ্রামবাসীরা এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে এল—তারা জোয়ান্‌কে ঘিরে আনন্দে কোলাহল ক'রে বলতে লাগল "দেবতার মেয়ে জোয়ান্! দেবতার মেয়ে জোয়ান্"! এমনি ক'রে সকলে মিলে অর্লেয়াঁ সহরে ইংরাজের শিবিরের সামনে উপস্থিত হ'ল। সেইখানে এসে জোয়ান্ ইংরাজের কাছে এই খবর পাঠাল, "তোমরা আমার কথা শোন। নগরের চাবি আমার কাছে দিয়ে তোমরা এ সহর ছেড়ে চ'লে যাও, এদেশ ছেড়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও। যদি না যাও তবে আমি তোমাদের দুর্গ ভেদ ক'রে যাব আর চারিদিক এমন তোলপাড় ক'রে তুলব যে হাজার বছর কেউ এদেশে তেমন কাণ্ড দেখেনি।" ইংরাজ হেসে বল্লেন, "চাষার মেয়ে, চাষবাস গরুবাছুর নিয়ে থাক।" কিন্তু জোয়ান তার দলবলশুদ্ধ যখন ইংরাজ শিবির আক্রমণ করলেন, তখন তার অদ্ভুত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখে ইংরাজের সাহস ও বুদ্ধিবল সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কেবা তখন যুদ্ধ করে, কেবা ফরাসি সৈন্যের সামনে দাঁড়ায়—দু'একবার মাত্র আক্রমণের বেগ সহ্য ক'রে ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক সপ্তাহ মধ্যেই অর্লেয়াঁ সহর উদ্ধার হ'য়ে গেল। এই সংবাদ যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল তখন ফরাসিদের মনে কি যে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, তার আর বর্ণনা হয় না।

কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের হিংসুকে মন গুলো হিংসায় জ্বল্‌তে লাগল। তাঁরা এত দিনে যা করতে পারলেন না, একটা কোথাকার পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে কিনা তাই ক'রে দিল। তাঁরা ভিতরে ভিতরে নানারকম শত্রুতা ক'রে জোয়ানের কাজে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা শত্রুতা ক'রে আর কি করবেন—সৈন্যেরা তখন জোয়ান্‌কেই মানে, দেশের লোক জোয়ানের কথাই শোনে, জোয়ানকে তারা দেবতার মত ভক্তি করে। এম্নি ক'রে জোয়ান গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর, উদ্ধার করতে করতে তাঁর সেই পুরান ডম্‌রেমি গ্রামের কাছে এসে পড়লেন। গ্রামের লোকেরা তখন দল বেঁধে তাদের জোয়ান্‌কে দেখতে চল্‌ল! তারা দেখল, ফ্রান্সের সৈন্য আবার উৎসাহ ক'রে যুদ্ধে চলেছে, আবার ফ্রান্সের গৌরবে তাদের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে,—আর তাদের আগে আগে রাজার সঙ্গে শ্বেত পতাকা নিয়ে আলোর মত উজ্জ্বল পোষাকে চলেছেন, চাষার মেয়ে জোয়ান! যারা আগে জোয়ানকে ঠাট্টা করে ছিল, বাধা দিয়েছিল, শাসন করতে চেয়েছিল, তারা আজ গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে লাগল, "এইত আমাদের জোয়ান—আমাদের গ্রামের মেয়ে"। আর জোয়ানের বাবা, সেই বৃদ্ধ চাষা, যে তার মেয়েকে ডুবে মরবার কথা বলেছিল, আনন্দে তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সে বলল, "আমার ঘরেও এমন মেয়ে জন্মেছিল"!

সেনাপতিরা চলেছেন পদে পদে বাধা দিবার জন্য। এক একটা সহর জয় হয় আর তাঁরা রাজাকে বলেন, "আর গিয়ে কাজ নাই। হঠাৎ সৈন্যদের একটু উৎসাহ হ'য়ে কতগুলো সহর দখল করা গেছে। কিন্তু বেশী লোভ কর্‌লে, এর পরে ভারি বিপদ হবে"। কিন্তু জোয়ান্ বলে "আমি জানি, রীম্‌স্ নগর পর্য্যন্ত আমায় যেতে হবে, সেখানে রাজার অভিষেক হবে"। যখন রাজার মনও বিমুখ হ'য়ে পড়ল, তখন জোয়ান কেঁদে বলল, "আর কিছু দিন আমার কথা শুনুন—তারপর আমি চ'লে যাব। শেষে আর সময় হবে না, আমি আর এক বছরের বেশী বাঁচব না"। যখন ত্রয় নগরের কাছে এসে ইংরাজের সৈন্যবল দেখে কাপুরুষ রাজা মন্ত্রণা কর্‌তে বস্‌লেন, তখন জোয়ান্ তাঁর মন্ত্রণা সভায় ঢুকে বল্‌ল "এমন ক'রে সময় নষ্ট কর্‌বেন না"। সভার মন্ত্রীরা বল্‌লেন "তোমায় ছয়দিন মাত্র সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি সহর দখল করতে না পার, তাহ'লে আমরা ফিরে যাব"। জোয়ান্ বল্‌ল, "ছয় দিন কেন? তিন দিন সময় দিন্"। তার পরের দিনই সে সৈন্য নিয়ে ত্রয় নগরের দ্বারে উপস্থিত হ'তেই, ইংরাজ প্রহরীরা বিনাযুদ্ধেই দ্বার ছেড়ে পথ ছেড়ে সহর ছেড়ে উত্তরের দিকে স'রে পড়্‌ল। তারপর

ক্রমে রীম্‌স্ নগরও উদ্ধার হ'ল; মহা সমারোহ ক'র রাজার অভিষেক হ'য়ে গেল; জোয়ান্ নিজের হাতে রাজার মাথায় মুকুট তুলে দিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ফ্রান্সের গৌরবমণি জোয়ান্! আজ তুমি কি পুরস্কার পেতে ইচ্ছা কর"? জোয়ান্ বল্‌ল "আমার ত সব ইচ্ছাই পূর্ণ হ'য়েছে—যদি অনুগ্রহ করতে চান, তবে আমার জন্মস্থান ডম্‌রেমি গ্রামকে আজ থেকে খাজনা মুক্ত ক'রে দিন্"। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ডম্‌রেমি গ্রাম আর সরকারী খাজনা দেয় না—আজও রাজস্ব হিসাবের খাতায় জোয়ানের নাম ক'রে বলা হয়, তার খাতিরে খাজনা মাপ।



তারপর জোয়ান্ বল্‌ল "আমার কাজ এখন শেষ হ'য়েছে। এখন আমি আমার গ্রামে ফিরে যাই"। কিন্তু সেনাপতিরা উল্টাসুর ধরে বল্‌লেন, "এতদূর এলাম যখন, তখন পারিস পর্য্যন্ত যাওয়া যাক্।" জোয়ানের মনে এতদিন আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, কিন্তু এখন যেন আর তার সে ভরসা নাই। এতদিন তার মনে হ'ত দেবতারা তার সঙ্গে আছেন, আজ প্রথম তার মনে হ'ল সংসারে সে একা—পৃথিবীতে কেউ তার সহায় নেই। তবু রাজার আদেশ মানতে হবে। জোয়ান সৈন্য নিয়ে পারিসের দিকে চল্‌লেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই অকৃতজ্ঞ নরাধম রাজা গোপনে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি ক'রে, জোয়ানকে শত্রুর মুখে ফেলে নিজে দলবল নিয়ে স'রে পড়লেন। জোয়ানের জীবনে এই প্রথমবার তার পরাজয় হ'ল। এমন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ রাজা, কিন্তু জোয়ান তাকে ছাড়তে পারল না। দুদিন যেতে না যেতেই রাজা আবার বিপদে পড়েছেন; সে খবর শুনেই জোয়ান্ তার উদ্ধারের জন্য সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল। এই তার শেষ যাত্রা। একদিন ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তার নিজেরই দলের লোক তাকে ইংরাজের কাছে ধরিয়ে দিল।

তারপরে সে কি দুঃখের দিন। শিশুর মত নির্ম্মল সুন্দর জোয়ান্‌কে পশুর মত খাঁচার মধ্যে পুরে, শিকল দিয়ে তার হাত পা বেঁধে, তার শত্রুরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল। কত লোকে কাঁদল, কত লোকে তার জন্য আকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর্‌ল, কিন্তু দেশের রাজা, দেশের বীর যোদ্ধা সেনাপতি, কেউ তার উদ্ধারের জন্য ছুটে গেল না, কেউ তার হ'য়ে একটি কথা পর্য্যন্ত বল্‌ল না। রাজা নির্ব্বাক নিশ্চিন্ত, রাজার বিরোধী যারা তারা ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিল। দেশী বিদেশী সকল শত্রু মিলে এই একটি অসহায় মেয়েকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য মিথ্যা বিচারের ভড়ং কর্‌তে বস্‌ল। কত তর্জ্জন শাসন, আর কত অন্যায় নির্যাতন ক'রে, কত মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, তারা জোয়ানকে জব্দ করতে চাইল। যুদ্ধের মধ্যেও যে কাউকে আঘাত করেনি; যুদ্ধের সময়েও যে একদিনের জন্যও ভগবানকে ভোলেনি; যার শেষ বিশ্বাস ছিল অস্ত্রে নয় বর্ম্মে নয়, কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদে; ধর্ম্মব্যবসায়ী পাদ্রিরা তাকে সয়তানের দূত ব'লে, ধর্ম্মদ্রোহী মিথ্যাবাদী ব'লে, পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত জোয়ানের বিশ্বাস টলেনি। সে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "যা করেছি, দেবতার আদেশে করেছি। তার জন্য আমার কোন অপরাধ হয়নি"। কিন্তু যখন তাকে খোঁটার মধ্যে বেঁধে, চারিদিকে কাঠ সাজিয়ে দিল, যখন নিষ্ঠুর ঘাতকেরা মশাল নিয়ে সেই কাঠে আগুন ধরাতে এল, তখন ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হ'ল সেই ডমরেমি গ্রামের কথা,—সেই যে গির্জ্জার ধারে দেবতার বাণী সে শুনেছিল, সেই যে আলোর মত দেবতারা তাকে ডেকে ডেকে আশার কথা বলেছিলেন,—সেই কথা তার মনে হ'ল। কিন্তু হায়! সেই দেবতারা আজ কোথায়? তাঁরাও কি জোয়ানকে ভুলে গেলেন? অসহায় শিশুর মত জোয়ান কেঁদে উঠ্‌ল "সেণ্ট্‌ মাইকেল! সেণ্ট্‌ মাইকেল! আজ তুমি কোথায়"? সে ব্যাকুল ডাক শুনে নিষ্ঠুর বিচারকের চোখেও জল এল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু অন্ধ হিংসার শাসন টলবার নয়। যার পায়ের ধূলো নেবার যোগ্য তারা নয়, সেই মেয়েকে পুড়িয়ে মেরে ধর্ম্মরাজকেরা নিশ্চিন্ত হ'লেন,—ভাবলেন যা হোক এতদিনে ধর্ম্ম বাঁচল।

বুড়ীর বাড়ী।



গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ী
ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ি।

কাঁথাভরা ঝুল্‌কালী, মাথাভরা ধূলো
মিট্‌মিটে ঘোলাচোখ, পিঠখানা কুলো।

কাঁটা দিয়ে আঁটাঘর আঠা দিয়ে সেঁটে
সূতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতুদিয়ে চেটে।

ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে
খক্‌খক্‌ কাশি দিলে ঠক্‌ঠক্‌ নড়ে।

ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ী
খসে পড়ে কড়িকাঠ ধসে পড়ে বাড়ী।

বাঁকাচোরা ঘরদোর ফাঁকা ফাঁকা কত
ঝাঁট দিলে ঝরে পড়ে কাঠকুটো যত।

ছাদ্‌গুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে
একাবুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।

মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি
থুরথুরে বুড়ী, তার ঝুরঝুরে বাড়ী॥

নাকের বাহার

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হ'লে, তিল ফুলের সঙ্গে, টিয়া পাখীর ঠোঁটের সঙ্গে, গরুড়ের নাকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, "বাঁশির মত নাক"। কিন্তু মোটের উপর একথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেঁয়ে রকমের,—দোনালা সুরঙ্গের মত। কারো নলদুটি সরু, কারো বা মোটা,—কারো চ্যাপ্টা, কারো উঁচু—কারো মাঝখানে ঢালু, কারো আগাগোড়াই ঢিপি,—এইরকম সামান্য উনিশবিশ যা একটু তফাৎ হয়। কারো কারো নাক যদি হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা হ'ত কি গণ্ডারের মত খড়গধারী হ'ত, অথবা আর কোন উদ্ভট



জানোয়ারের মত হ'ত, তাহ'লে বেশ একটু রকমারি হ'তে পারত। সে রকমারি যে বড়

সামান্য নয় তাই বোঝাবার জন্য এইখানে কতগুলি জানোয়ারের চেহারা দেখান হ'ল। এদের প্রায় সকলকেই বোধ হয় তোমরা চেন।

হাতীর শুঁড়টাই যে তার নাক এটা তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতীর পাশেই যে জন্তুটি, তার নাম টেপির; এর নাকটিও শুঁড় হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারেনি। তার পাশেই দেখ পিঁপ্ড়ে-খোরের ছবি, এরও একটা শুঁড় আছে, কিন্তু সেটা শুধু নাক নয়,—নাক মুখ দুই মিলে লম্বা হ'য়ে ওরকম হ'য়ে গেছে। কুমীরেরও ঠিক তাই। আর ঐ উপরের ডান দিকে যে চোঙামুখ জন্তুটি দেখছ, তার পরিচয়ও তোমরা সন্দেশে পেয়েছ ("সমুদ্রের ঘোড়া")। নীচের কোনে দুটি ছুঁচো দেখছ, তার একটি বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর একটি কেবল শুঁড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হ'য়েছে ঠিক ফুলের মত! এই সৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মত একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকালো নাকের কথা যদি বল্‌তে হয় তবে ঐ পুষ্প-নাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দ্দার পর পর্দ্দা গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির মত সাজিয়ে তার উপর যেন তিলক চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরী করা হ'য়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য্য' বাড়ান না শত্রুকে ভয় দেখান, তা আমি জানি না।

পুষ্পনাসার এক পাশে হংসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মত চ্যাপ্টা। আর এক পাশে ম্যান্‌ড্রিল বাঁদর। শুধু এই ছবি দেখে যদি বিচার কর, তবে এর উপর নিতান্তই অবিচার হবে; কারণ এর রংটিই হচ্ছে এর আসল বাহার। টক্‌টকে লাল নাক, তার দু'পাশে নীল রঙের ঢিবলি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য্য। একবার রঙিন্ ছবি দিয়ে এর 'সৌন্দর্য্য' তোমাদের বোঝাবার ইচ্ছা আছে। আর যারা কল্‌কাতায় আছ তারা ত চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যান্‌ড্রিলের পাশে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলবার দরকার নাই, ছবিতেই দেখছ কেমন ছোট খাট বেগুনের মত নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্ণাম সকলেই করে, কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হ'লেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কিনা সন্দেহ।

ব্যাং যখন হাতীর উপর রাগ ক'রে বলেছিল "বড় যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতী তাকে "থ্যাবড়া নাকী" ব'লে গাল দিয়েছিল। হাতীর গালটা খুব লাগসই হ'য়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাবড়া নাক, তা নয়। এমন ব্যাংও আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখীর ঠোঁটের মত দিব্যি চোখাল। (নীচের লাইনে মাঝের ছবি)

কোন কোন জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়গটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় এক রকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দুপাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মত উঁচু হ'য়ে থাকে। তলোয়ার-মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসান থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মত দাঁত কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা সন্দেশে অনেকবার বলা হ'য়েছে—তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মত লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙ্গে খাওয়া।

কোন কোন জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটাল গিরগিটির গা'ভরা উবড়ো খাবড়ো শিঙের মত কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়ি-মুখো হাঙ্গরের চেহারাটা ত আগাগোড়াই উল্টা রকম। একটা দু'মুখো হাতুড়ির মত তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটো চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসান থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশী।

গত মাসের ঠকানো প্রশ্নের উত্তর

গাধা দুইটা মুখোমুখিই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহা হইলেই একটার মুখ পূর্ব্বদিকে থাকিলে আর একটার মুখ তাহার উল্টা অর্থাৎ পশ্চিমদিকে থাকিবে। এখন দুইজনের মাঝখানে মুখের নীচে খাবারের বালতি বসাইলেই দুইজনে একসঙ্গে খাইতে পারে।

সতরঞ্চির উপর হইতে কৌটা সরাইবার কৌশলটিও খুবই সহজ। সতরঞ্চির উপর ভর না দিয়া তাহার উপর হাত পা না রাখিয়াও তাহাকে গুটাইয়া ফেলা যায়; আর, একদিকে খানিকটা গুটাইলেই কৌটাটি উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়।

নানা কারণে এবার "সন্দেশ" বাহির করিতে বড়ই বিলম্ব হইল। ইহাতে গ্রাহকদেরও অত্যন্ত অসুবিধা হয়—আমরা তাহার জন্য বিশেষ দুঃখিত আছি।

মাঘ মাসের "সন্দেশ" ২৫শে মাঘ তারিখে বাহির হইবে।



পঞ্চুলাল

— ২৯৫ পৃষ্ঠা।

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ | মাঘ, ১৩২৫ | দশম সংখ্যা

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে ছাগে মিল হ'লে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরী,
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী!

আদা আর কাঁচকলা, মেলে কোনোদিন্ সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি?
ছ্যাক্ ছ্যাক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশী আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো, কেতাবের সহিতে।

পণ্ডিত পক্ষীর উপাখ্যান

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

একদিন জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "এখন আমার সন্ধ্যা পূজার সময় হইয়াছে—এত গুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। তুমি এক কাজ কর, বিন্ধ্য পর্ব্বতের গুহার মধ্যে দ্রোণ ব্রাহ্মণের পুত্র চারিটি পক্ষী থাকে; তাহারা সকল শাস্ত্রে ভারি পণ্ডিত। সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাহারা তোমার সকল কথার উত্তর দিবে।" একথা শুনিয়া জৈমিনি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু! পাখী শাস্ত্র শিখিয়াছে, মানুষের মত কথা বলে, আবার ব্রাহ্মণের পুত্র! এ সব কথা বড় আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে এমন হইল?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—পূর্ব্বকালে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র নন্দন কাননে বসিয়া বসিয়া অপ্সরাগণের গান শুনিতেছিলেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত! ইন্দ্র তাঁহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তারপর বলিলেন— "ঠাকুর! এখানে উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি বড় বড় অপ্সরা উপস্থিত আছেন; ইঁহাদিগের মধ্যে যাহার গান শুনিতে আপনার ইচ্ছা হয় বলুন, তিনি গান গাহিয়া শুনাইবেন।" নারদ অপ্সরাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যে সকলের চাইতে গুণবতী, সে আমার সম্মুখে নৃত্য গীত কর।"

নারদমুনির কথায় অপ্সরাগণের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল। সকলেই বলে, "আমি যেমন গুণবতী তোমরা তেমন নও"—কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না। তখন ইন্দ্র বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা মুনিঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা কর; তিনি যাহাকে গুণবতী বলিবেন সেই নৃত্য গীত করিবে।" অপ্সরাগণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন—"দুর্ব্বাসামুনি হিমালয় পর্ব্বতের উপর তপস্যা করিতেছেন; যে তাঁহাকে গান শুনাইয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাকেই যথার্থ গুণবতী বলিব।"

দুর্ব্বাসা মুনির নাম শুনিয়া সকলেই ভয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমাদের কর্ম্ম নহে!" দুর্ব্বাসা মুনি যে রাগী, তাঁহার তপস্যার সময়ে গান গাহিয়া বাধা

দিতে কেহই সাহস পাইল না! তখন বপু নামে এক অপ্সরা বলিল—"আজ্ঞা করুন, আমি গিয়া এখনি মুনিঠাকুরকে গান শুনাইয়া আসিতেছি।"

ইহার পর 'বপু' হিমালয় পর্ব্বতে গেল। যেখানে দুর্ব্বাসা মুনি তপস্যা করিতেছিলেন সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে থাকিয়া, সে এমনই মিষ্ট গান করিতে লাগিল যে দুর্ব্বাসা মুনি আপনা হইতেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া মুনি ঠাকুরের ক্রোধের সীমাই রহিল না; তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাপ দিলেন—"হতভাগিনী! আমার তপস্যায় বাধা দিতে আসিয়াছিস্—এত বড় স্পর্দ্ধা? ষোল বৎসর তুই পক্ষী হইয়া থাকিবি। তোর চারিটি পুত্র হইবে কিন্তু তুই তাহাদের দেখিতে পাইবি না এবং অস্ত্রের আঘাতে না মরিলে আর তুই স্বর্গে যাইতে পারিবি না। যা! তোর আর কোন কথা শুনিতে চাই না!" এই বলিয়া শাপ দিয়া দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন।

পক্ষীর রাজা গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব; তাহার পুত্র কুন্তি; কুন্তির পুত্র প্রলোলুপের দুই পুত্র, কঙ্ক ও কন্ধর। কঙ্ক একদিন কৈলাস পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়া এক স্থানে দেখিল, কুবেরের অনুচর বিদ্যুদ্রূপ রাক্ষস স্ত্রীর সহিত বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। কঙ্ককে দেখিয়াই রাক্ষস রাগে জ্বলিয়া উঠিল—"কি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি এখানে আসিয়াছি জানিয়াও, তুই কোন্ সাহসে এখানে আসিলি?" কঙ্ক বলিল—"হিমালয় পর্ব্বতে সকলেরই আসিবার অধিকার আছে, তুমি মিছামিছি রাগ করিলে চলিবে কেন?" যেই এই কথা বলা অমনি দুষ্ট রাক্ষস খড়্গ দিয়া চক্ষের নিমেষে বেচারি কঙ্কের মাথা কাটিয়া ফেলিল!

কঙ্কের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহার ছোট ভাই কন্ধর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত! দূর হইতে দেখিল, বিদ্যুদ্রূপ পাহাড়ে বসিয়া আছে। পূর্ব্বে যেমন ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হইয়াছিল তেমন এই রাক্ষসের সহিত কন্ধরের অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! রাক্ষস রাগিয়া যেই হাতের খড়্গখানি কন্ধরকে ছুড়িয়া মারিয়াছে, অমনি কন্ধরও ঠোঁটে খড়্গটাকে ধরিয়া চক্ষের নিমেষে পায়ে চাপ দিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিল। তারপর দুষ্ট রাক্ষসকে আর বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না! কন্ধর তাহার বুকে দারুণ এক ঠোকর মারিয়া ঠোঁট ও নখের আঘাতে তাহার হাত পা ছিঁড়িয়া অবশেষে তাহার মাথাটি পর্য্যন্ত ছিঁড়িতে বাকি রাখিল না।

রাক্ষস মরিলে পর তাহার স্ত্রী 'মদনিকা' আপনার পরিচয় দিয়া বলিল—"খগরাজ! আমি মেনকার কন্যা।" এই বলিয়া সে নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া সুন্দর পক্ষিনীর রূপ ধরিল। তখন কন্ধর তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

ক্রমে এই পক্ষিনীর কন্যা হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত অপ্সরা 'বপু' জন্মগ্রহণ করে। খগরাজ কন্ধর তাহার নাম রাখিল 'তার্ক্ষী'। মন্দপাল নামে এক ব্রাহ্মণের চারিটি পুত্রের সকলের ছোটটির নাম ছিল দ্রোণ। দ্রোণ বড় ধার্ম্মিক ছিলেন, সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। সাধু দ্রোণ কন্ধরের মত লইয়া সুন্দরী তার্ক্ষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দারুণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তার্ক্ষী একদিন পক্ষীর রূপ ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। গিয়া দেখিল, অর্জ্জুন ও ভগদত্তে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। হঠাৎ অর্জ্জুনের একটি বাণ ছুটিয়া আসিয়া তার্ক্ষীকে আঘাত করিতেই সে মরিয়া গেল, এবং মরিবার সময়ে শূন্যেই চারিটি সাদা ধপধপে ডিম পাড়িয়া গেল। ডিমগুলি মাটিতে পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের বাণে ভগদত্তের হাতীর গলার ঘণ্টাটির দড়ি কাটিয়া যাওয়ায়, ঘণ্টাটি ঠিক ডিমগুলির উপরে পড়িয়া বেশ একটি আশ্রয়ের মত হইল! এদিকে দুর্ব্বাসা মুনির কথামত তার্ক্ষীও পক্ষিদেহ ছাড়িয়া পুনরায় অপ্সরা হইয়া চলিয়া গেল।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইলে একদিন শমীক মুনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ পাখীর ছানার মত চিঁচিঁ শব্দ তাঁহার কাণে গেল। তখন শিষ্যদের সহিত অনেক সন্ধান করিয়া সেই ঘণ্টাটি তুলিয়া দেখিলেন—তাহার নীচে সুন্দর চারিটি পক্ষিশাবক রহিয়াছে। এই নিরাশ্রয় ছানাগুলিকে দেখিয়া মুনিঠাকুরের দয়া হইল এবং তাঁহার আদেশে শিষ্যগণ তাহাদিগকে পরম যত্নের সহিত আশ্রমে লইয়া আসিল।

মহর্ষি শমীকের যত্নে ক্রমে ছানাগুলি বড় হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। মুনিঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের বেশ জ্ঞানও হইল। একদিন শমীক শিষ্যগণকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় চারিটি পক্ষী আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"ঠাকুর! আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে মরণ হইতে বাঁচাইয়াছেন—আপনিই আমাদিগের পিতা। এখন আমরা বড় হইয়াছি,

আমাদের বুদ্ধি হইয়াছে ; এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন।" পাখীগুলির বুদ্ধি দেখিয়া, এবং তাহারা ঠিক মানুষের মত পরিষ্কার কথা বলিতেছে দেখিয়া, মহর্ষি শনীক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তোমরা নিশ্চয় কাহারও শাপে পাখী হইয়া জন্মিয়াছ। কেন পাখী হইলে, কে শাপ দিলেন—সব কথা খুলিয়া বল।"

পক্ষীরা কহিল—পূর্ব্বকালে বিপুলস্বান্ নামে এক মুনি ছিলেন, তাঁহার সুকৃষ ও তুম্বুরু নামে দুই পুত্র ছিল। আমরা চারিজনই সেই সাধু সুকৃষের সন্তান। আমরা আমাদের পিতার সঙ্গে বনে আশ্রমে থাকিতাম। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র প্রকাণ্ড এক বৃদ্ধ পাখীর রূপ ধরিয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়া পিতাকে বলিলেন—'ঠাকুর! আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে কিছু খাইতে দিন্। আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের পাখার ঝাপটে আমি অজ্ঞান অবস্থায় এখানে পড়িয়া যাই। সাত দিন পরে আজ আমার চৈতন্য হইয়াছে এবং বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র কিছু খাইতে দিন্।' এ কথায় পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি খাইতে চাও বল, তাহাই দিব।' পাখী বলিল—"মানুষের মাংস খাইলে আমার বড় তৃপ্তি হয়।"

পিতা বলিলেন—'কি দুঃখের কথা! তুমি এখন বুড়া হইয়াছ তবু তোমার এই নিষ্ঠুরতা গেল না? যাহা হউক, যখন যাহা চাহিবে তাহাই দিব বলিয়া কথা দিয়াছি, তখন মানুষের মাংসই তোমাকে খাইতে দিব।' এই বলিয়া মুনি আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'হে পুত্রগণ! আমি তোমাদের পিতা ; তোমরা যদি আমাকে গুরু এবং পূজনীয় বলিয়া মনে কর, তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কর। এই পক্ষী ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার শরণ লইয়াছে, এখন তোমাদের মাংস খাইলে ইহার তৃপ্তি হইবে এবং ক্ষুধা দূর হইবে। অতএব তোমরা ইহাকে নিজ নিজ শরীরের মাংস খাইতে দাও।'

পিতার এই দারুণ আদেশ শুনিয়া আমরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—'কি সর্ব্বনাশ! এ কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না।' আমাদিগের কথা শুনিয়া পিতা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তখনি শাপ দিলেন—'দুর্বৃত্তগণ! আমি এই পক্ষীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর তোমরা আমার কথা রাখিলে না? অতএব আমার শাপে পাখী হইয়া তোমরা জন্ম লইবে!'

আমাদিগকে এই শাপ দিয়া তিনি নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিলেন।

তারপর পাখীকে বলিলেন—'হে পক্ষি! তুমি আমাকে খাইয়া ক্ষুধা দূর কর।' পক্ষী বলিল—'ঠাকুর! আপনি আগে যোগবলে শরীরটাকে ছাড়ুন, তারপর আপনার মাংস খাইব। কারণ জীবিত মানুষের মাংস আমি কখন খাই না।' পক্ষীরূপী ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র পিতা যোগে বসিলেন। তখন ইন্দ্র ও নিজের রূপ ধরিয়া বলিলেন—'ঠাকুর! আপনাকে



পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি পক্ষীর রূপ ধরিয়া এ সব করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সত্য রক্ষার প্রতি আপনার এরূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে আপনি ঐন্দ্রজ্ঞান লাভ করিবেন আর আপনার তপস্যায় কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিবে না।' এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্র চলিয়া গেলে আমরা পিতার পায়ে পড়িয়া বলিলাম—'শুধু মরণের ভয়ে আমরা আপনার কথা অমান্য করিয়াছি—আমাদিগকে ক্ষমা করুন।' পিতা বলিলেন—'বাছারা! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইবেই। তবে তোমরা পাখী হইয়াও খুব জ্ঞানী হইবে। আর আমার আশীর্ব্বাদে তোমরা সৎপথে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।' প্রভু! সেই ঘটনার পরই আমরা পাখী হইয়া জন্মিয়াছি। পরে

আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে আপনার আশ্রমে আনিয়া যত্নের সহিত পালন করিয়াছেন।”

পক্ষিদিগের এই কাহিনী বর্ণন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি পুনরায় বলিলেন—“মহর্ষি শনীকের আদেশে পক্ষিগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া এখন ধর্ম্ম কর্ম্মে জীবন কাটাইতেছে। অতএব হে জৈমিনি! তুমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া এই পক্ষীরূপী মুনিপুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে।”

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পঞ্চুলাল



অন্তা ছুতোর। বাপ মায়ে নাম রেখেছিল অনন্তপ্রসাদ, পাড়াপড়শীর অনুগ্রহে সে নাম হয়ে দাঁড়াল অন্তা। শুধু তাই নয়, ডাকনামও একটি জুটে গেল। সবাই তাকে ডাকত ‘কালোজাম’ বলে! ছুতোর মশায়ের কালোরঙের নাকের ডগাটুকু টুকটুকে রাঙা হবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পারেনি— জাম পাকলে কিম্বা টিকেয় আগুন ধরালে যেমন লালের আভা দেখা দেয়, সেই রকমটি হয়েছিল আর কি। সে দিন অন্তার হাতে কাজ ছিল না, দোকান খুঁজে দেখল বেশ একখানি চৌকোষ কাঠ কোণায় অনাদরে পড়ে আছে। কাঠখানি হাতে করে তুলে নিয়ে ভাবলে কুঁদে চড়িয়ে তারপর তার উপর খোদাই কাজ করে সুন্দর সুন্দর খাটিয়ার পায়া গড়বে। অন্তা ছিল কাজের লোক, মনে যদি কিছু হত সেটি করতে দেরী হত না। কাঠখানি তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যেমি

র‍্যাঁদা দিয়ে চেঁচে সমান করতে গেছে, অম্নি কাঠের মধ্যে হতে পিঁ পিঁ করে কে যেন কেঁদে উঠ্‌ল। প্রথমে অতটা কাণ করেনি, ছুতোরের দোকানে ছুঁচো ইঁদুরের বসতি, কে কোথায় কখন কিচি মিচি করে উঠ্‌ছে তার ঠিক্ কি? আবার র‍্যাঁদা জোরে চালালে, এবারে আর পিঁ পিঁ না, একেবারে কুঁকিয়ে কান্না—"ওগো দোহাই তোমার, ছাল ছিলে নিয়োনা, গেলাম গো, গেলাম গো!" অন্তা ছুতোর তো আকাট, একেবারে কাঠটাঠ ছুঁড়ে ফেলে ঘরের অন্য কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে রাম নাম স্মরণ করে খানিকটা দম্ নিয়ে আবার ভাবলে, "দূর হ'ক ছাই; কাঠের ভিতর কি মানুষ আছে না থাক্‌তে পারে? আবার কাজে লাগা যাক্।" এবারে সে ভারী সাবধানে আস্তে আস্তে কাঠখানি চাঁচ্‌তে লাগ্‌ল—এমন সময় শুন্‌লে কে যেন হাস্‌তে হাস্‌তে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে—"ওগো কর কি? কাতুকুতু দাও কেন? বেজায় সুড়সুড়ি দিচ্ছ যে, আমার হাসিতে নাড়ী ছিঁড়ে আস্‌ছে"! এবারে অন্তা একেবারে ধড়াম করে ভূঁয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ল, মাথায় যেন তার বাজ পড়েছে! যখন চোখ খুললে, দেখলে, ঘরের মেজেয় বসে আছে! ঠিক এই সময়ে কে যেন দুয়োর ঠেলা দিলে, অন্তা কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, "কে"? উত্তর শোনা গেল, "আমি গুপে।"

গুপে হচ্ছেন অন্তার প্রতিবেশী—অন্তা যদি কালোজাম হয়, এ ব্যক্তি পাকা আম্‌টি, টুক্ টুকে বুড়ো, মাথার উপর বেলের মত চক্‌চকে টাক্! বুড়োর একটুকুতেই রাগ হত, বিশেষতঃ পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা যদি একবার বল্‌ত "ছানাবড়া"—তবে আর রক্ষা থাক্‌ত না। তাহলে গুপীবাবু রেগে চটে লাল হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একটা হুলস্থূল বাধিয়ে বস্‌ত। এই কারণেই ছেলেরা তাকে ছানাবড়া বলে যখন তখন ক্ষেপাত।

গুপী ঘরে ঢুকে দেখে অন্তারাম গালে হাত দিয়ে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত মাটীতে বসে আছে। গুপী বল্লে—"ওকি অন্তারাম, অমন করে ভূঁয়ে বসে কেন?" অন্তা বল্লে—"আবার কেন? পিঁপ্‌ড়ের দলকে অ, আ শেখাচ্ছি।

"বেশ কাজটি খুঁজে বা'র করেছ ত?"

অন্তা বল্লে, "তারপর গুপে ভায়া কি মনে করে?"

গুপে বল্লে, "দেখ ভাই অন্তা, আজ সকালে একটা ফন্দী মাথায় এসেছে। একটা সুন্দর কাঠের পুতুল গড়তে যদি পারি তাহলে সেইটে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ালে,

অন্নকষ্ট আর থাকে না, ঘরেও দুপয়সা আসে"! এমন সময় কে যেন বলে উঠ্‌ল "ছানাবড়া"—আর যাবে কোথা? গুপে রুখে উঠ্‌ল, "দেখ্ অন্তা ভাল হবেনা বল্‌ছি! তুই আমায় অপমান কর্‌লি"!

"শোন একবার কথা, আমি আবার কখন তোমায় অপমান কর্‌লাম"?

"নাঃ, তুমি করনি, তবে বুঝি আমি নিজেই নিজেকে অপমান কর্‌লাম"!

কথা হ'তে গালাগালি, পরে হাতাহাতি, অতঃপর মারামারি সুরু হল; অন্তা গুপের প্রাণান্ত হয় আর কি! এমন সময় দুই বুড়োই সাম্‌লে নিলে, এ ওর পিঠ থাবড়ে ভাব কর্‌লে। তখন অন্তা বল্লে, "গুপে ভাই বল্লিনে, কি চাস্"? গুপে বল্লে, "দেখ ভাই, পুতুলটা গড়বার জন্যে একটুকরো কাঠ চাইছি।" অন্তা ভাবলে বাঁচা গেল, এই সুযোগে সেই ভূতুড়ে কাঠটাকে এবারে বিদায় করি। কাঠখানা তুলে যেম্নি গুপেকে দিতে যাবে, অম্নি সেখানা এম্নি ধড়্‌মড় ক'রে উঠ্‌ল যে সেটা ছিট্‌কে, গুপের পায়ের উপর গিয়ে পড়ল! বেচারী কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লে "হ্যাঁ ভাই, দিলি বলে কি কাঠখানা এম্নি ছুঁড়েই মার্‌লি যে খোঁড়াই করে দিলি"। অন্তা বল্লে "দিব্যি করে তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি ভাই; আমি তোকে মারিনি"। গুপি বল্লে "তুমি মারনি তবে বুঝি আমি আপনি আপনাকে মারলাম"?—অন্তা বল্লে, "ঐ কাঠখানাই তোমায় মেরেছে"। গুপে বল্লে, "কাঠ তো মেরেছে—তুমি ছুঁড়ে দিলে তবে না সে আমায় ব্যথা দিলে?"

এমন সময় কে আবার বলে উঠ্‌ল "ছানাবড়া"। শুনে গুপী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "গাধা কোথাকার—"

আবার কে বল্লে, "ছা—না ব—ড়া।" গুপে বল্লে "উল্লুক—"

আবার কে বল্লে "ছানাবড়া"।

বারবার তিনবার রসে ভরা ছানাবড়ার নাম শুন্‌লে আমাদের মুখে জল আসত, গুপে কিন্তু রেগে আগুন হয়ে উঠ্‌ল। আবার এক পত্তন কিল ঘুষি চড় চাপড় সুরু হ'ল। তারপর দুই বুড়ো যখন হাঁপিয়ে মরে আর কি, তখন যুদ্ধ থাম্‌ল, শান্তি হল, দুজনে কোলাকুলি করে বল্লে, ভাই কিছু মনে করিসনে যেন! জন্ম জন্ম তারা দুজনে চির বন্ধু থাকবে শপথ করে, গুপে কাঠখানি নিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ীমুখো গেল, অন্তাও অপয়া কাঠখানাকে বিদায় করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

২

কাঠখানি বাড়ী নিয়ে গিয়েই গুপে যন্ত্র তন্ত্র নিয়ে পুতুল গড়তে সুরু করলে। ভাবতে লাগ্‌ল পুতুলটার নাম কি দেওয়া যায়। ভেবে ভেবে ঠিক্ করলে, নাম হবে পঞ্চুলাল। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল "লোকে পাঁচু ঠাকুরের মানত করে ছেলের নাম রাখলে, তার ভাগ্যি ভাল হয়। পঞ্চু নাম দিলে বাছা আমার সুখে থাক্‌বে, এ নামের পয় আছে। আমি একজনদের জানতাম তার সারাগুষ্ঠি সবারি এ রকম নাম ছিল,—পাঁচকড়ি, পাঁচুলাল, পঞ্চানন, পাঁচী ইত্যাদি—তাদের মত ধনী ভিক্ষুক আর দেখা যায় নি!" ছেলের নাম ঠিক হবার পর, গুপীর কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল, সে একেবারে লেগে পড়ে মেহনত করতে লাগ্‌ল! প্রথমে হ'ল মাথার চুল তারপর কপাল, তবে হ'ল চোখ। চোখ শেষ হলে গুপে দেখে কি চোখ দুটি নড়ছে, পলক ফেলছে আবার এক একবার এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। এতটা মনোযোগ গুপীর তেমন ভাল লাগেনি, সে চটে বলে উঠ্‌ল, "আরে খেলে যা, অমন হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস"! কেউ কিছু বল্লে না, তখন ছেলের নাকটি গড়লে। গড়তে গিয়ে দেখে ওমা! নাক যে ক্রমে বেড়েই চল্‌ল; গুপে যত তাকে কেটে ছোট করে ততই সে গজিয়ে উঠে আবার বেড়ে চলে! ইতি-মধ্যে ঠোঁট আর মুখ শেষ হ'তে না হ'তেই হাসি সুরু হ'ল, বুলি ছুটল! গুপী রেগে উঠে বল্লে, "চুপ রও"—কিন্তু চুপ রয় কে? তখন গুপীনাথ ষাঁড়ের মত গলা করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। এবারে হাসি থাম্‌ল বটে, কিন্তু জিভ বার করে মুখ ভেংচান আরম্ভ হ'ল। কিল চড় দিলে হাতের কাজ পাছে নষ্ট হয় সেই কথা মনে করে, গুপে দেখেও দেখ্‌লে না, কাজ করেই চল্‌ল। ঠোঁটের পর দাড়ী, তারপর গলা, তারপরে কাঁধ ঘাড়, শেষে হাত পেট গা তৈরি হ'ল। হাত যেম্নি তৈরি হয়েছে অম্নি গুপী দেখে কি তার টেকো মাথার টুপিতে টান পড়ছে, ফিরে দেখে তার টুপি পঞ্চুর হাতে। গুপে বল্লে, "পঞ্চু দে আমার টুপি দে বল্‌ছি, নইলে ভাল হবে না"। দেওয়া দূরে থাকুক সে টুপিকে আপন মাথায় দিলে—মস্ত টুপি নাক অবধি ঝুলে পড়ে দম আটকে মারা যাবার মত হ'ল। ছেলের এই কাণ্ড কারখানা দেখে বাপের মন ভারী দমে গেল, তার দিকে ফিরে বল্লে, "হতভাগা! এখনও তো সারা শরীর গড়ে ওঠেনি, এরি মধ্যে বাপকে অমান্য! এতো ভাল নয়"। এ কথা বল্‌তেই গুপীর চোখ দিয়ে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল!

তারপর যেম্নি পা শেষ হওয়া অম্নি গুণবন্ত ছেলে তড়বড় ক'রে বাপের নাকের উপর দুচারটা লাথি কষে দিলে।

পা দুখানি তৈরি হলে গুপী পঞ্চুকে হাত ধরে 'চলি চলি পা পা' করিয়ে হাঁটাতে শেখালে, ঘরের মধ্যে দুচার চক্কর দেবার পর পঞ্চু বিনা সাহায্যে বেশ হেঁটে বেড়াতে লাগ্‌ল। পা দুটি স্ববশ হবামাত্র, হাঁটা ছেড়ে ছুটোছুটি সুরু হল, তারপর না বলা না কওয়া, দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দে দৌড়। গুপীনাথ পিছন পিছন ছুটে চল্লেন, আরে থাম্ থাম্ ধর ধর! আর ধর ধর! পঞ্চু ঠিক টাট্টু ঘোড়ার মত লাফিয়ে চল্‌ল, আর কাঠের পা দুখানি পাথরের ফুটপাথের উপর এম্নি খট খট আওয়াজ বাধিয়ে দিলে যে মনে হল, দশ বিশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত খড়ম পায়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

গুপী চীৎকার করতে লাগ্‌ল 'থামাও' 'থামাও', 'রোখো' 'রোখো',—কিন্তু পথ চল্‌তি মানুষ জন একটা কাঠের পুতুলকে ঘোড়দৌড় করে বেড়াতে দেখে, এম্নি অবাক হয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল যে, তাদের দেখেই কাঠের পুতুল বলে ভুল হতে লাগ্‌ল! ধরবার চেষ্টা আর কিছুই হল না।

সোর গোল শুনে একজন কামার, তার নাম বলরাম, মনে করলে আস্তাবল হতে কারো দুষ্টু টাট্টু ঘোড়া পালিয়েছে। তাকে আটক করবার জন্যে কামার বাহাদুর দুই পা ফাঁক করে, হাত বাড়িয়ে মাঝ রাস্তায় তৈরি হয়ে দাঁড়াল! কামারের হুসিয়ারি দেখে পঞ্চু মনে মনে মৎলব আঁটলে যে কামারের পায়ের মধ্যে দিয়ে ফস্ করে গলে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কামারের শরীর খানি বিপুল হ'লেও, বুদ্ধিটা কিঞ্চিৎ ধারাল ছিল, পঞ্চুর মৎলব আগে হতেই সে বুঝতে পেরেছিল। তাই যেই কাছে আসা অম্নি সে পঞ্চুর নাকটি সাপটে ধরে তাকে গুপীর হাতে সঁপে দিলে। ছেলেকে হাতে পেয়েই বাপ তার কষে কাণমলা দেবেন ঠিক করলেন, কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। গোড়ায় গলদ, পুত্র তাঁর কাণকাটা। গড়বার সময় কাণের কথা মনে ছিল না, তাই পঞ্চুলালের কর্ণকুহর থাক্‌লেও শ্রবণমূল ছিল না; এতে শুনবার অসুবিধা হত না কিন্তু শাসন করবার জন্যে গুরুজনের হাত যখন নিস্ পিস্ করতো তখন তা'নিবারণের কোন উপায় হত না। ধরা পড়ে পঞ্চু মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দুষ্টু ঘোড়ার মত জমে গেল, আর এক পাও চলে না। সহরে পথের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলে যেমন ভিড় জমে যায় তাই হল। এমন গণ্ডগোল আর এম্নি বচসা

চল্‌তে লাগ্‌ল যে গুপী পঞ্চুকে ছেড়ে দিলে, আর বুদ্ধিমান পাহারাওয়ালা এসে গুপীকে ধরে হাজতে নিয়ে গেল!

ছাড়া পেয়েই পঞ্চু মনের আনন্দে চিঁহি চিঁহি ডাক্ ছাড়তে ছাড়তে বাড়ীমুখো দৌড় দিলে। বাড়ী পৌঁছে ঘরের দাওয়ায় আরামে পা ছড়িয়ে বসে তাইরে নারে বলে গান আরম্ভ করলে। হঠাৎ শুন্‌তে পেলে ঝিঁ ঝিঁ সুরে কে যেন কথা কইছে—যেন বহু কালের বুড়ো হাঁপানীর রোগী! ভয় পেয়ে চাপা গলায় পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে, কে গো? কে তুমি আমায় ডাক্‌ছ?

উত্তর শুন্‌লে, "আমার নাম ঝিল্লী চক্রবর্ত্তী—আজ শতাব্দী কাল তোমার পিতার বাস্তুভিটায় বসতি করে আসছি।"

পঞ্চু বল্লে, তাহলে এক ছেড়ে দুই শতাব্দী হতেও আটক্ নেই; এখন এ বাড়ী আমার—মানে মানে অন্যত্র যাও, নইলে ভালো হবে না বল্‌ছি।

ঝিল্লী বল্লে, যাবত বটেই—তার পূর্ব্বে গুটি কত সত্য কথা শুনিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।

পঞ্চু বল্লে নাও, নাও, কি বল্‌বে চটপট সেরে ফেলো!

ঝিল্লী বল্লে—দেখ বাছা, যে সব ছেলে মাবাপের অবাধ্য হয়, বাড়ী ছেড়ে পালায়, তাদের কপালে বড় দুঃখই লেখা থাকে! সুখের মুখ দেখা জীবনে ঘটে না, তারপর যখন দিন আর থাকে না, তখন চোখের জলে নাকের জলে সেই কথাই বার বার মনে করতে হয়।

পঞ্চু বল্লে, যাই বল আর যাই কর, আমি কাল ভোর হ'তে না হতেই পালাচ্ছি। বাড়ী যদি থাকি বাবাতো নাকে ধরে পাঠশালা পাঠাবেনই, পড়া শোনা করতে হবে; তার চেয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালে আর গাছে চড়ে পাখীর ছানা চুরি করতে পারলে সুখে থাক্‌ব।

ঝিঁঝি তবু বল্লে,—হায় হায় এমন কাজও কোরনা, তাহলে একদিন আস্ত গাধা হয়ে দাঁড়াবে আর দেশশুদ্ধ লোক তোমায় দেখে হাস্‌বে। পঞ্চু রুখে বল্লে, চুপ কর প্যাঁচামুখো তোর আর অত পণ্ডিতী করতে হবে না।

এই ঝিঁঝি ভারী জ্ঞানী ছিল, বয়সে আর বিদ্যায়। পঞ্চুর বেয়াদবীতে না চটে বল্লে, 'দেখ যদি লেখাপড়া না কর, তবে কোন ব্যবসা শেখ, সদুপায়ে দু পয়সা এলে খেয়ে পরে থাক্‌তে পার্‌বে।

পঞ্চুলাল নবাবী চালে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, পা দোলাতে দোলাকে বল্লে,

দেখ ঝিঁঝি, ছুনিয়ায় যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার ব্যবসাটা আমার বেশ লাগে! খাও দাও, ঘুমোও, ছুটো গান গল্প কর, যেখানে প্রাণ চায় যাও—এই যাকে বলে ভবঘুরে আর কি? লেখা পড়া, কাজ কর্ম্ম এ সব আমাকে দিয়ে হচ্ছে না মশায়। আগের মত শান্ত ভাবেই আবার ঝিঁঝি বল্লে, দেখ এ সব যারা করে, হয় তারা হাঁসপাতালে নয় জেলখানায় গিয়ে মরে।

এবারে পঞ্চুলাল চটে গেল, ঝাঁপিয়ে উঠে বল্লে,—চুপ রাও! মুখে মশায়ের ভাল কথা নেই—শুধুই অমঙ্গল ডাক্‌ছে—কোথাকার অলক্ষুণে—

ঝিঁঝি বল্লে, বাছা পঞ্চু তোমার জন্যে আমার ভারী ছুঃখ হচ্ছে!

পঞ্চু—কেন আমার উপর এ দয়া?

ঝিঁঝি—কেন? এক তো তুমি খেলার পুতুল—তার চেয়ে ছুঃখের কথা মাথাটি একেবারে নিরেট!

এবারে রেগে মেগে পঞ্চু হাতুড়িটা ছুঁড়ে দিলে, ঝিঁঝিকে ভয় দেখাবে ব'লে, কিন্তু হাতুড়িটা লাগ্‌ল ঠিক তার মাথার উপরে। কান্নার সুরে একটি বার ঝিঁ করেই সে মরে পড়ে গেল। মাথাটা থেঁতলে গেল, শরীরটা শুক্‌নো খড়ের মত মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ল!

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, জন্মাবধি পঞ্চুর মুখে এক দানা খাবারও ওঠেনি, ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ কর্‌ছে, মাথা ঘুরে উঠ্‌ছে, আর দাঁড়াতে পারে না—হাংড়ে হাংড়ে ঘরময় খুঁজে ছুটি গুমো চিঁড়ে আর একটু মাতা' গুড় ছাড়া আর কিছুই পেলে না। সেটুকু মুখে দিয়ে ক্ষিদে কমা দূরে থাকুক আরো যেন বেড়ে উঠ্‌ল; হাই তুল্‌তে তুল্‌তে চোয়ালে ব্যথা ধরে গেল। একবার তো একেবারে ঘুরেই পড়েছিল, কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে ভাবলে, আহা ঝিঁঝি মশায় ঠিক্‌ই বলেছিল, বাড়ী ছেড়ে যদি না পালাই তবে আর এ দশা হয় না। বাবাকেও তবে পুলিশে ধরে না, আমিও না খেয়ে মরিনে! হায় হায় ক্ষিদের মত ব্যামো কি আর আছে? পঞ্চু থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন আর সহ্য কর্‌তে পারে না, তখন ভিক্ষার চেষ্টায় বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়ল, যদি কারো দয়া হয়, যদি কেউ এক মুঠো অন্ন দেয়!

ক্রমশঃ

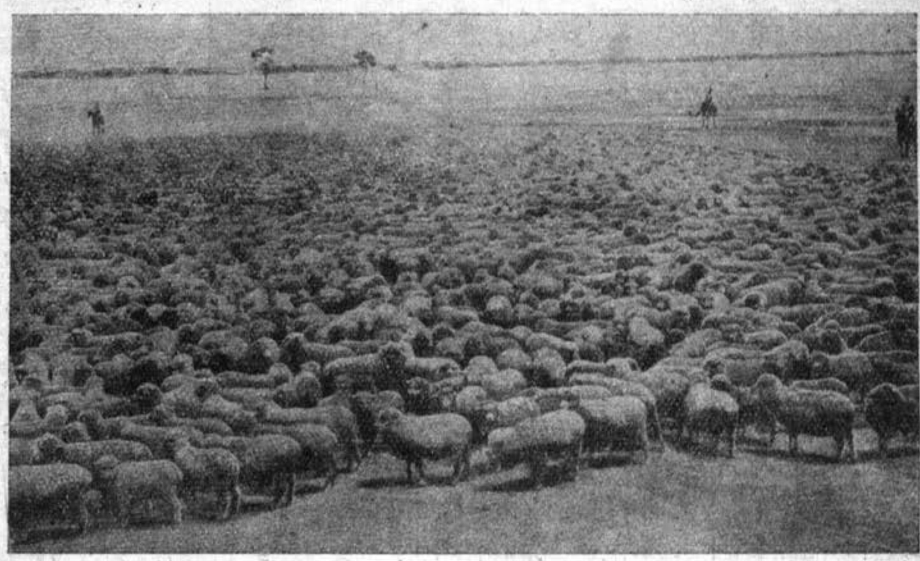
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শীতের কাপড়

যুদ্ধের বাজারে গরম কাপড় পাওয়া শক্ত; কাপড়ের দামও অনেক বেড়ে গেছে; তাই অনেকে পুরান জামা, শাল, আলোয়ান, রিপু ক'রে, তালি লাগিয়ে এ বছরের কাজ চালিয়ে দিচ্ছে, আর মনে কর্‌ছে যে আস্‌চে বছর শস্তা দামে জামা, শাল, আলোয়ান সব কেনা যাবে। জানোয়ারদের কিন্তু কোন ভাবনা নেই; তাদের গরম কাপড় তাদের গায়েই আছে; তার জন্য তাদের দোকানে যেতে হয় না, তাই শীতে তাদের কিছু কাবু কর্‌তে পারে না। আমরা কেবল তাদের গায়ে থেকে গরম জামার মাল-মসলা নিয়ে থাকি। ভেড়ার গায়ের পশম নিয়ে 'ফ্লানেল' তৈয়ারী হয়, আর সেই ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে আমরা শীত নিবারণ করি। রেশম আর তুলোর জামায়ও চলে; কিন্তু বেশী শীত পড়্‌লে পশমের সাহায্য নিতে হয়। তুলোর লেপ বালাপোষে অবশ্যি শীত নিবারণ হয়, কিন্তু সচরাচর ব্যবহার করা যায় না ব'লে তার চলন তত বেশী নাই। লেপ তো রাত্রে শোবার সময় গায়ে দেওয়া ছাড়া অন্য ব্যবহারেই আসে না;—লেপের জামা করলে একটা প্রকাণ্ড জাঁদরেল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। বালাপোষের জামা হয় বটে, কিন্তু, সে সব জামা একবার ময়লা হ'লেই মুস্কিল; ধোয়াবার আর জো নাই। কাজেই, সাধারণ ব্যবহারের জন্য সে সব জামা চলে না। শীতের জন্য পশমের জামাই আমরা সচরাচর ব্যবহার করি। আমাদের শাল, আলোয়ান, ফ্লানেল সার্ট, গরম গেঞ্জি, গরম কোট, ওভারকোট, সবই পশমের তৈরী। ভেড়া বেচারাদের



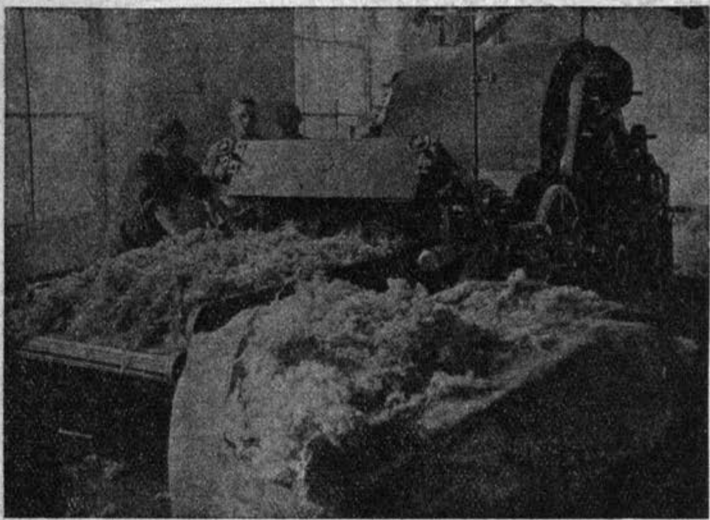
গায়ের লোম কেটে নিয়ে, সেই লোম দিয়ে পশম হয়। একবার লোম কেটে নিলে, পরে আবার সেই ভেড়ার গায়ে লম্বা লোম হয়;—আবার সেই লোম কেটে নেওয়া হয়। এমনি করে, একটা ভেড়া অনেক লোকের গায়ের জামার পশম জোগায়। কোন কোন দেশের ভেড়ার পশম খুব ভাল হয়, আর তার দামও খুব বেশী হয়, আবার কোন দেশের ভেড়ার পশম রুক্ষ হয় আর পরিমাণেও কম হয়। কাশ্মীরী ভেড়ার পশম খুব ভাল; সেই জন্য কাশ্মীরী শাল এত সুন্দর আর মোলায়েম হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়ার পশমও বেশ ভাল।



সেখানে যারা ঐ পশমের ব্যবসা করে, তাদের এক এক জনের হাজার হাজার ভেড়া থাকে; দশ বিশ মাইল মাঠ ঘেরাও ক'রে তার মধ্যে তাদের চরান হয় আর পশম-কাটাইএর বন্দোবস্তও থাকে খুব বড় রকমের। শুধু কাটান নয়, পশম ধোলাই করা, ঝাড়া মোছা, জট ছাড়ান, আঁচড়ান, সূতো পাকান প্রভৃতি সমস্ত কাজই কলে করবার ব্যবস্থা আছে।

কেবল যে ভেড়ার লোমই গরম কাপড়ের জন্য ব্যবহার হয়, তা' নয়। ছাগল জাতীয় আরও অনেক রকমের জন্তুর লোমে গরম কাপড় হয়, কিন্তু তার পরিমাণ খুব

সামান্যই। তোমরা "আলপাকা" দেখেছ? সেও এক রকম উট-জাতীয় জন্তুর লোম থেকে তৈরী হয়। উটের লোমেও কম্বল তৈরী হয় —সে কম্বলের দাম খুব বেশী।



পশমের জট ছাড়াবার কল

যে দেশে খুব বেশী শীত, সে দেশের লোকেরা জামার জন্য প্রায়ই কোন রকম লোম-ওয়ালা জন্তুর চামড়া ব্যবহার করে। তিব্বতে, রুশিয়ায়, গ্রীনল্যাণ্ডে, আলাস্কায় আর অন্য অনেক দেশে জন্তুর চাম্‌ড়ার পোষাক ব্যবহার করা হয়। কোন দেশে ভেড়ার চামড়া, কোন দেশে ছাগলের চামড়া, কোন দেশে ভালুকের চামড়া, কোন দেশে হরিণের চামড়া, কোন দেশে শেয়ালের চামড়া, কোন দেশে চিতেবাঘের চামড়া, কোন দেশে বেজীজাতীয় জন্তুর চামড়া পোষাকের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিলাতে মেমসাহেবদের জন্য জন্তুর চামড়ার হাত ঢাকা, গায়ের শাল, গলাবন্ধ, কম্বল, এই সব তৈরী হয়। তার এক একটার দাম খুব বেশী। এই সব কাজের জন্য কোন কোন জন্তুদের এত বেশী মারা হয়েছে যে এখন তাদের বংশই লোপ পাবার জোগাড় হয়েছে।

কয়েক বছর আগে খবরেঁর কাগজে পড়্‌ছিলাম যে রুষ জাপান যুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যেরা যে সব কানঢাকা (শীতের সময় কানে ঠাণ্ডা না লাগ্‌বার জন্য) ব্যবহার করেছিল, তার সবই ইঁদুরের চামড়া দিয়ে তৈরী। যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে চীনদেশে যখন প্লেগ হয়, তখন জাপানীরা এসে লাখে লাখে ইঁদুর চীন দেশ

থেকে নিয়ে গিয়েছিল। প্লেগের ভয়ে চীনেরা ইঁদুর মার্‌ত, আর সেই ইঁদুর



পোষাকের চামড়ার দোকান—এখানে প্রায় ১০০ রকমের জন্তুর চামড়া মজুত আছে।

জাপানীরা নিয়ে যেত। যারা ইঁদুর দিত, তাদের বক্‌সিস্ দেওয়া হ'ত ব'লে কিছু দিন চীনেদের মধ্যে খুব ইঁদুর মারার ধুম লেগে গেল; আর তার ফলে, প্লেগও অনেকটা ক'মে গেল। লোকে তখন বুঝতে পার্‌তনা যে জাপানীদের এত কেন মাথা ব্যথা যে তারা চীনেদের দেশ থেকে ইঁদুর নিয়ে যায়! কিন্তু রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর জোগাড় করার কেমন সহজ উপায় জাপানীরা বের ক'রেছিল।

জন্তুকে না মেরে, তার গায়ের লোম নিয়ে যদি কাজ চালান যায়, তবে তাই করাই ভাল; কিন্তু যাই হোক্‌, এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে জন্তুদের গায়ের গরম জামা ধার না নিলে মানুষের আর চলে না। অন্ততঃ শীতের দেশে বেঁচে থাকা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

গ্রীসেল্‌ডা

রাজবাড়ীর কাছেই সামান্য একটি কুটীর, সেখানে বৃদ্ধ কৃষক জেনিকোলা থাকে। সংসারে কেবলমাত্র তাহার কন্যা গ্রীসেল্‌ডা ছাড়া আর কেহ নাই। জেনিকোলা এখন কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; তাহাকে খাওয়ান দাওয়ান, তাহার সেবা শুশ্রূষা সবই গ্রীসেল্‌ডা করে। তাহারা বড় গরীব। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, স্বভাবটি তাহার বড় মিষ্টি ; বড় লোকের ঘরেও এমন মেয়ে কখন দেখা যায় না। ঘোর কষ্টের মধ্যেও গ্রীসেল্‌ডার মুখে সর্ব্বদাই হাসি।

জেনিকোলার কতকগুলি ভেড়া ছিল, সে গুলিকে গ্রীসেল্‌ডা প্রতিদিন মাঠে চরাইত, এবং ভেড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া একটা পাথরে বসিয়া সুতা কাটিত।

একদিন গ্রীসেল্‌ডা দেখিল একদল লোক রাজবাড়ীর দিকে যাইতেছে। দলের মধ্যে অনেক মাতব্বর প্রজা আর কতকগুলি বর্ম্মপরা যোদ্ধাও ছিল। তাহারা একেবারে প্রাসাদে ঢুকিয়া আঙ্গিনার মধ্যে রাজাকে দেখিতে পাইল। তখন তাহাদের দলপতি বলিল—"মহারাজ! আমাদের কিছু নিবেদন আছে। আপনার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সীমা নাই, কিন্তু আমাদের মনে একটিমাত্র দুঃখ আছে। আপনি এখনও বিবাহ করেন নাই। বিবাহের জন্য আপনার আগ্রহও নাই। আপনার অবর্ত্তমানে কে আসিয়া আমাদের রাজা হইবে? তাই আমাদের সকলের প্রার্থনা, আপনি বিবাহ করুন—আমরা আপনার জন্য একটি উপযুক্ত রাণী ঠিক করিয়া দেই।"

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"রাজভক্ত প্রজাদের অনুরোধ আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে কিনা, কে রাণী হইবেন তাহা আমি নিজেই ঠিক করিব। আর যাহাকেই আমি রাণী করিনা কেন, তোমাদের সকলকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে ; তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন দিন একটি কথাও বলিতে পারিবে না।"

একথায় দলের সকলে সম্মত হইল এবং তখনই বিবাহের দিন স্থির করিয়া সকলে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইল।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালেই প্রাসাদে উৎসবের ধুম্ পড়িয়া গেল। ফুল পাতা ও নিশানে সমস্ত প্রাসাদটি সাজিয়া উঠিল। প্রাসাদের ভিতরে রাজভোজের আয়োজন হইল ; রাণীর জন্য মহামূল্য পোষাক ও মণি মুক্তার অলঙ্কার প্রভৃতি

একেবারে প্রস্তুত। নিমন্ত্রিতেরা সাজিয়া গুজিয়া দলে দলে আসিয়া একত্র হইয়াছেন। কিন্তু বিবাহের কন্যা কোথায়? রাণী হইবেন কে?

এমন সময় হঠাৎ শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল আর অমনি রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাণীর পোষাক ও অলঙ্কার লইয়া লোকজন চলিল।

গ্রীসেল্‌ডা ভাবিল—"আজ তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সারিয়া লই; কন্যা লইয়া ফিরিবার সময় দেখিতে হইবে।" এই ভাবিয়া সে তখনই জল আনিবার জন্য কূয়ার নিকটে গেল। জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বয়ং রাজা তাহাদের কুটীরের দরজায়। গ্রীসেল্‌ডা রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"গ্রীসেলডা! তোমার বাবা কোথায়?" গ্রীসেল্‌ডা তৎক্ষণাৎ তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সেখানে ডাকিয়া আনিল। রাজা বলিলেন—"সাধু জেনিকোলা! তোমার কন্যাকে আমার রাণী করিব, অনুমতি দাও।"

হঠাৎ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া জেনিকোলা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন! খানিক পরে একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা আমার পক্ষে তাহাই অনুগ্রহ"।

তখন রাজা বলিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা! তোমার পিতার মত পাইয়াছি। এখন তোমার মত দিবার পূর্ব্বে আমার একটি কথা শুনিয়া পরে মত দাও। কথাটি এই—আমি যখন যাহা বলিব তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। তোমার সম্বন্ধে যখন যেরূপ ব্যবস্থা করিব, তাহা ভাল হউক বা না হউক তাহাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে"। গ্রীসেল্‌ডা বলিল "প্রভু! আমি এতটা সম্মান পাইবার উপযুক্ত নই। যাহা হউক, আমি আপনার সব কথা মানিয়া লইলাম। আমার কথায় এবং কাজে কোন দিন আপনাকে অসন্তুষ্ট করিব না।"

তারপর রাজবাড়ীর মেয়েরা মিলিয়া গ্রীসেল্‌ডাকে কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। খানিক পরে গ্রীসেলডাকে সাজাইয়া গুজাইয়া যখন তাঁহারা বাহিরে আনিলেন তখন সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাজা সেই কুটীরের দরজায় সম্মুখেই গ্রামবাসী সকলের সাক্ষাতে গ্রীসেল্‌ডাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর দল বাঁধিয়া সকলে প্রাসাদে গেলেন। তখন প্রাসাদে যা আনন্দ উৎসবের ধুম্ পড়িয়া গেল তাহা আর কি বলিব!

দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রশংসা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সকলে শুধু যে তাঁহার সৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা করিল তাহা নহে—বলিল, যেমন বুদ্ধি তেমনই মিষ্ট স্বভাব; যেন রাজবাড়ীর মা লক্ষ্মী!

কিছুকাল পরে গ্রীসেল্‌ডার একটি কন্যা জন্মিল; সকলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু হায়, এক বৎসর পার না হইতেই গ্রীসেল্‌ডার জীবনে দুঃখ আসিয়া দেখা দিল! রাজার মনে হঠাৎ এক চিন্তা আসিল। তিনি ভাবিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা বলিয়াছিল, আমি যাহা বলিব তাহাই সে বিনা আপত্তিতে করিবে। আমিত আজ পর্য্যন্ত তাহার ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করি নাই, সুতরাং তাহার পরীক্ষা হইল কৈ? আমাদের এই মেয়েটিকে কোন রকম কষ্ট দিব বলিলেও সে চুপ করিয়া থাকে কিনা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।"



গ্রীসেল্‌ডা মেয়ের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতেছিলেন এমন সময় রাজা মুখখানি ভারি বিষণ্ণ করিয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা! আমার

বড়লোক বন্ধুরা তোমাকে পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তোমার মত এরূপ গরীবের মেয়েকে সম্মান করিয়া চলা তাঁহাদের পক্ষে বড় কষ্টকর। তোমার এই মেয়েটি জন্মিবার পর হইতে একথা তাঁহারা আরও জেদ করিয়া বলিতেছেন। তুমি ত জান আমার আত্মীয় স্বজনকে লইয়া আমি শান্তিতে থাকি ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। সুতরাং আমার বন্ধুরা রাজকুমারীর প্রাণপর্য্যন্ত দাবী করিলে আমাকে সেইরূপ করিতে হইবে। এখন তুমি বিবাহের সময় যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সেইরূপ কর।"

এই কথা শুনিয়া গ্রীসেলডার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু বিন্দুমাত্রও অধীরতা প্রকাশ না করিয়া তিনি বলিলেন—"প্রভু! আপনি যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করুন।"

একটু পরেই একজন অস্ত্রধারী সৈনিক আসিয়া গ্রীসেলডাকে বলিল—"রাণী মা! রাজার হুকুমে রাজকুমারীকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।" গ্রীসেলডা কন্যাকে শেষ আদর করিয়া সৈনিকের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার প্রভুর হুকুম পালন কর। তোমার প্রভু যদি অনুমতি দেন তবে মৃত্যুর পর ইহাকে ভাল করিয়া গোর দিও।" সৈনিক রাজকুমারীকে লইয়া চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর রাজা দেখিলেন, গ্রীসেলডার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে গ্রীসেলড্‌া একদিনের জন্যও রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তারপর ক্রমে গ্রীসেলডার একটি পুত্র জন্মিল। রাজবাড়ীতে আনন্দ আর ধরে না! এতদিনে রাজার উত্তরাধিকারী হইল এই ভাবিয়া সকলে মহা সন্তুষ্ট। গ্রীসেলডার মনেও খুবই আহ্লাদ হইল কিন্তু তবু তিনি কন্যার কথা ভুলিতে পারিলেন না।

ছেলেটির দুই বৎসর বয়স হইলে রাজা ভাবিলেন, আবার গ্রীসেলডার ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিবেন। একদিন গ্রীসেলডাকে বলিলেন—"পুত্রের জন্মের পর হইতেই সকলে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—হায়রে কপাল! রাজার মৃত্যুর পর কি তবে জেনিকোলার নাতি আমাদের রাজা হইবে? এ সব কথা শুনিয়া আমার আর একটুও ভাল লাগিতেছে না। তাই মনে করিয়াছি যে, মেয়েটির মত ইহাকেও আর রাখা হইবে না।" গ্রীসেলডার মুখে এবারেও সেই একই কথা—"আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন"। রাজা মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেলেন।

আবার একজন সৈনিক আসিয়া রাজকুমারকেও লইয়া গেল! রাজ্যের যত লোক রাজাকে গালাগালি দিতে লাগিল। রাণীকে মিছামিছি এরূপ ভাবে কষ্ট দেওয়া তাহাদের প্রাণে সহিবে কেন? সকলে বলিল, এমনই নিষ্ঠুর রাজা যে নিজের ছেলেমেয়েদের উপরেও তাঁহার দয়ামায়া নাই।

রাজা এ সব কথা জানিতে পারিলেন বটে কিন্তু তবু তিনি মনে করিলেন রাণীকে আর একবার ইহার চাইতেও কঠিন পরীক্ষা করিবেন। তিনি রাজপুরোহিতের নিকট হইতে এই বিধান আনাইলেন যে, রাণী গরীবের মেয়ে বলিয়া যখন প্রজারা সকলেই বিরক্ত হইয়াছে তখন রাজা আর একটা বিবাহ করিতে পারেন।

কথাটা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং গ্রীসেলডার কাণে যাইতেও বিলম্ব হইল না। কিন্তু তিনি প্রফুল্ল মুখে সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; স্বামীকে এ বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না! একদিন সকলের সাক্ষাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"গ্রীসেলডা! আমার প্রজারা তোমাকে ঘৃণা করে; তাহাদের ইচ্ছা, আমি আবার বিবাহ করি। আমি তাহার জন্য আদেশ আনাইয়াছি। অতএব এখনই তুমি তোমার বাবার কাছে চলিয়া যাও।"

গ্রীসেল্‌ডা একটুও অস্থির হইলেন না; ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে বলিলেন—"মহারাজ! আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভগবান্ আপনাকে এবং আপনার নূতন রাণীকে সুখে রাখুন।" এই বলিয়া গ্রীসেল্‌ডা বিবাহের আংটিটি খুলিয়া রাখিলেন। মূল্যবান্ অলঙ্কার ও সাজসজ্জা যাহা কিছু রাজা দিয়াছিলেন সব খুলিলেন। তারপর অতি সামান্য একটি পোষাক পরিয়া পিতার নিকট চলিয়া গেলেন! আবার সেই পূর্ব্বের মত ভেড়া চরান, সুতা কাটা, কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনা এবং একান্ত মনে পিতার সেবা করা—এ সব কাজে গ্রীসেল্‌ডা উৎসাহ করিয়া মন দিলেন।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে রাজা একদিন গ্রীসেল্‌ডাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা! রাজবাড়ীতে আর শৃঙ্খলা নাই! যেখানকার যেটি, ঠিক আমার পছন্দ মত তুমি যেমন গুছাইয়া রাখিতে তেমনটি আর কেহ পারে না; তাই তোমাকে ডাকিয়াছি। কালই বিবাহ; নূতন রাণী আসিয়া যাহাতে খুসী হন, তুমি রাজবাড়ীটিকে সেরূপ করিয়া দাও।" গ্রীসেল্‌ডা তখনই সকলকে ডাকিয়া কাজে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রাসাদটি ঝক্‌ঝকে, ফিটফাট হইয়া গেল!

পরদিন প্রাতঃকালে একদল অশ্বারোহী প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে আশ্চর্য্য সুন্দরী একটি কন্যা এবং একটি বালকও ছিল। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল,—এই বুঝি রাণী! আবার বলিল—না, এ ত নিতান্ত শিশু দেখিতেছি। তবে বিবাহের কন্যা কোথায়? কাহার সহিত রাজার বিবাহ হইবে?"

বিবাহের আয়োজন একেবারে প্রস্তুত, কেবল কন্যা অনুপস্থিত। সকলে ব্যস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় গ্রীসেল্‌ডা আসিয়া চুপি চুপি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ! বিবাহের কন্যা কোথায়? তিনি কেন এখনও আসিলেন না?" রাজা বলিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা! তুমি কেন ব্যস্ত হইয়াছ? তবে কি তোমার মনে কষ্ট হইতেছে?" গ্রীসেল্‌ডা বলিলেন—"না মহারাজ! কষ্ট কিছুই হয় নাই। কেবল আমার অনুরোধ এই তাঁহার সঙ্গে যেন আমার মত নিষ্ঠুর ব্যবহার না করেন। আমি কৃষকের মেয়ে, আমি আপনার জন্য যতটা সহ্য করিতে পারি কোন বড় ঘরের কন্যা তাহা পারিবে না!"

গ্রীসেল্‌ডার এই কথা শুনিয়া রাজার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"গ্রীসেল্‌ডা! কেবল তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তোমাকে এই নিষ্ঠুর যাতনা দিয়াছি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" গ্রীসেল্‌ডা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

তখন রাজা সব কথা খুলিয়া বলিয়া সেই ছেলে মেয়ে দুটিকে ডাকিলেন। তারপর গ্রীসেল্‌ডাকে পুনরায় বলিলেন—"তুমিই আমার রাণী, তোমার জন্যই আজকার এই আয়োজন! এই কন্যা ও বালক তোমারই—তোমাকে শুধু পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে গোপন করিয়াছিলাম। সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

এই কথা শুনিয়া মনের আনন্দে গ্রীসেল্‌ডার জ্ঞান লোপ পাইল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সেখানে কি যে আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল তাহা বর্ণন করা যায় না! ভোজ তখনই আরম্ভ হইল, যেন গ্রীসেল্‌ডার সহিত রাজার আবার নূতন করিয়া বিবাহ!

সকলেই বলিল "এমন সুন্দর বিবাহের উৎসব আর আমরা দেখি নাই।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

শাস্ত্রীমহাশয়ের বাল্যকথা



[কথায় যাঁহাদের বলে "মানুষের মত মানুষ" মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে একজন। এমন প্রতিজ্ঞার বল, এমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, এমন নিঃস্বার্থ জীবন সংসারে খুব কমই দেখা যায়। ইঁহার জীবনের কাহিনীও বড়ই আশ্চর্য্য। অল্প বয়স হইতেই কত বাধা বিপদের মধ্যে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া যখন তিনি বিদ্বান ও যশস্বী হইয়া সংসারে দাঁড়াইলেন, সকলেই ভাবিল এইবার তিনি ভাল করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু সাধু মনস্বীর জীবন ধনমানের দিকেই গেল না, তিনি আজীবন দারিদ্র্যের ব্রত লইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। কিছু দিন হইল এই ত্যাগী পুরুষের "আত্মচরিত" বাহির হইয়াছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে তাহা পাঠ করিয়া "সন্দেশের" পাঠকপাঠিকাদের শুনাইবার জন্য তাহা হইতে কিছু তুলিয়া দিতেছি।]

আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় ন্যায়ালঙ্কার একশত তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি ও কৃশাঙ্গ মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে একটী বালকের মত দেখাইত। আমার মা তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া

এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার সংকল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে কোলের শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে হাতে ধরিয়া পালন করা আমার মার এক প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমি আমার জ্ঞানে তাঁহাকে অন্ধ বধির ও তাঁহার গৃহে আবদ্ধই দেখিয়াছি। আমি চলিতে বলিতে শিখিলেই তাঁহাকে ধরিয়া ঘরের বাহির করা, শৌচে লইয়া যাওয়া, তাঁহার মুখ ধুইবার জল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সরু গলাতে "পো" বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কোনও কাজে আমার দরকার হইলেই আমাকে "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেন। সর্ব্ববিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। মা আমাকে মারিলে আমি কাঁদিতাম। আমার ক্রন্দনের স্বর যদি তাঁহার কানে যাইত তাহা হইলে "বাবা কাঁদে কেন?" বলিয়া রাগিয়া ফাটাফাটি করিতেন। এইজন্য মা মারিলেই আমি আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া পোর নিকট গিয়া কাঁদিতাম। তৎপরে, পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়ীতে বসিয়া বিদায় আদায় যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই সুখে সংসার চলিত। কখনও কখনও গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গৃহে ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে, পোর জন্য বিদায়ের ডালি আসিত। ডালির অর্থ এই এক-খানি সরাতে একটু চিনি ও দশ বারটী সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, কি একটী গাড়ু, কি কতকগুলি মুদ্রা। আমি বাহিরে খেলা করিতে করিতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের অভিমুখেই যাইতেছে, তখনি সঙ্গ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহির বাড়ীর দিকে এক রকে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটী সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ছুঁয়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেন, "কার বাড়ী হতে"। ডালি-বাহক চীৎকার করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন "বাবা!" আমি অমনি ছোট ছোট অঙ্গুলিতে তাঁহার গা ছুঁইয়া দিতাম; ভাবিতাম বেশি চেঁচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজেরে কাছে রাখিয়া বলিতেন, "এই সন্দেশের সরা মাকে নিয়া দেও।" বাবা তো সরাখানি লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া অধিকাংশ সন্দেশ খাইলেন, শেষে রান্নাঘরের কাছে গিয়া বলিলেন, "মিত্রের বাড়ী থেকে ডালি এসেছিল, ঐ সে সরা।" এই বলিয়াই রান্নাঘরের দাবাতে সরাখানি

রাখিয়াই দৌড়। মা রাগিয়া পোর নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, "আমাকে কি ডাক্‌তে পার না? বড় যে বাবা বাবা কর, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।" প্রপিতামহ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, "হাঃ হাঃ বেশ করেছে, ওর জন্যই ত সব।" যখন সরাখানি আমার হাতে না পড়িয়া মায়ের হাতে পড়িত, তখন পো হাত দিয়া সন্দেশগুলি গণিয়া রাখিতেন। তারপর তাঁকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে ফাটাফাটি করিতেন, "আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি?" এ-সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হায়! তখন আমি তাঁর এতটা প্রেম বুঝি নাই।

আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই দুই তিনটা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। কদাকার বলিয়া মা তাকে "হনুমান" বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। আমার পোর পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত; তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বামহস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন। বলিয়া আসিতেন "মধ্যে মধ্যে বাড়ি গাছটা আপ্‌সো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়ি গাছটা লইয়া উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন। আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না। এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটী নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র

হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাত ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া উঠিয়া মাকে ইসারাতে ডাকিতে লাগিলেন "উ, উ!" মা আসিয়া দেখেন পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দৈয়ের দাগ, আর লুকাইবার জো নাই। পোর কাণে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উ কি? ঐ বাবা! বড় যে আদর দেও।" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হা হা বেশ করেছে, তবে ওই সব খাক্।" বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাব্ড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, "আচ্ছা ত বেরাল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেরাল হয়েছে।"

প্রপিতামহদেবের ধর্ম্মভাবও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি জপ তপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমতঃ প্রায় একঘণ্টা কাল দেব-দেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত; তৎপরে প্রায় আধঘণ্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধঘণ্টা কাল মাটীতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁর কপালের উপরে আবের মত মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কান পাতিয়া কোনও কোনও দিন শুনিতেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি তিনি বলিতেন, "মা মা! হারুর সুমতি করে দাও।" তাহা আমার বাবার জন্য প্রার্থনা। সর্ব্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিব্যর সময় আমার ডাক হইত, "বাবা।" বাবা আমি তখন দিগম্বরমূর্ত্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন। এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাতে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টি দিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে।

"দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।"

এই গান প্রতিদিন।

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্ম্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমাকে কোলে লইয়া বসিয়া মুখে মুখে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি

শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অবশ্যজ্ঞাতব বিষয়-সকল শিখাইতেন। যথা—প্রপিতামহের নাম কি? প্রশ্ন করিয়াই তদুত্তরে বলিতেন—"বল—শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার।" আমি বাল্যস্বরে বলিতাম—শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তৎপরে দেব-দেবীর যে-সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন তাহার সকলগুলি মনে নাই; একটী মনে আছে, তাহা এই:—

সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
স্মরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমস্তুতে॥

আর-একটা কথা স্মৃতিতে আছে। আমি জ্বরে পড়িলে বা অন্য কোন প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন; এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন, ও মুখে মুখে ইষ্টদেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। আমার বোধ হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঝাড়িয়া দেওয়াতে অনেক সময়ে আমার জ্বর সারিয়া যাইত। এইজন্য জ্বরে আমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইলেই আমি "পোর কাছে নে যা," বলিয়া কাঁদিতাম।

এই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষের স্মৃতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যাহা কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে। সে-সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলা ফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বল্‌তে পার্‌বে, সেটি হচ্ছে 'প্যাঁচা'।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন? তার নানা কারণ আছে। প্রথমতঃ যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোয় বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চল্‌বার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাঁচা টিয়া'। এদের ডানা ছোট বলে ভাল করে উড়্‌তে পারে না; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখীরা

ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানা রকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও এ রকমে শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।



কোন কোন জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ, বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝল্‌সে যায়। সাপ, ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি যে সব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়। তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাক্‌তে চায়।

আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভাল রকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় মাংসখোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানা রকম পোকা মাকড় বেরোয় তাই পোকা-খোর জন্তুরাও ঐ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চাম্‌চিকারা বা 'নাকাটী' পাখীরা ব্যস্ত হ'য়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভাল করে দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তারা উড়্‌তে উড়্‌তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

'লেমার' বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হ'লেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিক্‌টিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড় হয় দিনের বেলায় এক সঙ্গে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিক্‌টিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভাল।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি ত নেহাৎ ছোট নয়, সে উড়্‌তেও পারে বেশ; অথচ উড়্‌বার সময় তার ডানা ঝাপটের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়না। রাত্রে অন্ধকারে দেখ্‌তে হয় বলে তাদের চোখ দুটোও তেম্‌নি ক'রে তৈরী। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মত বড় আর গোল গোল হয়। সেই জন্য অনেক সময়

তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যে সব ক্ষুদে বানরদের কথা আগে বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোছের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। এখানে যে বানরের ছবি দেওয়া হল তার নাম 'টার্সীয়ের'। যে দেশে এর বাড়ী সেখানকার লোকেরা একে 'ভূত বানর' বলে। এর সমস্ত কপাল জোড়া বড় বড় চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মত হাত পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চাল চলনের ধরণ। কারও কোন অনিষ্ট করে না কেবল পোকা মাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মত ভয় করে। তার একটা কারণ সে নিশাচর।



আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশী পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়ীতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্ব্বনাশ করে তাদেরও "শিকার" কর্‌বার সুবিধা হয় রাত্রে। আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন ক'রে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল ষ্টীমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্ম্মের জন্য নিশাচর হ'তে হয়। ভোর বেলা যে খবরের কাগজটি পড় তার জন্য যে কত লোককে রাত জেগে খাটতে হয় তা কখন ভেবে দেখেছ কি? আর রেলে ষ্টীমারে ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি কত জনকে যে, দিনের পর দিন, রাত মজুরি খাট্‌তে হয়, তারাও এক রকম নিশাচর বই কি?

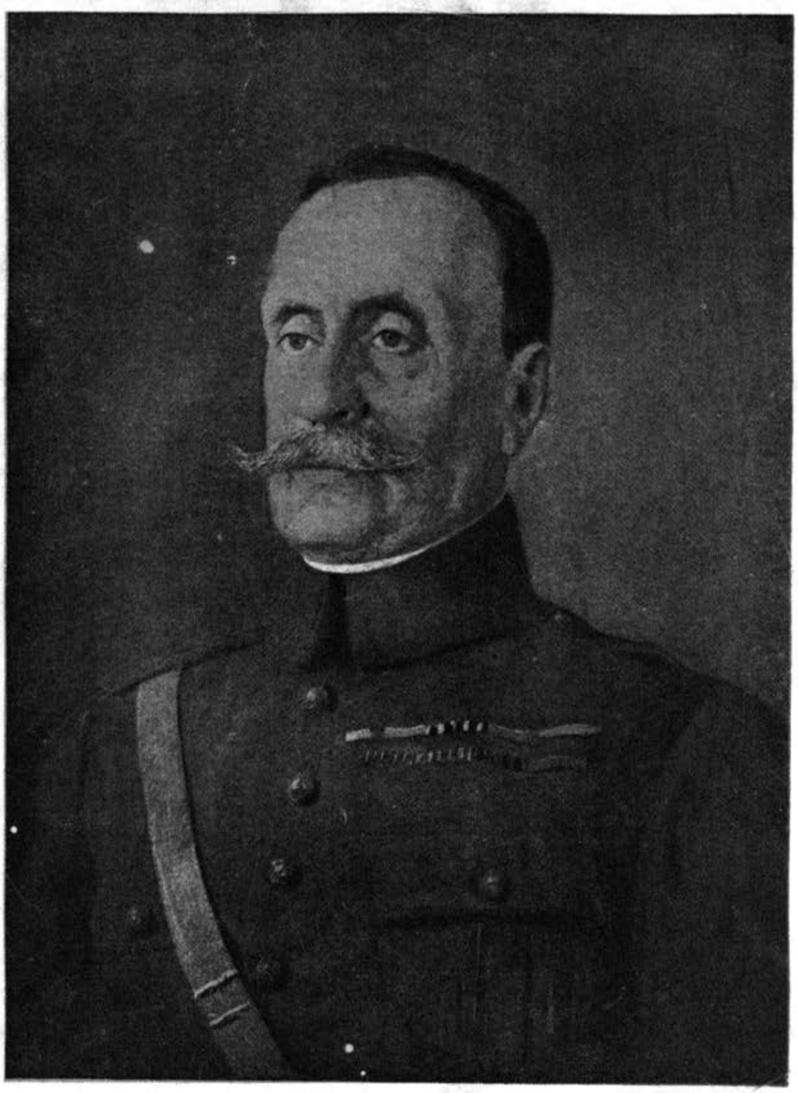
অবুঝ

ও শ্যামাদাস! আয়ত দেখি, বস্‌ত দেখি এখেনে—
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব, আজকে এবার দেখেনে!



জ্বর হ'য়েছে? মিথ্যে কথা, ও সব তোদের চালাকি!
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলে,—শুন্‌তে পাইনি? কালা কি?
মামার ব্যামো? ওঝা ডাক্‌বি? ডাকিস্‌ গিয়ে বিকেলে;
না হয় আমি বাৎলে দেব বাঁচবে মামা কি খেলে।
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব
না বুঝ্‌বিত মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।
কোন্‌ কথাটা? তাও ভুলেছিস্‌? ঝেড়ে দিছিস্‌ হাওয়াতে।
কি বল্‌ছিলাম জ্যষ্ঠি মাসে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিস্‌নিত বেশ করেছিস্‌ আবার শুন্‌লে ক্ষেতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্‌, মাড়াস্‌নে যে এদিক্‌ই!

বল্‌ছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন ? বোস্ তাহ'লে নীচুতে,—
আজকালের এই ছেলেগুলোর তর সয়না কিছুতে।
আবার দেখ! বস্‌লি কেন? বইগুলো আন্ নামিয়ে—
তুই থাক্‌তে মুটের বোঝা পাড়্‌তে যাব আমি এ ?
সাবধানে আন্, ধর্‌ছি দাঁড়া—সেই আমাকেই ঘামালি—
এই খেয়েছে! কোন্ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি!
চুপ ক'রে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না,
একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখত দেখি আজও আমার মনের তেজটী নেভেনি—
এইবারে শোন্ বল্‌ছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি!
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগা গোড়াই সবি তার,
তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর্
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর"।
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝ্‌ছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরি মধ্যে হাই তুলিস্ যে? পুঁতে ফেল্‌ব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচ্‌তে স্থুরু, ফাঁদত বাবা দেখনি!
কি বল্লি তুই ? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা ?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষ্মীছাড়া বখাটা!
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই কো পেরোবার
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দবার কি তেরো বার।
সাতান্ন তুই গুণতে পারিস্? মিথ্যেবাদী! গুণে যা—
ও শ্যামাদাস! পালাস্ কেন্? রাগ করিনি, শুনে যা।



সেনাপতি ফশ্

সন্দেশ

ষষ্ঠ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৫ | একাদশ সংখ্যা

নমস্কার

নমস্কার, করি নমস্কার,
যাঁর করুণার বলে,
যাঁর ধরণীর কোলে,
যাঁর দেওয়া দেহে করি আহার বিহার;
যাঁর নদী, যাঁর জল,
তরু লতা, ফুল ফল,
পশু পাখী সবি যাঁর প্রীতির সম্ভার ;
স্বর্গ, মর্ত্ত রসাতল,
গ্রহ উপগ্রহ দল,
চন্দ্র, সূর্য্য, নভঃ, তারা, নীহার, তুষার,
যাঁর আমি, যাঁর তুমি,
স্থাবর জঙ্গম ভূমি,
পাহাড় পর্ব্বত যাঁর, যাঁর পারাবার ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
যাঁর বিনা নাহি দেখি,

সূক্ষ্ম অণু পরমাণু, নিখিল সংসার;
অনলে অনিলে জলে,
মরু, মেরু, বনস্থলে,
দ্যুলোকে ভূলোকে ভায়, মূরতি যাঁহার;
নিশিদিন যাঁর ধ্যানে,
রূপে, রসে, গন্ধে, গানে,
প্রকৃতি আপনি রহে মগ্ন অনিবার;
জোড় করে সবে তাঁরে,
ভক্তিভরে বারে বারে,
নমস্কার, করি নমস্কার।

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চুলাল

(৩)

শীতের ঝোড়ো রাত, কড় কড় করে বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ অনবরত এম্নি চমকাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন সারাটা আকাশে আগুন লেগেছে। পঞ্চু বেচারী বজ্র বিদ্যুৎকে ভারী ডরাত। কিন্তু মনে হয় যেমনই হোক পেটের ক্ষিদেটা তার চেয়েও ভয়ানক। করে কি, কাজেই বাড়ীর দরজা আবজে দিয়ে, পাড়ার দিকে দৌড় দিলে। রাস্তা সব অন্ধকার, দোকান পাট বন্ধ, পথে একটা কুকুরেরও লাগাল পাবার যো নেই। মনে হচ্ছিল সহরটা যেন মরে পড়ে আছে। এস্থলে আর এ সময়ে ভিক্ষার আশা দুরাশা। ঝোড়ো কাকের মত ভিজে, কাঁপতে কাঁপতে পঞ্চু ফের বাড়ী ফিরল। ক্ষিধেয়, শ্রান্তিতে, বৃষ্টিতে ভিজে এম্নি কাঁপুনিটাই ধরেছে যে দাঁড়াতে পারে না। উনোনে কাঠকুটো দিয়ে একটু আগুন করে তারি পাশে শুয়ে পড়ল। শরীরটা গরম করবে বলে চুলোর পাশেই শুয়েছিল, আর পা দুখানি হিমে অসাড় হয়ে গিয়েছে বলে চুলোর মুখে এগিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পা দুখানি কাঠের, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে তাতে আগুন লেগে পুড়ে কয়লা হয়ে উঠেছে সে বোধও তার

ছিল না। সে এম্নি নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগ্‌ল যে পা দুখানি যেন আর কারো। সবে ভোর হতে আরম্ভ হয়েছে এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। পঞ্চু হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ওখানে? দরজা ঠেলে কে?"



উত্তর শুনলে "আমি"—গলার আওয়াজে বুঝলে, এ তার বাপ গুপী। পা যে পুড়ে কয়লা হয়েছে, পঞ্চু তখনও সে কথা জানতে পারেনি, উঠে যেম্নি দরজা খুলতে যাবে অম্নি ধড়াম করে পড়ে গেল।

গুপী চীৎকার করে বলছে "দরজা খোল্ শীগ্‌গির।"

মাটিতে পড়ে গড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পঞ্চু বল্লে "বাবাগো! আমি আর উঠ্‌তে পারিনে"—"হয়েছে কি? উঠ্‌তে পারছ না কেন?"

"আমার পা দুটো কিসে খেয়ে ফেলেছে।" "কিসে আবার তোর পা খেলে"?

"নিশ্চয় ঐ বেড়ালটা খেয়েছে—সত্যি বলছি পা দুটো নেই। হায় হায়! এ জন্মে আর দাঁড়াতে পারব না"।

গুপী মনে করছে বুঝি এ তার কেঠো ছেলের আর একটা তামাসা। তখন আর তার মজা ভাল লাগছিল না, তাই আর দরজা খুলবার অনুরোধ না করে, নিজেই দেয়াল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। বড্ড রাগই তার হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখলে তার অত সাধের পঞ্চু মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পা দুখানি

পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে, তখন ভারী দুঃখু হল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে কত চুমোই খেলে, 'যাদু সোণা মাণিক' বলে কত আদরই করলে, আর তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুপী বল্লে, "পঞ্চু বাপ্, হায় হায়, কি করে পায়ের এমন দশা করলি ?"

পঞ্চু বল্লে "তা জানিনে বাবা, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, যে রাত আমার কেটেছে, এ জীবনে আর তা ভুলব না। সারারাত বাজ পড়ার কি ধুম, তার উপর বিদ্যুৎটা মশাল জ্বালিয়ে সারাটা আকাশময় নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল, ক্ষিদেয় আমার পেটের মধ্যে হায় হায় করছিল, তারপর রাক্যবাগীশ ঝিঁ ঝিঁ পণ্ডিত আমায় বল্লে কি, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ; যেমন শয়তান তুমি, তেম্নি সাজা পেয়েছ। আমি তাকে বল্লাম, চোপরও, মুখ সামাল করে কথা কও"। সেকি থামে, আবার বল্লে একেত পুতুলনাচের কাঠের মূর্ত্তি ; তার উপর আবার মাথাটি একেবারে নিরেট। বুদ্ধি আসবে কোথা হতে ? হাতুড়িটা ছুঁড়ে মারলাম, মাথায় লেগে, ম'রে খড় হয়ে পড়ে রইল। ক্ষিদেয় তখন প্রাণ আমার আসি যাই করছে, খাবার খুঁজে কোথাও এক দানাও কুড়িয়ে পেলাম না, বড্ড কাঁপুনি ধরেছিল, তাই খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে চুলোর ধারে পা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর তুমি যখন এলে, দরজা খুলতে উঠতে গিয়ে দেখি, পা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। ক্ষিদে তেম্নি রয়েছে শুধু পা দুখানি নেই"। বল্‌তে বল্‌তে পঞ্চু হুহু করে কেঁদে উঠল। পঞ্চুর সে বিলাপ বহু দূর পর্য্যন্ত শোনা গেল।

এই বাজে কথার ঘণ্টর মধ্যে হতে, ভাজা বড়ির মত পরিষ্কার যে তত্ত্বটি পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—পঞ্চুর পা দুটি অন্তর্ধান, কিন্তু ক্ষুধানল রাবণের চিতার মত কেবলি জ্বলছে। তিনটে কচি শসা গুপী তার হাতে দিয়ে বল্লে, "আমি এই কটা সকালে খাব বলে রেখেছিলাম, ধর তুই নে, এখন খা"।

পঞ্চু বল্লে, "বাবা খোসা ছাড়িয়ে দাও, নইলে খাই কি করে"।

গুপী বল্লে—খোসা ছাড়ান আবার কি ? অত বাবুয়ানা ভাল নয়।"

পঞ্চু বল্লে "তা বলে কচ্‌কচিয়ে খোসাশুদ্ধ ওগুলো খেতে পারব না। খোসা আমার সয়না !"

গুপী আর করে কি, ছুরি এনে ধীরে সুস্থে খোসা এক ধার করে রেখে শসা কটি ছাড়িয়ে পঞ্চুকে দিলে। পঞ্চু বাবু আস্তে আস্তে দেখে শুনে তার আশ পাশের শাঁস

খেয়ে বিচীর দিকটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, গুপী তার হাত খানা ধরে ফেলে বল্লে, "কর কি ? খোসা ফেলে দিলে, আবার বীচি ফেল্‌বে ! তাও কি হয় ? না খাও রেখে দাও, কত কাজে আস্‌তে পারে। পঞ্চু বল্লে, "যাই বল আর যাই কর, বীচি কিন্তু আমি গিলছিনে, ও আমার সইবে না।"

শসা তিনটি খাওয়া শেষ করে পঞ্চু বলে উঠ্‌ল, "কই বাবা ক্ষিধে ত গেলনা, পেট যে তেম্নি হুহু করছে।" গুপী বল্লে, "যা ছিল বাছা সব তোমায় দিয়েছি, আর কিছুই নেই।" পঞ্চু গম্ভীর ভাবে বল্লে, "যদি কিছু নাই থাকে, তবে খোলাটাই খেতে হবে।" প্রথমে মুখে দিয়ে, ভারী মুখ ভিরকুটী করলে, তিতো ওষুধ গিল্‌বার সময় আমরা যেমনটা করি আর কি। তারপর একে একে তিনখানি খোলাই পার করে, বীচির ভাগটাও খেয়ে সব শেষ করে বল্লে, "হ্যাঁ, এবারে একটু একটু পেট ভরেছে মনে হচ্ছে।"

ক্ষুধা নিবৃত্তি হবামাত্র পঞ্চুরাম আরেক জোড়া নতুন পায়ের জন্য বায়না ধরে বস্‌লে, কান্নাকাটি আপসা আপসি চলতে লাগ্‌ল। ছেলের দুষ্টামির শাস্তি দেবার মতলবে, গুপী দুপুর বেলাতক সেদিকে মনই দিলে না—তারপর বল্লে, তোমার নতুন পা যে গড়ে দেব, কেন ? আবার ছুটে পালাবার জন্যে বুঝি ? ফোঁপাতে ফোঁপাতে পঞ্চু বল্লে—"এখন থেকে একেবারে লক্ষ্মীছেলে হব, সব কথা শুনব।"

গুপী বল্লে, "ওসব আমার বেশ জানা আছে, আদায় করবার ফন্দীতে সব ছেলেই অম্নি বলে থাকে।"

"না, গো না, সত্যি ক'রে ভাল হব, স্কুলে যাব, লেখা পড়া কর্‌ব, কাজ কর্ম্ম শিখব।" গুপী বল্লে "কাজ হাসিল করবার সময় সব ছেলেই ওরকম বলে।"

পঞ্চু বল্লে, "আমি কি অন্য ছেলের মত ? আমি তাদের চেয়ে ঢের ভাল।"

গুপীনাথ যদিও খুব গম্ভীর হয়েই রইল, তবু পঞ্চু বেচারীর কাকুতি মিনতি শুনে শেষটায় ছেলের জন্যে এক জোড়া পা বানাতে সুরু করে দিলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুখানি ছোট্ট সুন্দর চটপটে ছটফটে পা তৈরি হয়ে গেল। সে পা দুখানি দেখ্‌লেই গুপী যে কেমন ওস্তাদ কারিকর তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। কাজ শেষ করে পঞ্চুকে বল্লে "দেখ্ বাছা, চোখ বুজে এখন একটু ঘুমতো দেখি।"

ঘুমবার ভান করে পঞ্চুলাল চুপটি করে চোখ বুজে পড়ে রইল। সেই অবসরে শিরিষ দিয়ে গুপী পা দুখানি জুড়ে দিলে। সে জোড় এম্নি বেমালুম হ'ল যে নতুন পা যে লাগান হয়েছে তা আর কারো বুঝবার সাধ্য রইল না।

পঞ্চু যেম্নি বুঝ্‌লে যে ভাঙা পা জোড়া লেগেছে, অম্নি খাটিয়া হতে লাফিয়ে নেমে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল। তখন ভয় হতে লাগ্‌ল যে আহ্লাদের চোটে দুখানা পা আবার না আটখানা হয়ে যায়।

দৌড়ে গিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, "দেখ বাবা, আমি লক্ষ্মী ছেলে হই কিনা। তুমি এখ্‌খুনি আমায় পাঠশালায় দিয়ে এসো, আমি পড়াশোনা কর্‌ব"।

গুপী খুসী হয়ে বল্লে, "এইতো সুবোধ ছেলের মত কথা"—পঞ্চু বল্লে,"বাবা, ইস্কুল যেতে হলেত কাপড় চাই, তুমি আমায় কাপড় চোপড় বানিয়ে দাও"।

গুপীনাথের হাতে কাণা কড়িও ছিল না। কি করে, তাই ফুলকাটা কাগজ দিয়ে এক জোড়া জামা পাজামা, গাছের ছাল দিয়ে এক জোড়া জুতো আর রাঙা সালুর এক টুকরো দিয়ে একটি কাণঢাকা টুপি করে দিলে।

সাজ গোজ হবার পর পঞ্চু দৌড়ে আপন চেহারা দেখাতে চল্ল। ঘরে আয়না ছিল না, এক কোণে ছোট্ট একটি গামলাতে জল ছিল, তারি মধ্যে আপন ছায়া দেখে পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে? সে পেখম ছড়ান ময়ুরের মত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, "আমায় যে একেবারে ভদ্দর লোকের মত দেখাচ্ছে।"

গুপী বল্লে, "তাতো দেখাচ্ছেই, কিন্তু বাছা, বাহারে পোষাক পরলেই ভদ্রলোক হয় না, সে পোষাক পরিষ্কার থাকা চাই।"

পঞ্চু বল্লে, "পাঠশালায় গেলে আমার পেরথম ভাগ, সেলেট, পেন্সিল সব যে চাই।

"তাতো চাই, কিন্তু কি করে পাওয়া যায় সেই হচ্ছে কথা।"

"কেন? কিন্‌লেই হয়।" "কিন্‌তে যে পয়সা চাই তা আস্‌বে কোত্থেকে?"

"আমার তো পয়সা নেই বাবা।"

মুখখানি বিষণ্ণ করে গুপী বল্লে, "আমার হাতেও যে একটি পয়সাও নেই।" পঞ্চুর মেজাজটা খুব হাসিখুসী হলেও বাপের বিষণ্ণ মুখ আর তাঁর পয়সার অভাব দেখে হাসিখুসী কোথায় উড়ে গেল, মুখখানি কাঁদ কাঁদ হল, চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগ্‌ল। পয়সার অভাবটা এম্নি বিশ্রী জিনিস যে তা বুঝতে কারো দেরী হয় না। ছোট ছেলে যে কোন কিছু বোঝেনা, সেও এটা চট করে বুঝে ফেলে।

হঠাৎ "সবুর কর"—এই কথা বলেই গুপী তার সাত-তালি-দেওয়া পুরাণ র‍্যাপার খানা গায়ে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল তার হাতে নূতন প্রথম ভাগ, সেলেট আর পেন্সিল—কিন্তু গায়ে আর তার র‍্যাপার খানি নেই। হাসি মুখে পেন্সিল সেলেট নতুন বই হাতে করে নিয়ে পঞ্চু বাপের দিকে চেয়ে দেখে র‍্যাপারখানি গায়ে নেই।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "র‍্যাপার কোথায় গেল বাবা"? "বেচে ফেলেছি।" "কেন বেচলে?" "বড্ড গরম হচ্ছিল তাই আর গায়ে রাখতে পারলাম না।"

আসল কথাটা বুঝতে পঞ্চুর আর বাকী রইল না। বাপ যে তাকে কত ভালবাসে সে কথাটা বুঝ্‌তে পেরেই, সে লাফিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে; এগালে ওগালে কত যে চুমো দিলে তার ঠিক নেই। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বেদব্ভ জাতক

[বৌদ্ধদের পুরাণে বলে যে বুদ্ধদেব অনেক সহস্র বার নানারূপে ও নানা অবস্থায় এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তারপর শেষ জন্মে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে বার বার জন্মিয়া যিনি বুদ্ধ হইলেন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়; এবং তাঁহার এই সমস্ত পূর্ব্বজন্মের কাহিনীর নাম "জাতক"।]

বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি "বেদব্ভ" মন্ত্র জানিতেন। সে বড় আশ্চর্য্য মন্ত্র! কোন বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র এক সঙ্গে হইলে, উপরের দিকে চাহিয়া এই মন্ত্র পড়িবামাত্র আকাশ হইতে রত্নবৃষ্টি হইত! কোন জন্মে বোধিসত্ত্ব বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এই ব্রাহ্মণ কোন কাজে চেতিয়রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন পার হইয়া যাইতে হয়। সেই বনে 'প্রেষণক' নামে পাঁচ শত দস্যু থাকে। ইহাদের জন্য পথিকদিগকে বড় বিপদে পড়িতে হইত। এই দস্যুদল পথিক ধরিয়া একজনকে ধন আনিবার জন্য 'প্রেষণ' অর্থাৎ প্রেরণ করিত; তাই ইহাদের নাম ছিল 'প্রেষণক' দস্যু। যাহাকে ধন আনিবার জন্য পাঠাইত তাহাকে দস্যুরা বলিয়া দিত—"তুমি ধন আনিয়া তোমার সঙ্গীদিগকে মুক্ত কর।"

পিতাপুত্রকে ধরিলে পুত্রকে পাঠাইত ; গুরুশিষ্যকে ধরিলে শিষ্যকে ধন আনিতে পাঠাইত।



ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ত্ব এই বনে গেলে পর দস্যুরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল এবং দলের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে ধন আনিতে পাঠাইল। যাইবার সময় বোধিসত্ত্ব গুরুকে চুপি চুপি বলি-লেন—"আমি দুই এক দিনের মধ্যেই ধন লইয়া ফিরিব। একটি কথা মনে রাখিবেন—আজ কিন্তু রত্নবর্ষণের যোগ আছে! সাবধান! ভয় পাইয়া মন্ত্র পড়িয়া রত্ন-বর্ষণ করাইবেন না ; তাহা হইলে কিন্তু আপনি এবং এই দস্যুরা সকলেই মারা যাইবেন!" এই বলিয়া গুরুকে সাবধান করিয়া দিয়া বোধিসত্ত্ব ধন আনিতে চলিয়া গেলেন।

বাঁধনে থাকিয়া ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পর দেখিলেন, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে—জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলো হইয়াছে। আকাশে নক্ষত্র দেখিয়া বুঝিলেন রত্নবর্ষণের যোগ উপস্থিত! তখন তিনি ভাবিলেন—"মিছামিছি কেন এই কষ্ট ভোগ করি?

রত্নবর্ষণ করাইয়া দস্যুদিগকে ধন দিলেই ত আমাকে ছাড়িয়া দিবে ?" এই ভাবিয়া দস্যুদিগকে বলিলেন—"ধন পাইলেই ত আমাকে ছাড়িয়া দিবে বলিয়াছ ? তবে আমার বাঁধন খুলিয়া দাও, এখনই আমি ধন দিতেছি।" একথায় দস্যুরা তখনই ব্রাহ্মণের বাঁধন খুলিয়া দিলে পর, তিনি মন্ত্র পড়িয়া যেই আকাশের দিকে তাকাইলেন, অমনি রাশি রাশি রত্নবৃষ্টি হইল। তখন দস্যুদের আনন্দ দেখে কে! পুঁটুলি বাঁধিয়া রত্ন লইয়া তাহারা চলিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের পিছন পিছন চলিলেন।

এইরূপে খানিক দূর গেলে পর হঠাৎ পাঁচশত দস্যু আসিয়া প্রেষণক দস্যুদিগকে ধরিয়া ফেলিল! প্রেষণকেরা জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদিগকে ধরিলে কেন ?" তাহারা বলিল—"ধনের জন্য।" প্রেষণকেরা বলিল—"যদি ধন চাও তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ইনি আকাশের দিকে তাকাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমাদের নিকট যে ধন আছে, তাহা ইনিই দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় দস্যুদল প্রেষণকদের ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বলিল—"ঠাকুর! শীঘ্র ধন দাও।" ব্রাহ্মণ বলিল—"ধন দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে যোগে রত্নবর্ষণ হয় সেই যোগ আবার এক বৎসর পরে ফিরিবে। তোমরা যদি ততদিন অপেক্ষা করিতে পার, তবেই ধন পাইবে।"

ইহা শুনিয়া দস্যুরা রাগে আগুন হইয়া বলিল—"কি! তুমি প্রেষণকদিগকে ধন দিলে আর আমাদিগের বেলাই বলিতেছ এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে ?" এই বলিয়া তলোয়ার দিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে কাটিয়া ফেলিয়া প্রেষণকদিগের পিছনে ছুটিল। খানিক দূর গেলে পরই দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! প্রেষণকদলের একজনও বাঁচিয়া রহিল না; তাহাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া দ্বিতীয় দল সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। কিন্তু পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়! তখন আবার আর এক কাণ্ড উপস্থিত! দ্বিতীয় দস্যুদল আবার দুই দল হইয়া ধনের জন্য আপনাদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিল! দেখিতে দেখিতে সব দস্যু শেষ হইয়া, বাঁচিয়া রহিল মাত্র দুই জন!

সেই দুই জন সমস্ত ধন লইয়া নিকটস্থ বনের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল। তারপর একজন রহিল সেই ধন পাহারা দিবার জন্য, আর একজন গেল গ্রামে—চাল ডাল কিনিয়া আহারের যোগাড় করিবে বলিয়া।

লোভই মরণ ডাকিয়া আনে। যে ধনের পাহারায় রহিল, সে ভাবিল—"সঙ্গীটা ফিরিয়া আসিয়া এই ধনে ভাগ বসাইবে। তাহাকে ভাগ না দিয়া সে আসিবামাত্র তলোয়ারের এক কোপে কাটিয়া ফেলিনা কেন ?" এই ভাবিয়া সে সঙ্গীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে বাজারে গিয়াছিল সেও ভাবিল—"ধনের অর্দ্ধেক ও লোকটাকে দিতে হইবে! কিন্তু ভাতে যদি বিষ মিশাইয়া দেই তবেই ত আপদ চুকিয়া গেল—খাইবামাত্র সঙ্গীটি মারা পড়িবে, তারপর আমিও সব ধন একাই ভোগ করিব!" এই ভাবিয়া সে অর্দ্ধেক ভাত খাইল এবং বাকি ভাতে বিষ মিশাইয়া সঙ্গীর নিকট লইয়া গেল। তারপর যেই ভাতের পাত্রটি নামাইতে যাইবে অমনি তাহার সঙ্গী এক কোপে তাহাকে একেবারে দুই ভাগ করিয়া তারপর শরীরটাকে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু পরে সেই বিষমাখা ভাত খাইয়া হতভাগার নিজেরও মরণ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। এইরূপে ধনের জন্য শুধু ব্রাহ্মণ নয়, দুইদল দস্যুও মারা গেল!

এদিকে বোধিসত্ত্ব দুই তিন দিন পরে ধন লইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—চারিদিকে রত্নের ছড়াছড়ি! গুরু যে তাঁহার কথা না শুনিয়া রত্নবর্ষণ করিয়াছেন, সে কথা বুঝিতে তাঁহার আর বাকি রহিল না। আর ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, সেই রত্নের জন্য সকলেই মারা গিয়াছে! তখন পথে চলিতে চলিতে খানিক দূর গিয়াই গুরুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বড় দুঃখ হইল। যাহা হউক, গুরুর সংকার করিয়া আরও খানিক দূর গিয়া দেখিলেন পাঁচশ প্রেষণক এবং দ্বিতীয় দলের চারশ আটান্নব্বুই দস্যু মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—"হাজার দস্যুর মধ্যে দেখিতেছি দুইজন শুধু বাঁচিয়াছে। তাহারা গেল কোথায় ? তাহারাও ধনের লোভে ঝগড়া করিয়াছে"! এই ভাবিয়া খানিক দূর গিয়া দেখিলেন, রাজপথ হইতে আর একটা ছোট পথ গ্রামের নিকটস্থ একটা জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। তিনি সেই পথে বনের দিকে গেলেন।

বনে খানিক ঢুকিয়া দেখিলেন—এক স্থানে রাশি রাশি রত্ন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, নিকটেই একটা দস্যুর শব, আর তাহার পাশে একটা মাটির পাত্রে ভাত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব সব ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং অন্য ব্যক্তিকে খুঁজিতে লাগিলেন। পরে বনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও শব দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন—"হায় রে হায়! গুরু আমার কথা না শুনিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া রত্নবর্ষণ করাইলেন! তাহার ফলে তিনিত মরিলেনই আর এই হাজার দস্যুর প্রাণ গেল"!

এইরূপে দুঃখ করিলে পর বোধিসত্ত্ব সমস্ত ধন লইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সারা জীবন কত যে দান করিলেন তাহার সীমা নাই! এইরূপে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যথাকালে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

শাস্ত্রীমহাশয়ের বাল্যকথা

(২)

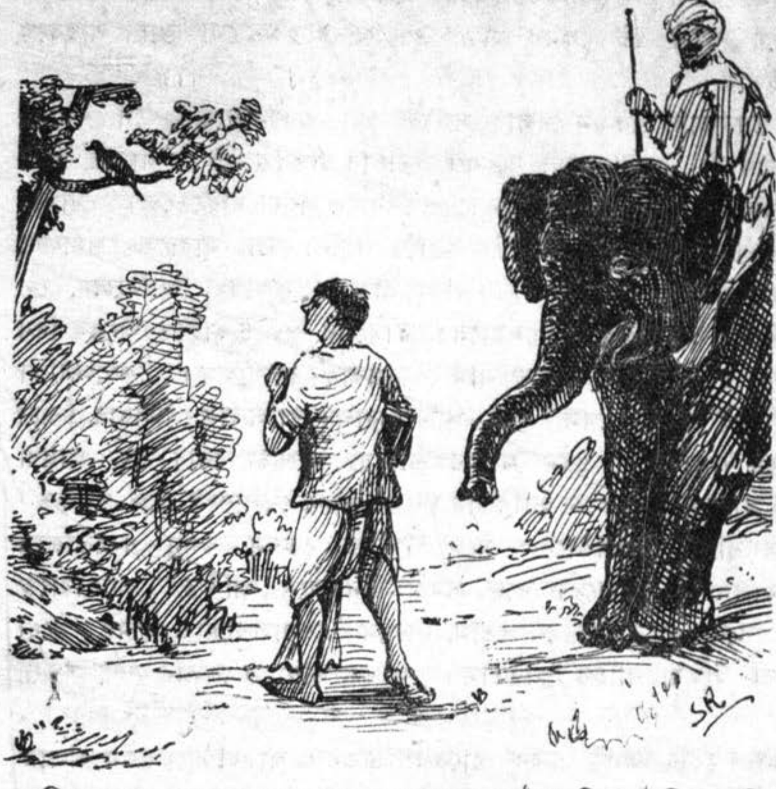
আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুন্‌টুনি, বুল্‌বুলি, দয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ওসকল তো পুষিয়াছি, পীঁপ্‌ড়াও পুষিতাম। ফড়িং ও পীঁপ্‌ড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্ব্বার ঘাস খাওয়াইতাম, পীঁপ্‌ড়াদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পীঁপ্‌ড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভাল লাগিত, যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে তখনও পীঁপ্‌ড়া হইয়া চারি হাত পায় পীঁপড়াদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম; দিয়া কখন্ পীঁপ্‌ড়া আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধ ঘণ্টার পর সেখানে একটী পীঁপ্‌ড়া দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটীর পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাঁংরা কাঠিটীর উপরে একবার উঠে, একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্যদল বাহির হইল। পীঁপ্‌ড়ার সারি; মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পীঁপ্‌ড়া। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত। তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটী তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্ত্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখামুখী করিয়া

কি সঙ্কেত করিল, যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটীর নিকটে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না ? কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, চুপ কর, চুপ কর, পীঁপ্‌ড়েরা কি বল্‌ছে শুনি। ইহা দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা হাসা-হাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত।

তৎপর পাখী ধরিবার ও পুষিবার জন্য অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখীর বাসা হইতে বাচ্ছা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তার মায়ের মত যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে-জাতীয় পাখীরা কি খায়, তাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায়, এ-সকল সংবাদ পাড়ার ডাংপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম, সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া, তার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তার মধ্যে বাচ্ছা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তারপর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মত করিতাম ; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সজোরে তার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখীকে খাওয়াইতাম।

তখন আমি যেমন পীঁপ্‌ড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তেমনি পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও ভালবাসিতাম। যদি দৈবাৎ উঠানে কোনও পাখী আসিত, তাহা হইলে আমি মা, খুড়ী জেঠী যে কেহ সে সময় কথা কহিতেন, সকলের মুখ চাপিয়া ধরিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পাখী এসেছে।" একবার পাখী দেখিতে গিয়া হাতীর পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তখন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের হাতী যাইত। কারণ, রেল বা রাস্তা ঘাট ছিল না। একবার আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি ; দপ্তরটী বগলে আছে। এমন সময় হঠাৎ একটী নূতন রকমের পাখী দেখিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া চমৎকার শীস দিতেছে। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলাম, "এ কি পাখী ?" নিমগ্নচিত্তে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ওদিকে

পোলবন্দী সাহেবের হাতী আসিতেছে। মাহুত চেঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা, "ওরে অমুকের ছেলে, মলি মলি, পালা পালা" বলিয়া চেঁচাইতেছে। আমার সে-দিকে খেয়াল নাই। কানে একটা আওয়াজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতী শুঁড় দিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মাহুত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেছে। হাতীর শুঁড় দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া সরিয়া গেলাম।



মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে আমি দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে কেন কেন বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। যথা, তাঁহার কোলে চড়িয়া আর-এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নূতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু? উত্তর—পুঁটেদের গরু। প্রশ্ন—এখানে কেন রেখে গেছে? উত্তর—ঘাস খাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস খাবে? উত্তর—ক্ষিদে পেয়েছে বলে। প্রশ্ন—কেন ক্ষিদে পেয়েছে? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে।

প্রশ্ন—কেন খায়নি? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাব্‌না দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাব্‌না দেয়না? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গরীব কাকে বলে? ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এই কেনর মাত্রা এত অধিক হইত যে উত্তরের পরিবর্ত্তে চপেটাঘাত পাইতাম।

আমাদের তখনকার একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্মরণ আছে। সে শেয়াল-খাকী। শেয়ালখাকী একটা মাদী কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্ছাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁর দয়ার আবির্ভাব হইল। তিনি হৈ হৈ করাতে ও ঢিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্ছাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাবা বাচ্ছাটা কুড়াইয়া আনিলেন, সে তখন অতি শিশু। তাহার পৃষ্ঠে শেয়ালের কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহার নাম শেয়ালখাকী রাখিলেন। শেয়ালখাকী আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল, এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মস্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়, আমরা শেয়ালখাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখন বনভোজনে যাইতাম। শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম, তখন শেয়ালখাকীও বনের মধ্যে লুকাইত, আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিয়া জানিতাম।

শেয়ালখাকীর দুইটী কীর্ত্তি স্মরণ আছে। একবার আমরা কয়েকজন বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদের একটা পুরাতন ভাঙ্গা দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়রা থাকিত। আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম। কিন্তু দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাতে এত গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য প্রায় পাঁচ ছয় জন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত। দরজা জানালার গর্ত্তে গর্ত্তে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আর একজন পায়রাদিগকে তাড়াইয়া ধরিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারিজন বৈ জুটিল না। আমরা আর-একটি বালক খুজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি শেয়ালখাকী আসিতেছে। শেয়াল-

খাকীকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই শেয়ালখাকীর দ্বারাই কাজ চলিবে। বলিলাম "শেয়ালখাকি! আয় আয় পায়রা ধরতে যাই।" শেয়ালখাকী অমনি প্রস্তুত! আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এক একজন বালক এক এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নীচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল, শেয়ালখাকীকে বলা গেল, "শেয়ালখাকি! এই গর্ত্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক্, দেখিস যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিস্‌নে।" তখন আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্য্য বোধ হয়, শেয়ালখাকী কিরূপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। পরে পায়রাদিগকে যখন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাগুলি তার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন না জানি শেয়ালখাকীর স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে জুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা করিল না; আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটী ঘটনা এই।—আমাদের বুধী বলিয়া একটী গাভী ছিল। তাহার একটী রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে লইয়া মাঠে যাইত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত। একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল। তাকে চরায় কে? এইরূপে দুই একদিন গেল। পরে আমি বলিলাম, "বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আন্‌তে পারে।" শুনিয়া বাবা হাসিলেন, "হাঁ, কুকুর আবার গরু চরাবে?" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমার কথাতে যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠান স্থির হইল। কেমন করিয়া গরু চরাইতে হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া গেল, সে গরু লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, একা শেয়ালখাকী চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে; সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়। শেষে বাবা বুঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের

দুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিয়া দেখি একজনেরা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল— "ওরে কুকুরটা আবার এসেছে ; নিজে মার খেয়ে গিয়ে বাড়ীর লোক ডেকে এনেছে।"

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী*

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

অন্ধের বইপড়া

অন্ধেরা কিরূপে পড়িতে পারে, একথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যাহাদের চোখ নাই, তাহারা যে আমাদের মতন চোখের সাহায্যে পড়িতে পায় না, একথা সহজেই বুঝা যায়। অন্ধেরা হাতের সাহায্যে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের একটা শক্তি নাই, আর একটা শক্তি তাহাদের খুব প্রখর হয়। আর তাহা হওয়াও স্বাভাবিক ; একটা শক্তি না থাকিলে অপর একটার দ্বারা তাহার কাজ চালাইতে হয়, কাজেই সেটার চালনা খুব বেশী হয়। চালনা দ্বারা শক্তি বাড়ে।



কোন্ জিনিসটা কিরূপ, পরীক্ষা করিতে হইলে, অন্ধেরা তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখে। এইরূপ ক্রমাগত হাত বুলাইয়া তাহাদের স্পর্শ শক্তিটা আমাদের চাইতে অনেক প্রখর হয়। অন্ধকে, মুখে হাত বুলাইয়া মানুষ চিনিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা তাহা পারি না, কারণ আমাদের স্পর্শ

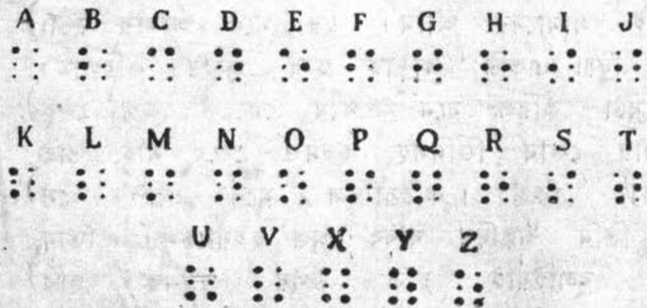
* শাস্ত্রী মহাশয়ের "আত্মচরিত" হইতে উদ্ধৃত।

শক্তির তেমন চালনা হয় নাই। অক্ষর যদি কালীতে লেখা না হইয়া খোদা হয়, তবে অন্ধ তাহাতে হাত বুলাইয়া, সহজেই তাহার চেহারাটা মনে করিয়া লইতে পারে। অক্ষরগুলি খোদা না হইয়া উঁচু হইলে চিনিবার আরও সুবিধা হয়।

অন্ধদের পুস্তকের অক্ষর সব উঁচু উঁচু। অন্ধেরা তাহাতে হাত বুলাইয়া বেশ পড়িয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেমন ছোট ছোট অক্ষর পড়িতে পারি, অন্ধেরা তাহা পারে না—তাহাদের খুব বড় বড় অক্ষরের দরকার হয়। তোমাদের জন্য যেমন "সন্দেশ" বাহির হইয়াছে, অন্ধদের জন্য ইহার ১৬।১৭খানার মতন এক এক-খানা "সন্দেশ" বাহির করিলে, তবে ইহার সকল কথা তাহাতে ধরিত।

অন্ধদের জন্য নানা প্রকার লিখিবার প্রণালী বাহির হইয়াছে। এই নূতন উপায়ে এখন বিস্তর বই ছাপা হইতেছে। তোমরা স্কুলে যত রকম বই পড়, তাহার সবই অন্ধেরা এখন পড়িতে পায়—তোমাদের অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সব। অন্ধেরা ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে, স্বরলিপি দেখিয়া গান শিখে; সব ঐরূপ উঁচু উঁচু করিয়া লেখা। তোমরা চোখে দেখ, তাহারা হাত বুলাইয়া দেখে।

অন্ধদের জন্য যে ছবি প্রস্তুত করা হয়, তাহা তোমাদের ছবির মতন নহে। তাহাদের কোন রং নাই, একটি কাল লাইন পর্য্যন্ত নাই। যারা জন্মান্ধ, তারা ত কখনও রং দেখে নাই, সুতরাং তাহা যে কেমনতর তাহা তাহারা মনেও করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মূন্‌সাহেব যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব। ১৮৩৫ সালে ডাক্তার মূন্ অন্ধ হন, সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। এতকাল ইনি অন্ধদের



ব্রেইল সাহেবের অক্ষর। আজকাল অন্ধদের জন্য এই রকম পদ্ধতিতেই অক্ষর লেখা হয়।

জন্য অনেক খাটিয়াছেন; বিশেষতঃ কিরূপ অক্ষরে পুস্তক ছাপা হইলে তাহাদের পক্ষে বেশী সুবিধা, তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন।

লিখিবার সময় আমরা যেমন লাইনের পর লাইন, বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইনে শেষ করি, অন্ধদের তাহাতে ভারি অসুবিধা হয়। ওরূপ লেখা পড়িতে তাহারা সহজেই পথ হারাইয়া ফেলে। অন্ধদের লাইন,—একটি আমাদের লাইনের মতন বাম দিক হইতে ডাইনে; তার পরেরটি পারসীর মতন ডান হইতে বাঁয়, তার পরেরটি আবার বাম দিক হইতে ডাইনে, এইরূপ করিয়া লেখা হয়। এরূপ হইলে, যেখানে একটি লাইন শেষ হইল, সেই খানেই আর একটি লাইনের গোড়া পাওয়া গেল;—খুঁজিয়া বেড়াইবার আর দরকার হয় না। মূন্‌সাহেবের সেই গল্প আমরা অন্ধদিগের কায়দায় লিখিতেছি। মূন্‌সাহেব বলিতেছেন:—

"অন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমার কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাই কোন্
চেহারা বাড়ীর, দেখাইত কেমন সব জন্তু মানুষ, ছিল কেমন রংটা)
(কিরকম ছিল, সবই আমার বেশ মনে আছে, কিন্তু আমি
।ছিল অন্ধ অবধিই জন্মিয়া সে, জানিতাম মেয়েকে একটি)
(সে মনে করিত যে ঘোড়ার চারি পা, তাহার দুটিতে ভর করিয়া
করিয়া মতন হাতের আমাদের দুটিকে আর, চলে সে)
(তুলিয়া রাখে। ইহা হইতেই অন্ধদিগের জন্য ছবি প্রস্তুত করিবার
মতন লেখার বই আমাদের আমি। হয় মনে আমার কথা)
(করিয়া উঁচু লাইন দিয়া একটি বাড়ীর ছবি প্রস্তুত করিলাম।
;জন্তু একটা সেটা করিল মনে প্রথমে মেয়েটি অন্ধ সেই)
(সে কিনা পৃথিবীর কোন জিনিসই কখনও দেখে নাই, তাই
আর সঙ্গে তাহার কিন্তু । করিয়াছিল মনে ওরূপ সে)
(একজন ছিলেন, তিনি অল্পদিন যাবৎ অন্ধ হইয়াছেন। তিনি
উঠিলেন বলিয়া বুলাইয়াই হাত উপর খানির ছবি)
("ও লিজী, বোকা মেয়ে, এ যেঁ একটা বাড়ী, বেশ বড় বাড়ী।"

সখা, ১৮৮৪।

গরুর বুদ্ধি

পণ্ডিত মশাই ভট্চার্য্যি বামুন, সাদাসিধে শান্ত-শিষ্ট নিরীহ মানুষ। বাড়ীতে তাঁর সরষের তেলের দরকার পড়েছে, তাই তিনি কলুর বাড়ী গেছেন, তেল কিন্‌তে।

কলুর ঘরে মস্ত ঘানি, একটা গরু গম্ভীর হ'য়ে সেই ঘানি ঠেল্‌ছে, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। গরুটা চল্‌ছে চল্‌ছে আর ঘানিটা ঘুরছে, আর সরষে পিষে তা থেকে তেল বেরুচ্ছে। আর গলার ঘণ্টাটা টুংটাং টুংটাং করে বাজছে।

পণ্ডিত মশাই রোজই আসেন রোজই দেখেন, কিন্তু আজ তাঁর হঠাৎ ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। তিনি চোখ মুখ গোল ক'রে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। তাই ত! এটাত ভারি চমৎকার ব্যাপার!

কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে কলুর পো, ও জিনিষটা কিহে?" কলু বল্‌লে, "আজ্ঞে ওটা ঘানিগাছ, ওতে তেল হয়।" পণ্ডিত মশাই ভাবলেন "এটা কি রকম হ'ল? আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম হয়, আর ঘানি গাছের বেলা তেল হয় মানে কি?" কলুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন "ঘানি ফল হয় না?" কলু বল্‌লে "সে আবার কি?"

পণ্ডিত মশাই টিকিতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর প্রশ্নটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। কিন্তু কোথায় যে ভুল হ'য়েছে সেটা তিনি ভেবে উঠ্‌তে পারলেন না। তাই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তারপর বল্‌লেন "তেল কি করে হয়?" কলু বল্‌লে, "ঐখেনে সর্ষে দেয় আর গরুতে ঘানি ঠেলে—আর ঘানির চাপে তেল বেরোয়।" এইবারে পণ্ডিতমশাই খুব খুসী হ'য়ে ঘাড় নেড়ে টিকি ছুলিয়ে বল্‌লেন, "ও বুঝেছি! তৈল নিষ্পেষণ যন্ত্র!"

তারপর কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে পণ্ডিতমশাই বাড়ী ফিরতে যাবেন, এমন সময়ে হটাৎ তাঁর মনে আর একটা খট্‌কা লাগ্‌ল, "গরুর গলায় ঘণ্টা কেন?" তিনি বল্‌লেন, "ও কলুর পো, সবিত বুঝলুম, কিন্তু গরুর গলায় ঘণ্টা দেবার অর্থ কি? ওতে কি তেল ঝাড়াবার স্থবিধা হয়?" কলু বল্‌লে, "সব সময়ে ত আর গরুটার উপরে চোখ রাখতে পারিনে, তাই ঘণ্টাটা বেঁধে রেখেছি। ওটা যতক্ষণ বাজে, ততক্ষণ বুঝতে পারি যে গরুটা চল্‌ছে। থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ বন্ধ হয়, আমিও টের পেয়ে তাড়া লাগাই।"

পণ্ডিতমশাই এমন অদ্ভূত ব্যাপার আর দেখেন নি ; তিনি বাড়ী যাচ্ছেন আর কেবলই ভাবছেন, "কলুটার কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! কি কৌশলটাই খেলিয়েছে! গরুটার আর ফাঁকি দেবার যো নেই। একটু থেমেছে কি ঘণ্টা বন্ধ হ'য়েছে, আর কলুর পো তেড়ে উঠেছে!" এই রকম ভাবতে ভাবতে তিনি প্রায় বাড়ী পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—"আচ্ছা গরুটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে তাহ'লেও ত ঘণ্টা বাজবে, তখন কলুর পো টের পাবে কি ক'রে?"

ভট্‌চায্যি মশায়ের ভারি ভাব্‌না হ'ল। গরুটা যদি সয়তানী ক'রে ফাঁকি দেয়, তাহ'লে কলুর ত লোক্‌সান হয়। এই ভেবে তিনি আবার কলুর কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বল্‌লেন "হ্যাঁ হে, ঐযে ঘণ্টার কথাটা বল্‌লে, ওটার মধ্যে একটা মস্ত গলদ থেকে গেছে। গরুটা যদি ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা বাজায় তা হ'লে কি করবে"? কলু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে "ফাঁকি দিয়ে আবার ঘণ্টা বাজাবে কি রকম"? পণ্ডিত-মশাই বল্‌লেন "মনে কর, যদি একজায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, তাহ'লেও ত ঘণ্টা বাজ্‌বে, কিন্তু ঘানিত চল্‌বে না। তখন কি কর্‌বে"? কলু তখন তেল মাপছিল, সে



গরু কি ন্যায়শাস্ত্র পড়েছে?

তেলের পলাটা নামিয়ে পণ্ডিতমশায়ের দিকে ফিরে গম্ভীর হ'য়ে বল্ল "আমার গরু কি ন্যায়শাস্ত্র প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছে, যে তার অত বুদ্ধি হবে? সে আপনার টোলেও যায়নি শাস্ত্রও পড়েনি, আর গরুর মাথায় অত মৎলব খেলে না"।

পণ্ডিতমশাই ভাব্লেন "তাওত বটে। মূর্খ গরুটা ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, তাই কলুর কাছে সে জব্দ আছে।"

লাইব্রেরী

'লাইব্রেরী' মানে পুস্তকাগার বা কেতাবখানা—অর্থাৎ যেখানে বই রাখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে সহরে গ্রামে নানা জায়গায় ছোট বড় নানারকম লাইব্রেরী দেখা দিয়েছে, সুতরাং লাইব্রেরী জিনিষটা যে কি রকম সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই।

পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরীর নাম কর্তে গেলে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর নামটা নিশ্চয়ই করা উচিত। এই লাইব্রেরীতে সকল দেশের সকল সময়ের এবং সকল রকমের বই সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে। আসিরিয়া বা অসুর দেশের রাজা অসুর-বানি-পালের আড়াই হাজার বছরের পুরাণ লাইব্রেরী খুঁড়ে সেখান থেকে প্রায় বিশহাজার ইটের পুথি এখানে এনে রাখা হ'য়েছে। তাতে তীরের ফলকের মত খোঁচা-খোঁচা সব অক্ষর; সেই অক্ষর বুঝ্বার জন্য কত বড় বড় পণ্ডিতকে কত বছরের পর বছর ভাবতে হ'য়েছে। তাতে আসিরিয়া দেশের জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস আইন আর ধর্ম্মকর্ম্মের কথা আছে, গল্পের বই কবিতার বই আছে, এমন কি লাইব্রেরীর ক্যাটালগ্ বা বইয়ের ফর্দ্দ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তার চাইতেও অনেক পুরাতন পুথি কিছু কিছু আছে, সেগুলি বেবিলোনিয়ার ভাষায় লেখা। তার মধ্যে একখানা পুঁথি প্রায় ৬ হাজার বছর আগেকার। পেপিরস্ গাছের নরম ছালের উপর ছবির অক্ষরে লেখা ইজিপ্টের পুঁথিও সেখানে অনেক আছে।

ভারতবর্ষের নানান্ ভাষার পুঁথি, যে ভাষা এখন কেউ পড়্তে পারে না সেই সব অজানা ভাষার পুঁথি, চীনেদের হিজিবিজি অক্ষরের সেই আদ্যিকালের পুঁথি, আফ্রিকা আমেরিকার অদ্ভুত ভাষার পুঁথি, পাথরে খোদাই করা পুঁথি, তামা লোহা ইঁট কাঠের পুঁথি, কাগজ কাপড় রেশম পশম চামড়া বাকলের পুঁথি, হাতের লেখা হাজার



ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর পড়িবার ঘর

হাজার পুঁথি, আর লক্ষ লক্ষ ছাপান পুঁথি—ঐ এক লাইব্রেরীর মধ্যে এই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায়। লাইব্রেরীতে যে বইয়ের ফর্দ্দ রয়েছে, সেই ফর্দ্দ লিখ্‌বার জন্যই প্রায় দেড়হাজার প্রকাণ্ড বড় বড় খাতার দরকার হয়েছে।

এই লাইব্রেরীতে পড়বার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা পড়বার ঘরে প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন। তাঁদের দরকার মত বই, বলবামাত্র চট্‌পট্ এনে দেবার জন্য তুতিনশ' কেরাণী কর্ম্মচারী সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী প্রায় তুশ' বছরের পুরাণ। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর বয়স প্রায় পাঁচশ বছর। তার আট লক্ষ ছাপান বই আর একচল্লিশ হাজার হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষত প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্র হয়, সেই সময়কার ছাপান বইয়ের এমন চমৎকার সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পারিসের জাতীয় লাইব্রেরী (Bibliotheque Nationale) কেবল যে বয়সে ৭০০।৮০০ বৎসর তা নয়, তার আয়তনও লণ্ডনের লাইব্রেরীর চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। এই লাইব্রেরীতে প্রায় ত্রিশলক্ষ ছাপান বই, হাতের লেখা একলক্ষ পুঁথি, আড়াই লক্ষ মানচিত্র আর দশলক্ষ ছবি সংগ্রহ করা হ'য়েছে। পূব দেশীয় প্রাচীন পুঁথির, অর্থাৎ এসিয়ার নানাঅঞ্চলের পুঁথির, নানারকম দৃষ্টান্ত এখানে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন নাই।

কিন্তু লাইব্রেরীর চূড়ান্ত কাণ্ড যদি দেখ্‌তে হয় তবে অমেরিকায় যাওয়া দরকার। সেখানে ঠিক বৃটিশ মিউজিয়াম বা পারিস্ লাইব্রেরীর মত অত বড় লাইব্রেরী না থাক্‌তে পারে কিন্তু যে গুলি আছে সেগুলিও বড় সামান্য নয়। আর তাদের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে পৃথিবীর আর কোথাও তেমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় না। লাইব্রেরী যত বড়ই হোক, বইয়ের সংখ্যা দশ লাখই হোক কি বিশলাখই হো'ক, যে কোন বই চাইবামাত্র ঠিক তুমিনিটের মধ্যে যদি হাজির না হয় তবেই লাইব্রেরীর তুর্ণামের কারণ হয়। বই পেতে হ'লে কেবল তার নাম কিম্বা নম্বরটি জানাতে হয়; অম্নি লাইব্রেরীতে টেলিফোন্ করে দেয় আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারের গাড়ী চ'ড়ে বই এসে পড়বার ঘরে হাজির হয়। আমেরিকা কুবেরের দেশ, লক্ষপতি ক্রোরপতি মহাজনের দেশ। লাইব্রেরীর জন্য সে দেশে টাকার অভাব হয় না। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে সব বড় বড়

লাইব্রেরী আছে তেমন লাইব্রেরী পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বষ্টন পাব্লিক লাইব্রেরীতে লোকে টাকা জমা দিয়ে বই পড়্‌তে নেয়। এই রকমে প্রতিদিন কত বই আস্‌ছে যাচ্ছে বই-বিলির খাতায় তার হিসাব থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায় যে এক বৎসরে পনের' লক্ষবার সেখানে বই বিলি করা হ'য়েছে!



প্রাচীন কালের গ্রীক লাইব্রেরী

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে জাঁকাল লাইব্রেরী হ'চ্ছে আমেরিকার কংগ্রেস লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর বাড়ীটার জন্যই সওয়া দুকোটি টাকা খরচ হ'য়েছে। লাইব্রেরীতে চলিশ লক্ষ বই রাখার মত জায়গা রয়েছে! লাইব্রেরীর তদ্বিরের জন্য প্রতি বৎসর দশ বিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঘর বাড়ী আলমারী আসবাব পত্র সব এমন ভাবে তৈরী যে আগুনে ভূমিকম্পে ঝড় বিদ্যুতে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এমন কি, বইগুলো যাতে পোকায় না কাট্‌তে পারে তার জন্য মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক

রাখা হয়—তাদের কাজ হ'চ্ছে কেবল পোকা ধ্বংস করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা।

একালের মত প্রাচীন কালেরও অনেক বড় লাইব্রেরীর নাম শোনা যায়। আসুরবাণীপালের লাইব্রেরী আর বেবিলোনিয়ার লাইব্রেরীর কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তার চাইতেও আধুনিক সময়ে, অর্থাৎ প্রায় দু হাজার বছর আগে, গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর নাম খুব শোনা যেত।

এই লাইব্রেরীর উপর রাজাদের খুব অনুগ্রহ ছিল, তাঁরা নানারকমে তার সাহায্য করতেন। বিদেশী জাহাজে যদি কখনও পুঁথি পাওয়া যেত, তাহ'লে সেই পুঁথিগুলো রেখে তার নকল দিয়ে জাহাজকে বিদায় করা হ'ত। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে নানা দেশ থেকে নানা রকমের পুঁথি নিয়ে আসা হ'ত। এথেন্সে দুর্ভিক্ষের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শস্য জোগান হ'য়েছিল, এবং তার দাম হিসাবে এথেন্সের ভাল ভাল সরকারী বই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে ভর্ত্তি করা হ'য়েছিল। গ্রীকদের এই লাইব্রেরীটির সঙ্গে রোমানদের পার্গেমাম্ লাইব্রেরীর ভারি রেষারেষি ছিল। রোমান্‌রা তাদের লাইব্রেরী বাড়াবার জন্য লোকের উপর অত্যাচার করত, জবরদস্তি ক'রে যার তার পুঁথি কেড়ে নিয়ে যেত, এমন কি গ্রীকদের লাইব্রেরী থেকে লোক ভাগিয়ে নেবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করত।

সে সময়ে কাগজের সৃষ্টি হয়নি, খালি পেপিরসের ছালকে পিটিয়ে লম্বা লম্বা "রোল্" বা থান তৈরী হ'ত। সেই গুলোতে লিখে লাটাইয়ের মত গুটিয়ে লাই-ব্রেরীতে বই ব'লে জমা করা হ'ত। রোমানদের জব্দ করবার জন্য গ্রীকেরা এই পেপিরসের চালান বন্ধ করে দেয়। রোমানরা তখন অনেক চেষ্টা করে চামড়া থেকে এক রকম পাতলা কাগজের মত জিনিষ (পার্চ্চমেণ্ট) তৈরী ক'রে, তাই দিয়ে পুঁথি বানাতে শেখে।

———

দেবতার দুর্ব্বুদ্ধি

(নরওয়ে দেশের পুরান)

স্বর্গের দেবতারা যেখানে থাকেন, সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবার একটি-মাত্র পথ; সেই পথ রামধনুকের তৈরী। জলের রঙে আগুন আর বাতাসের রং মিশিয়ে দেবতারা সেই পথ বানিয়েছেন। আশ্চর্য্য সুন্দর সেই পথ, স্বর্গের দরজা থেকে নামতে নামতে পৃথিবী ফুঁড়ে পাতাল ফুঁড়ে কোন্ অন্ধকার ঝরণার নীচে মিলিয়ে গেছে। কোথাও তার শেষ নাই।

পথটি পেয়ে দেবতাদের আনন্দও হ'ল ভয়ও হ'ল। ভয় হ'ল এই ভেবে যে, ঐ পথ বেয়ে দুর্দ্দান্ত দানবগুলো যদি স্বর্গে এসে পড়ে! দেবতারা সব ভাবনায় বসেছেন, এমন সময় চারিদিক ঝলমলিয়ে, আলোর মত পোষাক প'রে, হীমদল এসে হাজির হ'লেন। হীম্‌দল কে? হীমদল হ'লেন আদি-দেবতা অদীনের ছেলে, তাঁর মায়েরা নয়টি বোন্ সাগরের মেয়ে। তাঁদের কাছে পৃথিবীর বল, সমুদ্রের মধু, আর সূর্য্যের তেজ খেয়ে তিনি মানুষ হ'য়েছেন। তাঁকে দেখেই দেবতারা সব ব'লে উঠলেন, "এস হীমদল, এস মহাবীর, আমাদের রামধনুকের প্রহরী হ'য়ে স্বর্গদ্বারের রক্ষক হও।"

সেই অবধি হীমদলের আর অন্য কাজ নাই, তিনি যুগযুগান্তর রাত্রিদিন স্বর্গদ্বারে প্রহর জাগেন। ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, একটিবার পলক ফেল্‌লেই বহুদিনের সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে যায়! রামধনুকের ছায়ার নীচে সারারাত শিশির ঝরে, তার একটি কণাও হীমদলের চোখ এড়ায় না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ কচি ঘাস গজায়, হীমদল কান পেতে তার আওয়াজ শোনেন। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকবে এমন কারও সাধ্যি নাই। হাতে তাঁর এক শিঙের বাঁশি, সেই বাঁশিতে ফুঁ দিলে পর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে হুঙ্কার বাজবে "সাবধান! সাবধান!"—সেই শব্দে ত্রিভুবনের সকল প্রাণী কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠবে। এমনি ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে হীমদল সেখানে পাহারা দিতে লাগলেন।

কিন্তু দেবতাদের মনের ভয় তবুও কিছু কম্‌ল না। তাঁরা বল্‌লেন, "বিপদ বুঝে সাবধান হ'য়েও যদি বাইরের শত্রুকে ঠেকাতে না পারি, তখন আমাদের উপায় হবে কি? যদি বাঁচতে হয় ত অক্ষয়দুর্গ পড়তে হবে। আকাশ-জোড়া স্বর্গটিকে

দুর্গ দিয়ে ঘিরতে হবে।” কিন্তু, তেমন দুর্গ বানাবে কে? নানাজনে নানারকম মন্ত্রনা দিচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুই মীমাংসা হ'চ্ছে না। এমন সময় কোথাকার এক



হীমদল

অজানা কারিকর এসে খবর দিল, হুকুম পেলে আর বখ্‌সিস্ পেলে সে অক্ষয় দুর্গ বানাতে পারে। হিমের অসুর ঋম্‌তুরষ্ যে ছদ্মবেশে কারিকর হ'য়ে এসেছেন, দেবতারা তা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁরা বল্লেন, “কি রকম তুমি বখসিস্ চাও?” কারিকর বল্ল, “চন্দ্র চাই সূর্য্য চাই আর স্বর্গের মেয়ে ফ্রেয়াকে চাই।”

আবদার শুনে দেবতারা সব রেগে উঠলেন। সবাই বল্‌লেন “বেয়াদবকে দূর ক'রে দাও।” কিন্তু দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম লোকী; তিনি সকল রকম দুর্ব্বুদ্ধির দেবতা। লোকী বল্‌লেন, “আচ্ছা, কাজটা আগে করিয়ে নিই না—তারপর দেখা যাবে”। দুষ্ট দেবতার কূট মন্ত্রণা শুনে দেবতারা সব ঋম্‌তুরষ্‌কে বল্‌লেন, “তুমি চন্দ্র পাবে, সূর্য্য পাবে, দেবকন্যা ফ্রেয়াকে পাবে, যদি

একলা তোমার ঘোড়ার সাহায্যে এই শীতকালের মধ্যে এ কাজটাকে শেষ করতে পার।" ছদ্মবেশী অসুর বল্‌ল " অতি উত্তম! এই কথাই ঠিক রইল।"

সেদিন থেকে ঋম্‌তুরষের বিশ্রাম নাই। সারাদিন সে পাথর বয়ে ঘোড়াকে দিয়ে স্বর্গে তোলায়, সারারাত দুর্গ বানায়। দেবতারা ঠিক যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, তেমনি ক'রে পাথরের পর পাথর জুড়ে আকাশ ফুঁড়ে অক্ষয় দুর্গ গ'ড়ে উঠছে। শীত যখন ফুরোয় ফুরোয়, তখন দেবতারা দেখলেন, সর্ব্বনাশ! দুর্গের কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে, একটি মাত্র ফটক বাকী—সেত সুধু একদিনের কাজ। এখন উপায়? এতদিনের চন্দ্র সূর্য্য স্বর্গথেকে খসে পড়বে? সুন্দরী ফ্রেয়া শেষটায় কি না অজানা এক কারিকরকে বিয়ে করবে? ভয়ে ভাবনায় ক্ষেপে গিয়ে সবাই বল্‌লে "হতভাগা লোকীর কথায় আমাদের এই বিপদ হ'ল। ও এখন এর উপায় করুক, তা না হ'লে ওকেই আমরা মেরে ফেলব।"

লোকী আর করবে কি? সন্ধ্যা হ'তেই সে স্বর্গ হ'তে বেরিয়ে দেখ্‌ল, অনেক দূরে মেঘের নীচে কারিকরের ঘোড়া পাহাড়ের সমান পাথর টেনে ধীরে ধীরে উপরে উঠ্‌ছে। লোকী তখন মায়াবলে আকাশ-ঘোটকীর রূপ ধরে চীঁহি চীঁহি করে অদ্ভুত সুরে ডাকতে ডাকতে একটা বনের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরুল। সেই শব্দে ঋমতুরষের ঘোড়া চম্‌কে উঠে, লাগাম ছিঁড়ে, সাজ খসিয়ে, উর্দ্ধমুখে মন্ত্রে-চালান পাগলের মত ছুটে চল্ল। দিক্‌ বিদিকের বিচার নাই, পথ বিপথের খেয়াল নাই, আকাশের কিনারা দিয়ে, আঁধারের ভিতর দিয়ে, বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড়, কেবল ছুট্‌ ছুট্‌ ছুট্‌। লোকীও ছুটেছে ঘোড়াও ছুটেছে, আর 'হায় হায়' চীৎকার ক'রে পিছন পিছন ঋম্‌তুরষ ছুটে চলেছে। এম্‌নি ক'রে শীতকালের শেষ রাত্রি প্রভাত হ'ল, দুষ্ট দেবতা শূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, অসুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ধরল। তখন বসন্তের প্রথম কিরণে পূবের মেঘে রং ধ'রেছে, দক্ষিণ বাতাস জেগে উঠছে।

অসুর বুঝ্‌ল এ সমস্তই দেবতার ফাঁকি। কোথায় বা চন্দ্র সূর্য্য, কোথায় বা দেবকন্যা ফ্রেয়া! এত দিনের পরিশ্রম সব একেবারেই পণ্ড। ভাবতে ভাবতে অসুরের মাথা গরম হ'ল, ভীষণ রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দেবতাদের সে মার্‌তে চল্ল। দূর থেকে তার মূর্ত্তি দেখেই দেবরাজ থর্‌ বুঝ্‌লেন, অসুর আস্‌ছে স্বর্গপুরী ধ্বংস কর্‌তে, তিনি তখন ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর বিরাট হাতুড়ী ছুঁড়ে মার্‌লেন। অসুরের বিশালদেহ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়্‌ল।

কিন্তু দেবতাদের মনে আর শান্তি রইল না। এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁরা লজ্জায় বিমর্ষ হ'য়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। দেবতাদের মুখ মলিন দেখে সাগরের দেবতা ঈগিন বল্‌লেন "আমার প্রবালপুরীতে রাজভোজ হবে, তোমরা এস—ভাবনাচিন্তা দূর কর।" দেবতাদের সবাই এলেন, কেবল লোকীকে কেউ খবর দিল না। সবাই যখন ভোজে বসেছেন, লোকী তখন জান্‌তে পেরে ভোজের সভায় হাজির হ'য়ে সকলকে গাল দিতে দিতে বিনাদোষে ঈগিনের প্রিয় দাস ফন্‌ফেন্‌কে মেরে ফেল্‌ল। দেবতারা অনেক দিন অনেক সয়েছেন, আজকে তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। লোকীর সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কথা তাঁদের মনে পড়্‌ল। তাঁরা বল্লেন "এই লোকীর জন্য স্বর্গের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। এই হিংসুকে লোকী থরের স্ত্রীর সোণার চুল চুরি ক'রেছিল; এই কাপুরুষ লোকীই বাজি রেখে নিজের মুণ্ড পণ ক'রে বাজি হেরে পালিয়েছিল; এই বিশ্বাসঘাতক লোকীই স্বর্গের অমৃত ফল অসুরের হাতে দিয়েছিল; এই হতভাগা লোকীই ফ্রেয়াকে রাক্ষসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল; এই চোর লোকীই ফ্রেয়ার গলার সোণার মালা সরাতে গিয়ে হীমদলের হাতে সাজা পেয়েছিল; এই পাষণ্ড লোকীই নিষ্পাপ বলোদরের মৃত্যুর কারণ! এই লোকী পৃথিবীতে গিয়ে অত্যাচার করে, পাতালে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মন্ত্রণা করে! মারো এই অপদার্থকে।"

লোকী প্রাণভয়ে পালাতে গেল কিন্তু স্বয়ং দেবরাজ থর আর আদিদেবতা অদীন যখন তাঁর পিছনে ছুটলেন, তখন সে আর পালাবে কোথায়? বিষের ঝরণার নীচে হাত পা বেঁধে লোকীকে ফেলে রাখা হ'ল। লোকীর স্ত্রী সিগীন যতক্ষণ ঝরণাতলায় পাত্রে ক'রে বিষ ধরেন আর ফেলে দেন, ততক্ষণ লোকী একটু আরাম পায়; আর সিগীন যদি মুহূর্ত্তের জন্য খেতে যান কি ঘুমিয়ে পড়েন, তবে বিষের যন্ত্রণায় লোকীর আর সোয়াস্তি থাকে না।

দেবতারা ভাবলেন, স্বর্গের পাপ দূর হ'ল, স্বর্গে এবার শান্তি এল। কিন্তু হায়! তার অনেক আগেই পাপের মাত্রা পূর্ণ হ'য়েছে। লোকীর জন্য স্বর্গের পাপ মর্ত্ত্যে নেমেছে, পাতালে ঢুকে অসুর পিশাচ দৈত্য দানব সবগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে বনের লোহার গাছে লোহার পাতা, সেই বনের ছায়ায় ব'সে লোকীর রাক্ষসী স্ত্রী অঙ্গুর্ব্বদা নেকৃড়ে-মুখো পিশাচ-রাহুদের যত্ন ক'রে পাপীর হাড় আর পাপীর মজ্জা খাইয়ে খাইয়ে বাড়িয়ে তুল্‌ছে। তারা চন্দ্র সূর্য্যের পিছন পিছন যুগের পর যুগ

ছুটে বেড়ায়। এতদিনে খেয়ে খেয়ে তাদের মূর্ত্তি এমন ভীষণ হ'ল যে চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হ'য়ে কাঁপতে লাগ্‌ল, পৃথিবী চৌচির হ'য়ে ফেটে উঠ্‌ল, আকাশের নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। পাতালের রক্তকুকুর আর রাহুর বাপ ফেন্‌রিস্ বিকট শব্দে ছুটে বেরুল। লোকী তার বাঁধন ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। সৃষ্টির মেরুদণ্ড য়গ্‌দ্রাসিল বা জগৎ-তরুর শিকড় কেটে মহানাগ নিধুগ বিকট মূর্ত্তিতে বেরিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে



ভীষণ শব্দে হীম্‌দলের শিঙার আওয়াজ বেজে উঠ্‌ল—সাবধান! সাবধান! সাবধান!

দেবতারা সব ঘুমের থেকে লাফিয়ে উঠে রাম-ধনুকের রঙীন্ পথে নেমে আস্‌লেন। যে বিরাট সাপ সমুদ্রের গভীর গুহায় দেবতার ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সে আজ সমুদ্রের জল তোলপাড় ক'রে বেরিয়ে এল। হিমের দেশের অসুররা সব ঝাপ্‌সা ধোঁয়ার বর্ম্ম প'রে কুয়াশায় চড়ে এগিয়ে এল। অগ্নিপুরীর দৈত্যদানব মশাল জ্বেলে চারিদিক রাঙিয়ে এল। তারপর আকাশ চীরে দৈত্যরাজ স্থুর্ত্র এলেন; আগুনের শিখার মত, প্রলয়ের উল্কার মত, এসেই তিনি স্বর্গদ্বারের সেতুর উপর দলেবলে

ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন, আর রামধনুকের রঙীন সেতু কাচের মতন গুঁড়িয়ে গেল।

তারপরই প্রলয় যুদ্ধ। আদিদেবতা অদীনের একটি মাত্র চোখ, তিনি নেকড়ে-অসুর ফেন্‌রিসের সঙ্গে লড়্‌তে গিয়েই বিপদে পড়লেন। রাহুর বাপ ফেন্‌রিস, তার মা হল রাক্ষসী অঙ্গুর্ব্বদা আর তার বাপ স্বয়ং লোকী। অসুরের প্রকাণ্ড দেহ যুদ্ধের উৎসাহে বাড়তে বাড়তে পাহাড় পর্ব্বত ছাড়িয়ে উঠ্‌ল; তার রক্তমাখা হাঁ-করা মুখে অদীন একবার ঢুকে গেলেন, আর তাঁকে পাওয়াই গেল না। ফ্রেয়ার ভাই মহাবীর ফ্রে গোলমালে তাঁর অজেয় খড়্গ খুঁজেই পেলেন না; তিনি সুত্রে'র হাতে প্রাণ হারালেন। দেবরাজ থর তাঁর ভীষণ হাতুড়ির ঘায়ে সমুদ্রের বিরাট সাপকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আপনি তার বিষাক্ত রক্তে ডুবে মরলেন। যমপুরীর রক্তকুকুর যুদ্ধের দেবতা তাইর্‌কে মেরে উল্লাসে তাঁর রক্ত পান কর্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে অদীনের পুত্র বিদার এসে পিতৃঘাতী ফেন্‌রিসকে দুই টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। বড় বড় দেবতা অসুর একে একে সবাই যখন প্রায় শেষ হয়েছে, তখন সুত্রে'র হাত থেকে আগুনের খড়্গ ছুটে গিয়ে স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে প্রলয়ের আগুন জ্বেলে দিল। গাছ-পালা পুড়ে গেল নদীর জল শুকিয়ে গেল, স্বর্গের সোণার পুরী ভস্ম হ'য়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব যখন ফুরিয়ে গেল তখন বিদার দেখলেন, বড় বড় দেবতা অসুর কেউ আর বাকী নেই। কেবল থরের দুই ছেলে যুদ্ধের শ্মশানে থরের হাতুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে!

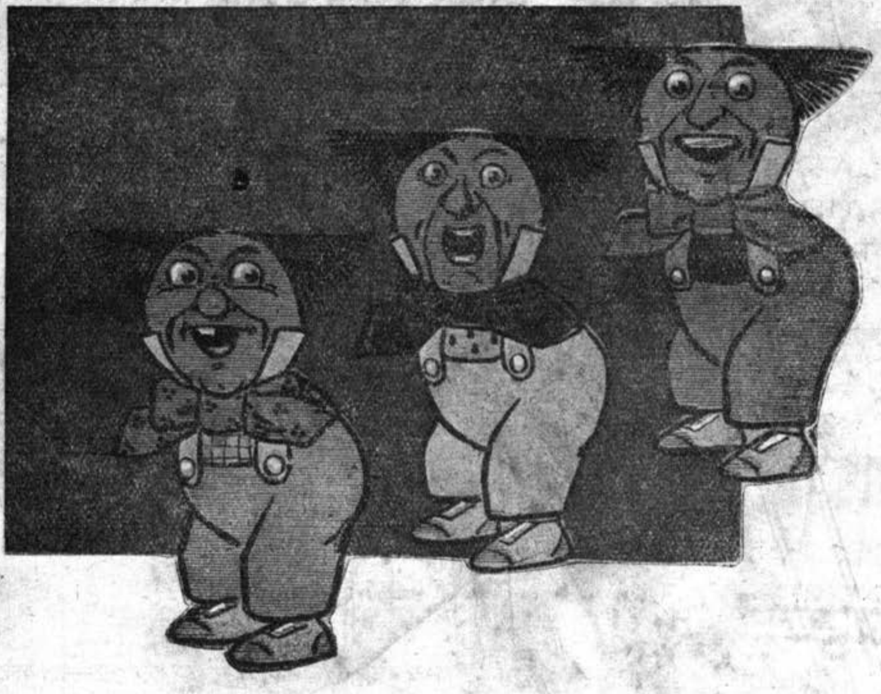
আর লোকী? বিশ্বাসঘাতক লোকী অসুরের দলের মধ্যে ম'রে রয়েছে—হীমদলের খড়্গ তার বুকে বসান। হীমদলও মহাযুদ্ধে অবসন্ন হ'য়ে বীরের মত রক্তাক্ত বেশে মরে আছেন।

আহ্লাদী

হাসছি মোরা হাসছি দেখ হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিন জনেতে জট্‌লা ক'রে ফোক্‌লা হাসির পাল্লা দি।

হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে দাদা আস্‌ছি আমি আস্‌ছে ভাই
হাস্‌ছি কেন কেউ জানেনা, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।

ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে—
ভাবতে গিয়ে ফিক্‌ফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক্ ক'রে।



পাচ্ছে হাসি চাইতে গেলে পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নোখ গুঁজে।

হাস্‌ছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকো ফানুষ পিঁপ্‌ড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড়।

পড়্‌তে গিয়ে ফেল্‌ছি হেসে 'ক খ গ' আর স্লেট্ দেখে
উঠ্‌ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।



ষষ্ঠ বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৫ | দ্বাদশ সংখ্যা

তেওয়ারি

ঘরের জিনিষ কে খেয়েছে, জানা নেইকো কারো—
এধার ওধার খুঁজে মামা গরম হ'লো আরো।
সাফ সেগুলো কোথায় গেল সন্দে হ'ল ঘোর,
আর কে নেবে, বল্লে মামা, তেওয়ারি বেটাই চোর।
গাছে এবার ফল্‌ল পেঁপে পাঁচটা ছটা ক'রে,
রেখেই মামা গেলেন চলে পাকবে তুদিন পরে।
ওমা, একি! এসেই দেখেন গাছগুলো সব নেড়া
হুঙ্কারে তাঁর ভড়কে গিয়ে তেওয়ারি হ'ল ভেড়া।
"খাইনি আমি বল্‌ছি বাবু পৈতে ছুঁয়ে মোর,"
ও শুধু তার মিথ্যে কথা তেওয়ারি ব্যাটাই চোর।
আনারসটি ফল্‌ছে ভাল ঘরের কোণের গাছে
জিম্মা তাহার বুঝিয়ে দিলেন তেওয়ারি ব্যাটার কাছে।
তুদিন বাদেই ফলটি কোথায় বোঁটা শুদ্ধ সাফ,
চীৎকারেতে উঠ্‌ল ঘরে তেওয়ারি ব্যাটার কাঁপ।
"কে নিলেরে বিট্‌লে বামন কাণ্ড কিএ তোর?"
বল্লে সবাই, কে নেবে আর, তেওয়ারি ব্যাটাই চোর।

বেগুন গাছে বেগুন হ'ল মরিচ গাছে লঙ্কা
অমনি দেখ চোরের রাজ্যে পড়্‌ল যেন ডঙ্কা।
ফরসা হ'ল বাগান খানি রাত না হ'তে ভোর,
গাছগুলো সব নেড়িয়ে নিলে সর্ব্বনেশে চোর।
ব্যাপার দেখে আগুন মামা অম্‌নি চলেন ছুটি
হন্‌হনিয়ে ধরেন তেড়ে তেওয়ারি ব্যাটার টুঁটি।
অসম্ভব আর সহ্য করা কাণ ম'লে তার শেষে
দিলেন ঠুকে মুণ্ডুটাকে ঘরের কোণে ঠেসে।
তাতেও মামার রাগ মেটেনা ক্রমেই ওঠেন ফুলে
মারেন ঘুঁষি মারেন চাঁটি ঝাঁকিয়ে ধরেন চুলে।
বলেন তিনি, "হারামজাদা বল্‌ত হলপ ক'রে,
কি কর্‌ছিলি রাতদুপুরে একলা তোর ঐ ঘরে ?
শুনিনি তোর খচর মচর ? আমায় দিবি ফাঁকি?
সত্যি কথা বলিস্‌ত আজ প্রাণটুকু তোর রাখি"।
তেওয়ারি কয় কাতর হ'য়ে চোখের জলে ভেসে,
"পত্র পেলাম কালকে আমার মা মরেছেন দেশে—
তাইতে হুজুর খাইনি রোটি ভুখা ছিলেম প'ড়ে
চোখে আমার ঘুম আসেনি বহুৎ রাত্রি ধ'রে।"
বল্‌তে গিয়ে উঠ্‌ল কেঁদে হঠাৎ মনের দুখে,
মামাও তখন মুখ লুকোলেন আপন ঘরে ঢুকে॥

"মিহিজাম"

মহাশীলবজ্‌ জাতক

পূর্ব্বে এক সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম ছিল "শীলবান্‌ (চরিত্রবান) কুমার।" ষোল বৎসর বয়সেই তিনি সকল রকমের বিদ্যা শিখিয়া, পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইল "মহাশীলবান্‌ রাজা।" তিনি নগরের চারিটি দরজায় চারিটি, নগরের মাঝখানে

একটি, এবং প্রাসাদের সমুখে একটি দানশালা প্রস্তুত করাইয়া, গরীব দুঃখী ও আতুরদিগকে খাইতে দিতেন।

মহাশীলবান্ রাজার এক মন্ত্রী ভারি দুশ্চরিত্র ছিলেন। এই কথা জানাজানি হইলে ক্রমে রাজার কাণে গেল। রাজা সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, কথাটা সত্য। তখন তিনি সেই মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"আমার রাজ্যে তোমার মত দুশ্চরিত্রের জায়গা নাই। তুমি স্ত্রীপুত্র ও ধনসম্পত্তি লইয়া অন্য রাজ্যে চলিয়া যাও।"

কাশী হইতে তাড়িত হইয়া ঐ মন্ত্রী কোশলরাজ্যে চলিয়া গেলেন এবং ক্রমে তাঁহার প্রতি কোশল রাজের অগাধ বিশ্বাস জন্মিল। একদিন তিনি কথায় কথায় কোশলরাজকে বলিলেন—"মহারাজ! কাশীর রাজার স্বভাবটি বড় ঠাণ্ডা; অল্প সৈন্য লইয়া গিয়াই অনায়াসে তাঁহার রাজ্য দখল করিতে পারা যায়।" একথা শুনিয়া কোশলরাজের মনে সন্দেহ হইল, "কাশী এত বড় রাজ্য, অথচ এ লোকটা বলিতেছে অল্প সৈন্য লইয়াই ইহা জয় করা যায়! তবে কি এ কোন গুপ্তচর?" এই ভাবিয়া তিনি ঐ মন্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ, আমার মনে হয় তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।" মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। যদি বিশ্বাস না করেন তবে, জন কতক লোক পাঠাইয়া বলিয়া দিন্, তাহারা গিয়া কাশী রাজ্যের সীমানায় লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতে থাকুক। তখন দেখিবেন, আপনার লোকদের ধরিয়া কাশীরাজের নিকট লইয়া গেলে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি ত দিবেনই না, বরং ধন দিয়া বিদায় করিবেন।"

কোশলরাজ ঐ মন্ত্রীর কথামতই কাজ করিলেন। তাঁহার আদেশে কতগুলি লোক গিয়া কাশীর সীমানার লোকদিগকে আক্রমণ করিল। কাশীরাজের লোকেরা ইহাদিগকে ধরিয়া যখন তাহাদের রাজার নিকট লইয়া গেল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপ্ সকল! তোমরা আমার লোকদিগকে মারিলে কেন?" তাহারা বলিল—"মহারাজ! আমরা বড় গরীব, পেটের দায়ে ঐরূপ করিয়াছি।" কাশীরাজ বলিলেন—"যদি তাহাই হয়, তবে আমার নিকট আসিয়া টাকা চাহিলে না কেন? যাও, আমার ভাণ্ডার হইতে ধন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আর কখন এরূপ কাজ করিও না।" ধন লইয়া কোশলরাজের লোকেরা ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিল। কিন্তু ইহাতেও কোশলরাজ কাশী আক্রমণ করিতে ভরসা পাইলেন না।

তিনি আবার কতগুলি লোক পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—"তোমরা এবারে কাশীরাজ্যের মধ্যে কোন গ্রামে গিয়া অত্যাচার কর।"

কোশলের লোকদিগকে এবারেও কাশীর লোকেরা ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। কিন্তু এবারেও তাহারা শাস্তির বদলে পুরস্কার পাইয়াই ফিরিয়া আসিল। তখন কোশলরাজ আরেক দল পাঠাইয়া কাশীর রাজপথ লুঠ করিতে বলিয়া দিলেন। ইহারাও শাস্তি না পাইয়া ধন লইয়াই ফিরিয়া আসিল। তখন কোশলরাজের বাস্তবিকই বিশ্বাস হইল যে, কাশীরাজ নিতান্ত ভালমানুষ আর বড় দুর্ব্বল লোক। তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া কাশী জয় করিতে চলিলেন।

কাশীরাজের ভারি তেজস্বী এক হাজার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ সাহস; পাগলা হাতীকেও গ্রাহ্য করিতেন না, মাথায় বাজ পড়িলেও ভয় পাইতেন না। শীলবান্ রাজার হুকুম পাইলে তাঁহারা সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিতেন। কোশলরাজ কাশী আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহারা কাশীরাজকে বলিলেন, "মহারাজ অনুমতি করুন, কোশলরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া আসি।" ইহা শুনিয়া সাধু কাশীরাজ বলিলেন—আমার জন্য মারামারি করিয়া যেন অন্যের অনিষ্ট না হয়। যাহাদের রাজ্যের প্রতি এতটা লোভ, তাহারা ইচ্ছা করে ত আমার রাজ্য জয় করুক।"

কোশলরাজ কাশীরাজ্যে ঢুকিয়া ক্রমে রাজধানীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূত দিয়া কাশীরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন—হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, না হয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও। কাশীরাজ উত্তর পাঠাইলেন—যুদ্ধ করিব না, আপনার ইচ্ছা হয়, আমার রাজ্য লইতে পারেন। সেনাপতিরা তখনও তাঁহাকে বলিলেন—"মহারাজ! হুকুম করুন, কোশলরাজাকে বন্দী করিয়া আনি।" মহাশীলবান্ রাজা কিছুতেই মত দিলেন না, অধিকন্তু নগরের দরজা খুলিয়া দিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিলেন।

কোশলরাজ সৈন্যগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাকে কেহ বাধা দিল না। তিনি সাধু কাশীরাজকে মন্ত্রিগণের সহিত বন্দী করিয়া, আদেশ দিলেন—"ইহাদিগকে আমক শ্মশানে (যেখানে শব পোড়ায় না, কেবল শিয়াল কুকুরে খায়, সেইখানে) গর্ত্ত খুঁড়িয়া গলা পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখ। আর দেখিও যেন ইহারা হাত পা নাড়িতে না পারে।" চোররাজার (কোশলরাজার) লোকেরা কাশীরাজ ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে বাঁধিয়া শ্মশানে লইয়া গেল।

এত অত্যাচারেও কাশীরাজ চোররাজের উপর রাগ করিলেন না। তাঁহার মন্ত্রীরাও এমন বাধ্য ছিলেন যে, কেহই প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। চোররাজের চাকরেরা তাঁহাদিগকে শ্মশানে লইয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটিতে পুঁতিল; কাহারও নড়িবার চড়িবার সাধ্য রহিল না। চোররাজের চাকরেরা চলিয়া গেলে শীলবান্ রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন—"বন্ধুগণ! শত্রুর দোষ ক্ষমা কর; মনে কোনরূপ মন্দভাব রাখিও না।"

রাত্রি হইলে পর শিয়ালের দল মাংস খাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা ও মন্ত্রিগণ একসঙ্গে এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, শৃগালেরা ভয়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিছুদূর গিয়া যখন দেখিল, কেহই তাহাদের পিছনে তাড়া করিতেছে না, তখন ভরসা পাইয়া আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দলের প্রধান শিয়ালটা রাজাকে এবং অন্যেরা মন্ত্রীদিগকে খাইতে গেল।

এই সময়ে কাশীরাজের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলিল। তিনি শিয়ালটাকে



দেখিয়া গলাটি বাড়াইয়া দিলেন। শিয়ালটা যেমন তাঁহার গলায় কামড়াইতে আসিল, অমনি তিনি তাহারই গলা কামড়াইয়া ধরিলেন। রাজার চোয়ালে এবং গায়ে হাতীর মত বল ছিল। শিয়াল তাঁহার কামড় ছাড়াইতে না পারিয়া প্রাণের

ভয়ে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া অন্য শিয়ালেরা ভয়ে সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিল না।

এদিকে রাজা যে শিয়ালটাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, সেটা লাফালাফি করিতে করিতে গর্ত্তের চারিদিকের মাটি ঢিলা করিয়া দিল। রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ শিয়ালটাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং শরীরটাকে খানিকক্ষণ এপাশে ওপাশে নাড়াইয়া হাত দুখানি উপরে তুলিলেন। তারপর গর্ত্তের দুপাশে হাতে ভর করিয়া উপরে উঠিয়াই মন্ত্রীদিগকেও উদ্ধার করিলেন।

ঐ শ্মশানে যে সকল যক্ষ বা মায়াবী রাক্ষস থাকিত তাহাদের জন্য শ্মশানের এক একটি অংশ ভাগ করা ছিল। যে দিনের কথা হইতেছে, সেদিন কয়েকজন লোক একটা শব দুই যক্ষের সীমার উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। যক্ষদুটা এই শব ভাগ করিতে না পারিয়া বলিল—"চল, শীলবান্ রাজার নিকট যাই। উনি সাধু লোক, আমাদের শবটা দুইজনকে ভাগ করিয়া দিবেন।"

শবটাকে টানিয়া লইয়া যক্ষেরা রাজার নিকট গিয়া, শব ভাগ করিয়া দিতে বলিল। রাজা বলিলেন, "শব ভাগ করিয়া দিব বটে, কিন্তু শ্মশানে আসিয়া আমি অশুদ্ধ হইয়াছি; আমাকে আগে স্নান করাও।" যক্ষেরা মায়াবলে রাজবাড়ীতে গিয়া, চোররাজার জন্য যে সুগন্ধি জল ছিল, সেই জল আনিয়া রাজাকে স্নান করাইল। স্নানের পর চোররাজার পোষাক আনিয়া তাঁহাকে পরাইল। তারপর রাজা খাইতে চাহিলে, চোররাজার খাদ্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। খাওয়ার পর রাজা বলিলেন—"চোর রাজার বালিশের নীচে আমার মঙ্গল খড়্গ আছে, সেটা আনিয়া দাও।"

যক্ষেরা মঙ্গল খড়্গ আনিয়া দিলে রাজা সেই খড়্গ দিয়া শবটাকে সমান দুই ভাগ করিয়া কাটিয়া উহাদিগকে খাইতে দিলেন। তারপর যক্ষদিগকে বলিলেন— "তোমারা মায়াবলে আমাকে চোর রাজার ঘরে এবং আমার মন্ত্রীদিগকে নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়া আইস।" যক্ষেরা তাহাই করিল।

চোররাজ সুন্দর ঘরে চমৎকার বিছানায় শুইয়াছিলেন। কাশীরাজ খড়্গের বাঁট দিয়া তাঁহার পেটে ঘা দিবামাত্র তিনি জাগিয়া দেখিলেন—কাশীরাজ তাঁহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তখনই উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি, মহারাজ! এখন গভীর রাত্রি, চারিদিকে প্রহরী রহিয়াছে, ঘরের দরজায় খিল দেওয়া,

এখানে কাহারও ঢুকিবার সাধ্য নাই—আপনি এরূপ পোষাক পরিয়া, খড়্গ লইয়া কিরূপে এখানে আসিলেন?"

কাশীরাজ তখন সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া চোররাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মনে ভারি অনুতাপও হইল এবং বলিলেন—"হায়, হায়! রক্তমাংসখোর ভীষণ রাক্ষসেরা পর্য্যন্ত আপনার সম্মান বুঝিল, আর আমি মানুষ হইয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এখন হইতে আমি আর আপনার মত সাধু লোকের অনিষ্ট করিব না।" এই বলিয়া তিনি খড়্গ ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং ক্ষমা চাহিয়া কাশীরাজকে রাজশয্যায় শোয়াইয়া নিজে মাটিতে সামান্য একটা বিছানায় শুইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কোশলরাজ সকলের সমক্ষে মহাশীলবান্ রাজার গুণ গাহিয়া আবার তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তারপর মহাশীলবান্ রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন—"মহারাজ! এখন হইতে আমি আপনার আজ্ঞাবহ বন্ধু হইয়া রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি প্রজাপালন করুন।" এই বলিয়া সেই দুষ্ট মন্ত্রীকে সাজা দিয়া কোশলরাজ নিজের রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পঞ্চুলাল

(৪)

নতুন স্লেট বই নিয়ে পঞ্চু ত পাঠশালায় যাত্রা করল। পথে যেতে যেতে আপন মনে বলতে লাগ্‌ল, "ইস্কুলে আজকে আমি পড়তে শিখব, কাল লেখা শিখে নেব, আর পরশু অঙ্ক শিখে ফেলব। যখন সব শেখা হয়ে যাবে, বিদ্যার জোরে আমি অনেক টাকা রোজগার করব। মাইনের টাকা প্রথম যেই পাব, অম্নি তখুনি আমার বাবার জন্যে আমি একখানি ঝক্‌ঝকে সুন্দর শাল কিনে দেব। এই শীতের দিনে বুড়ো মানুষ র‍্যাপারখানি বেচে ফেলে শীতে কাঁপছে—বাবা আমায় বড্ড ভালবাসে!" আপন মনে ভাবছে, আর বকতে বকতে চলেছে, এমন সময় পঞ্চুর মনে হ'ল, দূরে কোথায় বাজনা বাজছে। চল্‌তে চল্‌তে থেমে, সে বাজনা শুন্‌তে লাগ্‌ল। দূরে রাস্তার মোড়ে, নদীর ধারে গ্রামের মধ্য হতে বাজনার আওয়াজ আস্‌ছিল।

পঞ্চু ভাব্‌লে বাজনাটা কিসের ? জানবারও উপায় নেই, তখন সে স্কুলে চলেছে। মনে মনে একটু দুঃখুও হল যে, স্কুলে না যেতে হলে বাজনা যেখানে বাজছে সেখানে যেতে পারত ! পঞ্চু দো-মনা হ'ল—স্কুলেই যাবে, না বাজনা শুনতে যাবে ? কিন্তু পথের মাঝে বেশীক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হয়, মন সে ঠিক্ করে ফেল্‌লে ! হতভাগা ছেলেটা বল্লে কি, আজ বাজনা শুনতেই যাই—স্কুলে কাল গেলেও চল্‌বে। মন স্থির করে সে দৌড় দিলে। যতই এগোয় বাজনা ততই ভাল করে শোনা যায়, বাঁশী বাজছে সানাই সুর ধরেছে, ঢাকের পিঠে কাঠি পড়ছে। বাঁশীর পাঁ পাঁ, সাণাইএর পোঁ, আর ঢাকের গুরু গুরু ! এ শুনে কি আর মন স্থির মানে ? দৌড়তে দৌড়তে এক মাঠে গিয়ে পোঁছল, সেখানে তাঁবুর সমুখে ভারী ভিড়—একখানা কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"পুতুল নাচ—রাম রাবণের যুদ্ধ।" পাশের লোককে পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে ওগো ভিতরে যেতে কত লাগে ? "দু আনা"। "কি ! দু—আনা !" পঞ্চু তখন এম্নি মেতে উঠেছে যে, সে না-জানা-শোনা একটি ছেলের গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্লে "আমায় দু আনা ধার দেবে ? কাল ফেরত দেব।" ছেলেটি বল্লে, খুসী হয়েই দিতাম কিন্তু আজ আমার হাত খালি। পঞ্চু বল্লে, দু আনায় আমার জামাটা বেচ্‌তে পারি। ছেলেটি হেসে বল্লে, কাগজের জামা নিয়ে কি হবে ভাই, বৃষ্টি যদি হয় তা হলে জামা ভিজে, চামড়ার সঙ্গে লেপটে থাক্‌বে, আর কখনো খুলতে পারব না !

"তবে আমার জুতো জোড়া কিনবে কি ?"

"চুলো ধরান ছাড়া ও জুতোয় আর কোন কাজ হবে বলে ত মনে হয় না।"

"টুপির জন্যে কত দিতে পার বল ত ?"

"মাগো ! টুপির কি ছিরি—মরে যাই আর কি ? এক টুকরো ছেঁড়া ত্যানা, সুবিধা পেলেই চিলে ছোঁ দিয়ে নিতে আর দেরী লাগ্‌বে না।"

পঞ্চুলালের মনে হ'ল যেন কাঁটাবনে পড়েছে যে দিকে ফেরে সেই দিকেই খোঁচা ! তবু ভাবলে আবার একবার চেষ্টা করে দেখবে। তাই, মুখ কাঁচুমাচু করে, আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে, দু বার ঢোক গিলে, একবার মুখ ফিরে, চোখ নীচু করে, বার দুয়েক কেশে, শেষ কালে অনেক কষ্টে বল্লে, "আমার নতুন বর্ণ পরিচয়ের জন্যে দু আনা পয়সা দেবে কি ?" তাই শুনে কোত্থেকে একজন ছেঁড়া কাগজের বিক্রি-ওয়ালা হেঁকে বল্লে, আমি তোমার নতুন পেরথম ভাগ দু আনায় কিনব" ; এতক্ষণ

সে দুই ছেলের কথাবার্ত্তা সব মন দিয়ে শুনেছিল। দেনা লেনা তখনই চুকে গেল। বেচারী গুপে শীতে হিহি করতে করতে ছেলেকে যে বই কিনে দিয়েছিল, পড়া শোনা করে ছেলে বিদ্বান হয়ে বাপের দুঃখ ঘোচাবে,—ওমা! দু দণ্ড না যেতেই তার এই পরিণাম! কিন্তু পঞ্চু এরি মধ্যে সব ভুলে বসে আছে। পুতুল নাচের ঘরে যখন ঢুকলে তখন দেখলে দুই পুতুলের লড়াই হচ্ছে—লোকেরা সবাই হেসে এ ওর গায়ে পড়ছে! পুতুলের মধ্যে এক জনের নাম হরিনাথ অন্য জনের নাম পঞ্চানন। হঠাৎ হরিনাথ থমকে দাঁড়াল, দূরে একটা কোণার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে হেঁড়ে গলায় বল্লে, "একি স্বপ্ন দেখ্ছি, না জেগে আছি? ঐ যে দেখছি পঞ্চু বসে!"

পঞ্চানন পুতুল টিক্‌টিকির মত করলে, "ঠিক, ঠিক পঞ্চুই বটে।"

পর্দ্দার পিছন হতে উঁকি দিয়ে মিঞা সাহেব পুতুলের অধিকারী বলে উঠ্‌ল, "বটে বটে, গুপীর নতুন পুতুল পঞ্চুলালই বটে।"

সবগুলো কাঠের পুতুল চিঁ চিঁ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "পঞ্চু, পঞ্চু, পঞ্চু-ভায়া—বেঁচে থাক্ ভাই পঞ্চুলাল।" সবগুলি পুতুলই গুপীর তৈরি, তাই তারা পঞ্চুকে দেখেই আপন-বাপের-হাতের ভাই বলে চিন্‌তে পেরেছিল।

হরিনাথ হেঁড়ে গলায় হুকুম করল, পঞ্চু এসো তোমার কেঠো ভাইদের সঙ্গে কোলাকুলি কর।

পঞ্চু তার পিছনের জায়গা হতে এক লাফে ঘরের মাঝখানে, তারপর আর এক লাফে বেহালা বাঁশী যারা বাজাচ্ছিল, তাদের মাথা কোন রূপে বাঁচিয়ে, তক্তাপোষের উপর যেখানে পুতুলেরা সারি সারি নাচ্‌ছিল সেই খানটিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে যে রকম কোলাকুলি, গলাগলি, জড়াজড়ি আরম্ভ হল তা আর বলে বোঝান যায় না। এদিকে নাচ বন্ধ হওয়াতে, যারা দেখ্‌তে এসে ছিল তারা চটে মটে বেজায় চেঁচামেচি সুরু করে দিলে! সোর গোল শুনে পুতুল নাচের কর্ত্তা এসে উপস্থিত। মাগো কি তার মূর্ত্তি! কালো পশমের মত লম্বা দাড়ী পা অবধি ঝুলছে, চল্‌তে ফির্‌তে থেকে থেকে পা দিয়ে মাড়িয়ে; ফেল্‌ছে হাঁ-মুখখানি অজগরের মত, চোখ দুটো যেন রেল গাড়ীর পিছনের গোল লণ্ঠন আর তেম্নি রাঙা, হাতে সাপ আর শেয়ালের লেজ দিয়ে বিনুনি গাঁথা একখানা চাবুক, অনবরত সেখানি পট পট করে আওয়াজ করছে।

এই ব্যক্তির অকস্মাৎ আবির্ভাবে চারিদিক একেবারে চুপ হয়ে গেল, নিশ্বাস ফেল্‌বার সাহসও আর কারো রইল না!

কর্ত্তা মহাশয় বজ্র গর্জ্জনে পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলে, কে বটে তুমি? এখানে এসে এম্নি হাঙ্গামা করিয়ে তামাসা মাটি করে দিলে!

"মশায় আমার কোন দোষ নেই।"

"ঢের হয়েছে চুপ্ কর, রাতের বেলা তোমার সঙ্গে বোঝা পড়া হবে এখন!"

পুতুল নাচ শেষ হলে কর্ত্তা সের সাহেব, ডাক নাম কাবাবী মিঞা, বাবুর্চ্চিখানায় ঢুকল। সেখানে প্রকাণ্ড একটা খাসি, মস্ত একটা হাঁড়ির মধ্যে কাবাব হচ্ছিল। হরিনাথ আর পঞ্চাননকে হেঁকে বল্লে, "যাও পঞ্চুলালকে নিয়ে এসো, একটা পেরেকে তাকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি, দেখতে পাবে। তার শুকনো কাঠের দেহখানা, উননে আঁচ দিতে খুব কাজে লাগ্‌বে।" হরিনাথ আর পঞ্চানন, পঞ্চুকে যখন আড়-কোলা করে এনে হাজির করলে, আর সে আপ্‌সে কেঁদে বলতে লাগ্‌ল, "ওগো আমায় মেরো না, আমি মরতে চাইনে গো মরতে চাইনে," তখন অধিকারীর মনটা গলে গেল। তার দয়া চোখের জলে দেখা না দিয়ে নাকের জলে বইল, সে অনবরত হেঁচ্চো হেঁচ্চো করে হাঁচতে সুরু করে দিলে!

পঞ্চানন চুপি চুপি বল্লে, "পঞ্চুরে তোর কপাল ভাল, অধিকারী যখন হাঁচতে লেগেছে তখন বিপদ কেটে গেল, তোর আর ভয় নেই!"

হেঁচ্চো, হেঁচ্চো,—পঞ্চু বল্লে, "জীব, জীব!" সৈর সাহের হাসি মুখে দুবার মাথা নাড়া দিয়ে বল্লে, "বহুত আচ্ছা—তোমার মা বাপ বেঁচে আছে ত?"

"বাবা আছে, জন্মে অবধি মায়ের মুখ কেমন, তা দেখিনি।"

"আহা আমার বড্ড দুঃখু হচ্ছে, তোমায় যদি আগুনে দি, তাহলে বুড়োটা কেঁদে মর্‌বে—হেঁচ্চো, হেঁচ্চো।" পঞ্চু আবার বল্লে "জীব"।

অধিকারী আবার মাথা নেড়ে হাস্‌ল। বল্লে, "বহুত আচ্ছা! তোমায় তাহলে পোড়ান চল্‌বে না, তবে উননে আর কিছু কাঠ না জ্বালালেও তো কাবাবটা কাঁচা থাকে—এখন উপায়? এই হ'রে ও পঞ্চা, তবে আমার পুতুলদেরি একটাকে চুলোয় যেতে হল দেখ্‌ছি। হেই জমাদার, এই হরেটাকেই উন্নুনে ভর।"

হরে বেচারা কাঁপতে কাঁপতে সটান মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল!

পঞ্চু হুহু করে কেঁদে কাবাবী মিঞার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "দোহাই তোমার, হরিনাথকে ছেড়ে দাও, দোহাই হুজুর দয়া কর।"



"তোমায় প্রাণদান করছি, সেই ঢের; আবার ওকে ছাড়ব, তবে আমার কাবাব হবে কি করে?"

পঞ্চু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, জোরের সঙ্গে বল্লে, "জমাদার মশায় এসো আমায় ধরে চুলোয় পূরে দাও; আমি মরি সেও ভাল, আমার জন্যে আর কাউকে মরতে কিছুতেই দেবনা।"

পঞ্চুর সে চেহারা দেখে আর গলার আওয়াজ শুনে, আর সব পুতুলেরা হায় হায় করে কেঁদে উঠল।

কাবাবী মিঞা প্রথম খানিকটা জমাট বরফের মত অটল হয়ে রইল, একেবারে নড়চড় নেই যেন একটা পাথরের ঢিবি। কিন্তু ক্রমে মনটা তার গলে গেল, আবার হাঁচির আবির্ভাব হল। তিনবার হেঁচে আদর করে হাত বাড়িয়ে বল্লে, 'সাবাস পঞ্চু! সত্যি তুই ভাল ছেলে, আয় আমার কোলে আয়।'

পঞ্চু অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, দাড়িগুলো সরিয়ে দুই গালে এম্নি দুই চুমো খেলে যে বহুদূর পর্য্যন্ত তার আওয়াজ শোনা গেল!

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চেলা বা তেঁতুলে বিছা

ভাই সন্দেশ,

আমি উড়িষ্যার পাহাড়ের বনে জঙ্গলে থাকি—আর, এদেশের বুনো হাতী, বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি ঘরের কাছে এসে উৎপাত করে, আর নানা রকমের কিম্ভূত-কিমাকার বিদ্‌ঘুটে পোকা মাকড় আমায় জ্বালাতন করে, তা শুনে তোমার নাকি ভারি আমোদ হয়েছে? তা হবে বই কি? কলকাতায় থাক কি না। সেখানে বড় বড় পাকা রাস্তা—পাহারাওয়ালা লম্বা লাঠী হাতে করে পাহারা দিচ্ছে—সেই সব রাস্তায় হেঁটে বেড়াও; আর পাকা কোঠার দোতালা ঘরে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে, আরামে ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যানের হাওয়া খাও; আর মাঝে মাঝে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেখানকার লোহার খাঁচায় বন্ধ করা বাঘ ভাল্লুককে মুখ ভেংচিয়ে বীরত্ব দেখাও।

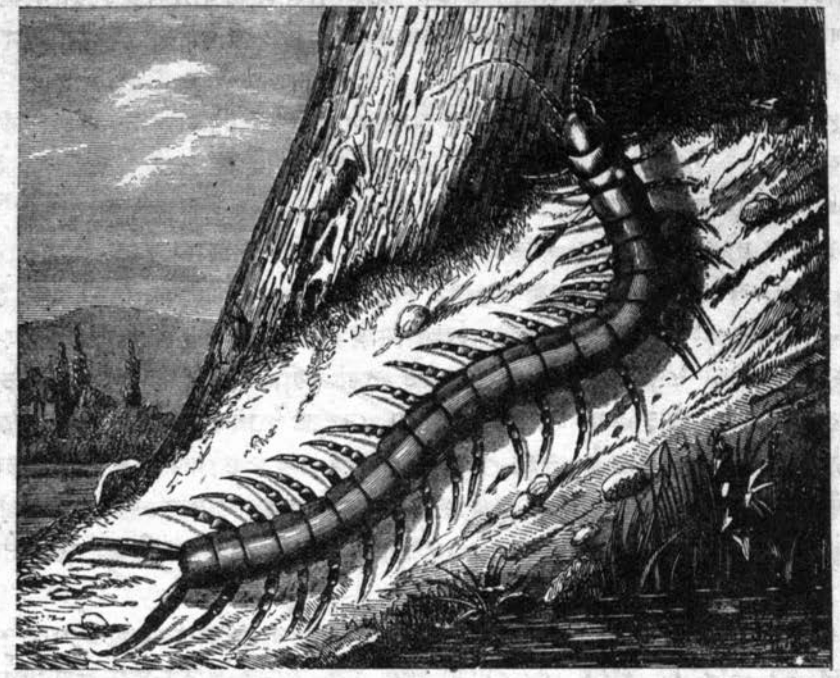
তুমি হাস্‌বে বই কি!

ভায়া, কিছুদিন আগে যে বিছাটা আমি ধরেছিলাম, সেটা যদি তোমার সাম্‌নে কিল্‌বিল্ কর্‌ত, তুমি তা হ'লে ভয়ে আঁৎকে উঠতে। আর যদি তার একটা কামড় খেতে, তিন দিন পর্য্যন্ত সার্কাসের বাঁদরের মত নাচ্‌তে থাক্‌তে, আর চীৎকার করে পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুল্‌তে।

এবার এটা কাঁকড়া বিছা নয় তেঁতুলে বিছা—ইংরাজিতে বলে "সেন্‌-টি-পিড্" (Centipede), তার মানে "শত পদ।" ঠিক্ একশ'টা না হ'ক অনেকগুলি পা থাকে বলে এদের "শত পদ" বলে।

গত বড়দিনের ছুটিতে বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চৌদ্দ দিন পরে ঘরে ফিরে এলাম। এই চৌদ্দ দিন আমার ঘরের টেবিলের উপরের খাতা পত্র, বই, কোনটাই নাড়া চাড়া হয় নাই। বাড়ী ফিরে এসে তোমায় একটা আশ্চর্য্য ফড়িঙের কথা লিখ্‌ব বলে যেই খাতার তাড়াটা তুলেছি, অমনি দেখি তার তলায় একটা মস্ত তেঁতুলে বিছে, যাকে পূর্ব্ব বঙ্গে বলে "চেলা" বা "চ্যালা।"

খাতা তুলতেই সেটা সুড়সুড় করে পাশের বই-এর ফাঁকে ঢুকল। আমি তখন



দৌড়ে একটা বড় চিম্‌টে নিয়ে এলাম। বইটা সরাতেই বিছাটা বেরিয়ে আর এক বইএর ফাঁকে ঢুক্‌তে চল্ল। আমি তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে একটা বড় কাঁচের বোতলের মধ্যে পূরে ফেল্লাম।

এর গাটা দেখ্‌তে যেন এক ছড়া তেঁতুলের বীচির মালা। এক ছড়া পাকা তেঁতুলে যেমন অনেকগুলি কোষ বা পাঁপ্ (পর্ব্ব) একটার পর একটা সাজান থাকে, এ বিছার শরীরটাও সেই রকম অনেকগুলি একই রকমের চাক্‌তি, কোষ, বা পাঁপ্ পর পর ছড়ার মত করে গড়া।

আমি গুনে দেখ্‌লাম যে মাথা বাদে এর গায়ে একুশটা কোষ আছে। প্রত্যেক কোষ, পিঠের দিকে একখানি আর পেটের দিকে একখানি এই দুইখানি শক্ত চাক্‌তি দিয়ে গড়া। এই দুইখানি চাক্‌তি দুই পাশের দিকে পাৎলা চামড়া দিয়ে একসঙ্গে

জোড়া। যতটা কোষ আছে তার প্রত্যেকটার দুপাশ থেকে দুটা পা বেরিয়েছে। একুশটা কোষে একুশ যোড়া পা। পিছন দিকে পাগুলি ক্রমশঃ বড় হয়ে গিয়েছে। শেষের পা যোড়া সব চাইতে বড় আর পিছন দিকে লম্বিয়ে থাকে, দেখ্‌লে মনে হয় যেন দুটো শুঁয়ো।

পাগুলিতে পাঁচটা করে গাঁইট আছে আর প্রত্যেক পায়ের আগায় ছুঁচল বাঁকা নখ আছে।

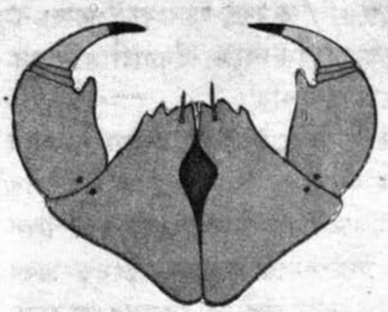
একে আমার ইঞ্চিকাঠি দিয়ে মেপে দেখলাম। নয় ইঞ্চ লম্বা আর আধ ইঞ্চ চৌড়া হ'ল। "সন্দেশ"এর পাতা লম্বায় আট ইঞ্চ—বিছাটা তার চেয়েও এক ইঞ্চি বেশী লম্বা। এখন দেখ কত বড় বিছাটা। তুমি অত বড় বিছা কখন দেখ নাই—তোমার কলকাতায় এত বড় বিছা নাই। এরা পাহাড়ে যায়গায় থাকে। এ জাতের বিছা এক একটা এর চেয়েও বড় হয়। ১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়! আমরা সচরাচর পাঁচ ছয় ইঞ্চ লম্বা বিছা দেখ্‌তে পাই। পৃথিবীর সব দেশেই তেঁতুলে বিছা দেখা যায়। গরম দেশের বিছাই খুব বড় বড় হয়। ইউরোপে বড় বিছা জন্মায় না। সেখানে অনেক জাতের বিছা আছে তাদের কারু গায়ে ৭টা কারু ১৫টা আবার কারু ৩৯টা কারু ১২৩টা করে কোষ থাকে। কিন্তু সব জাতই ছোট ছোট।

এখন এর মাথাটা দেখা যাক্‌। মাথার উপরের দিক্‌টা একটা গোল শক্ত তালের মত চাক্‌তি, তাতে এক যোড়া লম্বা, সরু, অনেক-গাঁইট-যুক্ত শুঁয়া আছে, আর মাথার দুইধারে চারটি করে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আছে।

মাথার তলার দিক্‌টায় আর একখানা চাক্‌তি আছে, তাতে এক যোড়া, কাস্তের মত বাঁকা, খুব শক্ত আর ছুঁচল ঠোঁট আছে। এই ঠোঁটকে দংশনোষ্ঠ বলা যেতে পারে। এটা কিন্তু মুখের ঠোঁট নয়। সে ঠোঁট আর এক যোড়া আছে তা দিয়ে বিছারা খায়। মাথায় যে দুটা চাক্‌তি আছে, সে দুটাও গায়ের কোষ। এদুটা থেকে দু'যোড়া পা বেরুন উচিত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে দ্বিতীয় যোড়া পা-ই বদ্‌লে গিয়ে ঐ রকম সাঁড়াশির মত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এটা বিছাদের শিকার ধরবার ও মারবার অস্ত্র ; আর শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার অস্ত্রও বটে।

এই দুটা দংশনোষ্ঠের গোড়ার দিক্‌টা মোটা আর নরম, আর তাতে বিষের থলে থাকে। আগের দিক্‌টা বিড়ালের নখের মত ক্রমশঃ সরু, বাঁকা ও ছুঁচল আর

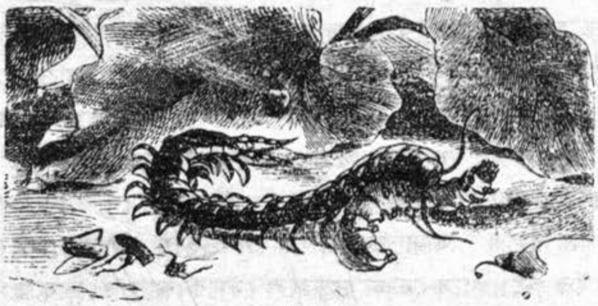
লোহার ছুঁচের মত শক্ত আর কাল। তার ভিতরে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত লম্বা সরু ছিদ্র আছে। বিছা যাকে কামড়ায় তাকে এই 'ঠোঁট' দিয়ে সাঁড়াশির মত চিমটে ধরে, আর সেই সময়ে তার ঠোঁটের ভিতরের ছিদ্র দিয়ে বিষের থলি থেকে বিষ ঢেলে দেয়। সে বিষের বিষম জ্বালা। যারা বিছের কামড় খেয়েছে তারাই জানে কেমন মজা। ছোট ছোট জন্তু ত অজ্ঞান হয়ে যায়, অনেক সময়ে মরেও যায়।



এই বিছার গায়ের উপর দিকের রং পাকা তেঁতুতের মত গাঢ় ব্রাউন বা লাল্‌চে কাল। পেটের দিকের রং মেটে হল্‌দে। দুই পাশের রং লাল্‌চে মেটে, পায়ের রং লাল, পায়ের নখগুলি কাল।

এরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে। ইট পাথর বা কাঠের তলায়, পাথরের দেয়ালের ফাটলে বাস করে। কখন কখন ঘরের ভিতর এসে, তক্তপোষের ফাঁকে, চেয়ারের তলায় টেবিলের কোণে, জুতার ভিতরে, কোটের মধ্যে, তোষকের তলায়, বইএর ফাঁকের মধ্যে আশ্রয় লয়।

এরা রাত্রিতে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। তেলাপোকা, গুবরেপোকা, শুঁয়ো পোকা, কেন্নো, কেঁচো আর নানা রকমের কীট পতঙ্গ, পোকা মাকড় খায়। ছোট ছোট টিক্‌টিকি গিরিগিটি ধরে খায়। একবার লণ্ডনের পশুশালায় একটা এদেশী বড় তেঁতুলে বিছা রাখা হয়েছিল। তাকে তার চেয়ে বড় জীয়ন্ত টিক্‌টিকি আর গিরগিটি খেতে দেওয়া হইত। সেটা তাই খেয়ে এক বৎসর বেঁচে ছিল।



চেলা বিছা শুয়োঁ পোকাকে খাচ্ছে

স্ত্রী-বিছা অন্ধকার ঠাণ্ডা যায়গায় গোছা গোছা ডিম পাড়ে। সেগুলি দেখতে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল গোল ফলের গোছার মত। বিছা ডিম পেড়ে সেই ডিমে তা দেবার জন্য তার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। যত দিন ডিম ফুটে ধাচ্চা না বেরোয় ততদিন আর নড়ে চড়ে না। অনেক দিন খাবার টাবার না পেলে নিজের ক্ষুদে ক্ষুদে ছানা যারা ডিম ফুটে বেরোয় তাদের ধরে ধরে খায়।

বাচ্চা যখন ডিম ফুটে বেরোয় তখন তার গায়ে ২১টা গাইট থাকে না আর ২১ যোড়া পাও থাকে না। তার চেয়ে ঢের কম থাকে। অথচ দেখতে ঠিক্ মার মতই হয়। অল্প সংখ্যক কোষ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তারপর মাঝে মাঝে খোলস বদলায়, আর প্রত্যেকবার একটু করে বড় হয়। সেই সময়ে পুরাতন দুই কোষের মাঝে দু একখানা নূতন কোষ গজায়। এইরূপে ক্রমে শরীরে কোষের সংখ্যাও বাড়ে শরীরটাও লম্বায় বেড়ে যায়। এই রকম বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণাবয়ব হয়, অর্থাৎ যে জাতের বিছার শরীরে যতগুলি কোষ বা পাঁপ হবার থাকে, তা হলে পর আর বাড়ে না। দেখ না যেমন তুমি আগে ছিলে কত ছোট, মার কোলে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে, তারপর ক্রমে বড় হতে লাগ্‌লে, লম্বায় বাড়ছ, ওজনে ভারি হচ্চ, কিন্তু তাই বলে কি তাল গাছ ছাড়িয়ে যাবে না হাতীর মত ওজনে হবে? ২০।২৫ বৎসর বয়স হলে যতটা লম্বা হবার তা শেষ হবে। আর বাড়্‌বে না।

এদের আর একটা মজা আছে জান। এর মাথাটা যদি কেটে ফেলে দাও, ত সমস্ত গা টা আর সব পা গুলি চলতে থাক্‌বে। মুণ্ডহীন বিছা অনেক দূর চলে যাবে। সাম্‌নে যদি একটা বাধা দাও, ত থম্‌কে দাঁড়াবে, না হয় পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আবার তার শরীরটাকে যদি দু খণ্ড কর, তবে প্রত্যেক খণ্ডই আলাদা চল্‌তে থাক্‌বে, নড়বে চড়্‌বে। যে খণ্ডতে যতটা কোষ গাঁথা থাকবে সে সব কোষ এক যোটে এক দিকে চল্‌বে একটা কোষের পা এক দিকে আর একটা কোষের পা আর এক দিকে তা যাবে না। চার খণ্ড কর প্রত্যেক খণ্ডই আলাদা আলাদা চল্‌তে ফিরতে থাক্‌বে, প্রত্যেক খণ্ডতেই প্রাণ থাক্‌বে। এখন বল দেখি-বিছের কটা প্রাণ? আর প্রাণটা কোথায় থাকে? আর প্রাণটা কি রকম করে শরীরের মধ্যে থাকে—পাখি যেমন খাঁচায় থাকে, না, গ্যাস্ যেমন বোতলে থাকে আর উড়ে যায়? ভায়া আমি ত জানি না, তুমি এখন গবেষণা করে ঠিক কর।

তোমার মেজ দাদা মশাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

গল্প নয়—সত্য ঘটনা



জন্তুওয়ালা অনেক জন্তু লইয়া সহরে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছে। মনে করিয়াছে, আজ হাটের দিন বিস্তর লোক হাটে আসিবে, আর তামাসা দেখিয়া পয়সা দিবে। হাটে লোকের কমি নাই, কিন্তু জন্তুওয়ালার ঘরের আধখানাও ভরিল না। জন্তুগুলারও যেন স্ফূর্ত্তি নাই। লোক কম দেখিয়া তাহারাও কেমন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাল তামাসা হইতেছে না দেখিয়া, যে দু'চারজন দর্শক উপস্থিত, তাহারাও হাসি ঠাট্টা করিতেছে।

এমন সময়ে বাঘটার যেন কি হইল। সে এতক্ষণ খাঁচার এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। কথাবার্ত্তা নাই, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, খাঁচার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক গর্জ্জন! সেই গর্জ্জন শুনিয়া দর্শকেরা হাসি ঠাট্টা ফেলিয়া, দুই লাফে দূরে সরিয়া গেলেন।

ব্যাপারখানা কি? এত রাগের ত কোন কারণই দেখা যায় না—তবে ঐ যে গাঁট্টা গোঁট্টা, লাল গোঁপওয়ালা জাহাজের মাল্লাটা, নীল কোট পরিয়া থেৎলো টুপি মাথায়

দিয়া, এইমাত্র তামাসা দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যদি বাঘ মহাশয়ের ক্রোধ হইয়া থাকে।

মাল্লা বাঘের খাঁচার দিকে চাহিল, বাঘটাকেও খানিকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ করিয়া দেখিল। তারপর অমনি একেবারে বাঘের কাছে গিয়া উপস্থিত! বাঘ তাহাকে কাছে পাইয়া আরো গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দর্শকেরা ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, আর তাহাদের বড় ভয়ও হইল। মাল্লা কিন্তু ততক্ষণে খাঁচার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া, দিব্য বাঘের মাথা চাপড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—সেটাকে যেন সে বিড়াল ছানা পাইয়াছে! মাল্লা বলিল, "কিরে বিল্লি, কেমন আছিস্ ভাই?" লোক-গুলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যে ভয়ঙ্কর দাঁত, এক কামড়েইত মাল্লার হাতখানাকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে! বাঘ কিন্তু তেমন কিছুই করিল না। সে তাহার প্রকাণ্ড হল্‌দে মাথাটা আনিয়া, আদর করিয়া জ্যাকের (মাল্লার নাম) হাতে ঘষিতে লাগিল, আর আদর পাইলে বিড়ালের গলায় যেমন গুড় গুড় শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাহিরের লোকে ইহার খবর পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিতে লাগিল, ঘরে আর লোক ধরে না। কত লোক দরজায় এক পয়সার জায়গায়, সিকি দুআনি ফেলিয়া দিয়া, আর বাকী পয়সার জন্য দাঁড়ায় নাই, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে পারিলেই ঢের মনে করিয়াছে। জন্তুওয়ালার এখন আর দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে!

মাল্লা ততক্ষণে জন্তুদের একজন প্রহরীর হাত ধরিয়া বলিল, "বিল্লির খাঁচাটা একবার খোল না ভাই। ও আমার পুরানো বন্ধু; একবার ভিতরে গিয়া ওর সঙ্গে পুরানো কালের দুটো গল্প করে নিই।"

প্রহরী বেচারা একটু মুস্কিলে পড়িল, আর তা হওয়ারই কথা। বাঘকে বিশ্বাস কি? চোখের সাম্‌নে একটা লোককে চিবাইয়া খাইবে, এরূপ দেখিতে তার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আর খাঁচা খুলিলে জ্যাক ঘরে যাইবেন, অথচ বাঘ বাহিরে আসিবেন না, এরূপ করাও ত সহজ ব্যাপার নয়। আর বাঘ যদি বাহিরে আসিয়া হাই তোলেন, তবে তামাসাটা কি রকমের হইবে!

প্রহরী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্য বল্‌ছ না কি?" জ্যাক্ একটু চটিয়া বলিল, "সত্যি বল্‌ছি না ত কি? এ কোথাকার বোকা! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ও আমাকে চিন্‌তে পেরেছে?"

বাঘ সেই সময়ে আর এক হাঁক দিয়াছে। যেন বলিতেছে, "হাঁ হে, হাঁ!"

প্রহরী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া এক হাতে দরজা খুলিল, আর এক হাতে একখানা লোহার রুল বাগাইয়া ধরিল। জন্তুগুলি কথা না শুনিলে ঐ রুল দিয়া সে তাহাদের শাসন করে।

দরজা যাই খুলিল, অমনি দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল—পাছে বাঘ মহাশয়ের হঠাৎ জলযোগের খেয়াল হয়, আর বাহিরে আসিয়া দু একটিকে ধরিয়া মুখে দেন! কিন্তু বিল্লি তাহার বন্ধুকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, অন্য লোকের কোন খবরও নেয় নাই।

বাঘ অনেকবার মাল্লার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে মাথা ঘসিতে লাগিল; তারপর দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, হাত দুখানি জ্যাকের কাঁধে তুলিয়া দিল। জ্যাকও তাহার টুপিটা লইয়া বাঘের মাথায় পরাইয়া দিল।

টুপি পরিয়া নেহাৎ মন্দ দেখিতে হইল না, দর্শকেরা খুবই হাসিয়াছিল। কিন্তু তারপর আরও মজা হইয়াছিল। টুপিটি ফিরাইয়া লইয়া মাল্লা বলিল, "বিল্লি, যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে ত? দেখি;—লাফা!" মাল্লা এই কথা বলিয়া হাত খুব বাড়াইয়া ধরিল, আর বাঘ তাহার ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া পরিষ্কার তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গেল। "আচ্ছা, ফিরে এসো।" বাঘ অমনি লাফাইয়া ফিরিয়া আসিল!—ভারি বাধ্য ছাত্র!!

প্রহরী ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে কত চেষ্টা করিয়াও সেই বাঘকে দিয়া এত কাজ করাইতে পারে নাই। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই এত কথা ওকে কি ক'রে শিখালে?"

জ্যাক হাসিয়া বলিল, "জাহাজে থাক্‌তে ওকে খাওয়ানর ভারটা আমার হাতেই ছিল। সেটা দেখ্‌ছি আজও সে ভোলেনি,—কেমন রে বিল্লি?" বাঘ একটু ঘোঁৎ করিল; যেন বলিল, "আরে না!"

মাল্লা বলিল, "আচ্ছা বিল্লি ব'স্‌তো;" অমনি বাঘ মাটিতে বিড়ালের মতন করিয়া বসিয়া পড়িল। মাল্লা তাহার গায় ঠেসান দিয়া বসিয়া এক হাতে তাহার থাবা চুল্‌কাইয়া দিতে লাগিল। তারপর গান ধরিল।

বাঘ গানের সঙ্গে সঙ্গে ধুপ ধুপ করিয়া খাঁচার মেজে চাপড়াইতে লাগিল। খাঁচাখানা কাঁপিতে লাগিল। মাল্লা যখন খুব জোরে গাইতে লাগিল, তখন বাঘ

"এঁয়াও" করিয়া তাহার সঙ্গে তান ধরিল। সেই তানের চোটে ঘরের জানালা গুলি খট্ খট্ করিয়া উঠিল।

আরো তামাসা হইত, কিন্তু জ্যাক এই সময়ে জানালার ভিতর দিয়া গির্জার ঘড়ি দেখিতে পাইল। তাহাকে রেলে অনেক দূর যাইতে হইবে, আর দেরি করিলে চলিতেছে না! সুতরাং সে বিল্লির কাছে বিদায় লইল।

বিল্লি কিন্তু তাহাকে অত তাড়াতাড়ি ছাড়িতে রাজি নহে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে সেও খাঁচার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—প্রহরী দরজা খুলিলে সেও জ্যাকের সঙ্গে যাইবে! প্রহরী দরজা খুলিতেছিল, বাঘের কাণ্ড দেখিয়া আর খুলিল না। জ্যাক্ তিনবার চুপচাপ সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল—বাঘ তাহার কোটের কোণ কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার ফিরাইল। জ্যাক্ মুস্কিলে পড়িয়া বলিল, "এতো বড় মুস্কিল রে বাপু। আমি ত থাক্‌তে আসিনি, আমি যে শুধু দেখ্‌তে এসেছিলাম।"

কিন্তু প্রহরীর মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মাল্লা যতই যাইতে চাহিতেছে বাঘ ততই বিরক্ত হইতেছে; শেষে চটিয়া গিয়া এক থাপ্পড় বসাইয়া দিলেই ত মাল্লার দফা নিকাশ হইয়া যায়! এই সময়ে তাহার এক বুদ্ধি জুটিল। খাঁচাটাতে দুইটি কামরা। বাহিরেরটাতে বাঘ সকল লোকের সামনে তামাসা দেখায়, ভিতরেরটাতে বসিয়া সে আহার করে। মাঝখানে দরজা আছে, বাহির হইতেই তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এই ভিতরের কামরায় বড় এক টুক্‌রা মাংস ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, আর বাঘ অমনি বন্ধুকে ভুলিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। চতুর প্রহরী তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জ্যাকও সুযোগ বুঝিয়া তাহার পথ দেখিল।

মাজ্‌জুন্

(তুরস্কদেশের গল্প)

এক বুড়ীর একটিমাত্র ছেলে ছিল আর তার মাথাটি ছিল একেবারে নেড়া—যেন একটা বেল! বুড়ীর ইচ্ছা, ছেলে কাজকর্ম্ম শিখে, ক'রে খাবে। কিন্তু যেখানেই সে ছেলেকে কাজ শিখ্‌তে দেয়, দুদিন যেতেই সেখান থেকে সে চম্পট্ দেয়।

একদিন নেড়া পাল্কির মধ্যে বাদসার মেয়েকে দেখ্‌তে পেয়েই তাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠ্‌ল। বাড়ী গিয়েই মাকে বল্‌ল—"মা! এখনই বাদসার কাছে গিয়ে

বল, তাঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।" একথা শুনে বুড়ীর ত চক্ষুস্থির! ছেলেকে বল্‌ল—"কি সর্ব্বনাশ! বলিস্‌ কিরে? চুপ্‌ চুপ্‌! ঘরে একটা কাণা কড়া নাই, কাজ কর্ম্ম জানিস্‌ না, আবার তোর নেড়া মাথা! তোর সঙ্গে বাদ্‌সার মেয়ে বিয়ে দিবেন এমন কথা মুখে আনিস্‌?" নেড়া কি তা শোনে? সে কোন মতেই তার জেদ্‌ ছাড়ল না। বুড়ী দেখ্‌ল—বাদসার কাছে না গেলে, ছেলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ কর্‌তে চায়।

বুড়ী বাদসার কাছে গিয়ে বল্‌ল—"হুজুর! আমার ছেলেটা রোজ বলে, মা তুমি বাদসার কাছে গিয়ে বল, আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিন। এই বলে আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে খেল। তার জ্বালায় আমি আর কিছুতেই টিকতে পারলাম না —তাই আপনার কাছে বল্‌তে এসেছি। এখন আমাকে মারুন, কাটুন, ফাঁসি দিন্‌ আপনার যা খুসী করুন।" বাদ্‌সা বল্‌লেন—"বটে! ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" এই বলে বুড়ীকে বিদায় করলেন।

বুড়ী বাড়ী এসে ছেলেকে বল্‌ল—"শীগ্‌গির যা, বাদ্‌সা তোকে ডেকেছেন।" ছেলে ভারি খুসী হয়ে বাদসার কাছে গিয়ে উপস্থিত। তার নেড়া মাথা দেখেই বাদ্‌সা নাক্‌ সিট্‌কালেন আর বল্‌লেন—"আচ্ছা, যদি ছুনিয়ার সব রকম পাখী ধরে আমার কাছে আন্‌তে পার, তবেই আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে—আর যদি না পার ত মাথা কাট্‌ব।" কথাটা শুনে নেড়া যে বড় খুসী হ'ল তা নয়। ছুনিয়ার পাখী ধরা ত সহজ কাজ নয়! ভেবে চিন্তে নেড়া বাড়ী ছেড়ে চল্‌ল পাখীর খোঁজে।

অনেক বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে অনেক দিন পরে তার এক ফকিরের সঙ্গে দেখা। নেড়ার সব কথা শুনে ফকির বল্‌লেন—এই দিক্‌ দিয়ে যাও। সোজা চলে গিয়ে দেখ্‌বে খুব উঁচু একটা ঝাউ গাছ। ঐ গাছের তলায় বসে থাক। রাত্রে দেখ্‌তে পাবে ছুনিয়ার যত রকম পাখী সব এসে ঐ গাছে বসেছে। তখন তুমি একবার "মাজ্‌জুন" বলে দেখো দেখি? সব পাখী ঐ গাছে আট্‌কে যাবে! তারপর মজা করে তাদের ধরে বাদসার কাছে নিয়ে যেও।" এই বলে ফকির চলে গেলেন।

তখন নেড়ার আহ্লাদ দেখে কে! সে ফকিরের কথামত সেই ঝাউ গাছ খুঁজে বার করে তার নীচে বসে রইল। সন্ধ্যার পরই দেখ্‌ল চারিদিক্‌ অন্ধকার করে ছুনিয়ার সব পাখী এসে ঐ গাছে বসেছে। এই দেখে সে আর একটুও দেরি করল না,

"মাজ্‌জুন" বলে এক চীৎকার! অমনি সব পাখী গাছে আট্‌কা পড়ে গেল; একটিরও উড়ে পালাবার সাধ্য রইল না!

তারপর বেছে বেছে সব পাখী নিয়ে নেড়া বাড়ী ফিরে এল। পরদিন সকাল হতে না হতেই পাখীগুলোকে নিয়ে বাদ্‌সার কাছে গিয়ে উপস্থিত। এই অসম্ভব কাজটাও নেড়া করে ফেলেছে দেখে বাদ্‌সা বড় খুসী হলেন না। নেড়াকে বল্‌লেন—"এখন যাও, মাথায় চুল গজিয়ে টেরি কেটে এস—তবে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে।"

বাদ্‌সার এই কথা শুনে নেড়ার মনে কি যে দুঃখ হলো তা বলা যায় না! বাড়ী ফিরে এসে সে মুখখানি বেজার করে কেবলই বসে থাকে আর ভাবে।

এদিকে বাদ্‌সা করলেন কি, নেড়াকে ফাঁকি দেবার জন্য, তাড়াতাড়ি উজিরের ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করে, বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। কি জানি, নেড়া আবার চুল গজিয়ে বসে! কথাটা ক্রমে যখন নেড়ার কানে গেল, তখন তার যা রাগ! সে কর্‌ল কি, বিয়ের রাত্রে ভিড়ের সঙ্গে প্রাসাদে ঢুকে বিয়ের সভার পাশে লুকিয়ে বসে রইল। যখন দেখল বরকনে ঘরে ঢুকেছে, অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "মাজ্‌জুন্‌"! বাস্‌, আর কারও নড়বার সাধ্য নাই—বরকনে চাকর বাকর হোম্‌রা চোম্‌রা যে যেমনভাবে ছিল, তেমনি ভাবেই আড়ষ্ট হ'য়ে রইল!

এদিকে রাত বেড়েই চলেছে, কিন্তু তবু বিয়ে শেষ হচ্ছে না কেন? ব্যাপার কি? বাদসার পেয়াদা গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে নাক ঢুকিয়েছে—ব্যাপার দেখ্‌বার জন্য। তা দেখে নেড়াও বলে উঠেছে "মাজ্‌জুন্‌"। আর বেচারি চাকরের নাকের ডগাটা দরজার সঙ্গে আট্‌কে গেল! তারপর একজন একজন করে যত লোক খবর নিতে আসে "মাজ্‌জুন্‌" শুনে সকলেই এম্‌নি আট্‌কে থাকে যে সাধ্য কি আর নড়ে!

যে যায় সে আর ফেরে না! বাদ্‌শা মশায় অনেক ভেবেও যখন এই ব্যাপারের কিনারা কর্‌তে পার্‌লেন না, তখন ভয়ে তিনি গণক ডাক্‌তে পাঠালেন। চাকরেরা যখন গণক ডাক্‌তে যায় তখন নেড়াও সভা থেকে নেমে এসে, চুপি চুপি তাদের পিছনে পিছনে চলেছে। পথে বাদ্‌সার চাকরেরা এক কসাইএর দোকানে মাংস কিন্‌তে ঢুক্‌ল। তারপর যেই তারা মাংসে হাত দিয়েছে অমনি পিছন থেকে নেড়া বলে উঠ্‌ল "মাজ্‌জুন্‌", আর তখনই সব চাকরের হাত মাংসের সঙ্গে আঠার মত লেগে গেল!

এদিকে চাকরদের ফির্তে দেরি হচ্ছে দেখে বাদ্সা নিজেই চল্লেন। ক্রমে কষাইএর দোকানের কাছে গিয়ে যখন চাকরদের অবস্থা দেখ্লেন, তখন তাঁর চোখ্ ছুটো এই বড় বড় হয়ে গেল! "হায়, আল্লা! কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার কি?" এই বলে দৌড়ে চল্লেন গণকের বাড়ীতে। গণক সব কথা শুনে অনেক অঙ্ক টঙ্ক কষে বল্ল—"হুজুর! আপনি এক নেড়াকে বলেছিলেন তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবেন? কিন্তু কথা রাখেন নি কেন? সেজন্য নেড়া রাগ করে এসব কাণ্ড কর্ছে।" বাদ্সা বল্লেন—"এখন উপায়?" "উপায় আর কি? নেড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন্।"



কি সর্ব্বনাশ!

বাদ্সা দৌড়ে প্রাসাদে এসে নেড়ার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠালেন। নেড়া তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে মাকে বল্ল—"মা! বাদ্সার লোক এসে আমার খোঁজ করলে বলো—সে ত ঢের দিন হলো কোথায় জানি চলে গিয়েছে। তারা যদি জিজ্ঞেস্ করে—কোথায় গেছে? তুমি বলো—হাজার মোহর পেলে তবে খুঁজে দেখ্তে পারি।"

খানিক বাদেই বাদসার লোক এসেছে নেড়ার খোঁজে। নেড়ার মা বুড়ী, ছেলে যেমন যেমন শিখিয়েছিল তেম্নি বল্ল। তখন বাদ্সার লোকেরা বল্ল "তাইত! বাদ্সা বল্ছেন, নেড়ার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিবেন—এখন নেড়াকে খুঁজে পাই কোথা?" বুড়ী বল্ল—"হাজার মোহর দাও ত একবার তাকে খুঁজে বা'র করি।" বাদ্সার লোকেরা হাজার মোহর দিয়ে বল্ল—"শীঘ্র খুঁজে নেড়াকে বাদ্সার কাছে নিয়ে এস, আরো ঢের মোহর পাবে।"

পরের দিন নেড়া হঠাৎ সাজ পোষাক করে বাদ্‌সার কাছে গিয়ে উপস্থিত! তাকে দেখেই বাদ্‌সা বলে উঠলেন—"এস এস বাপ্ আমার! এত দিন কোথায় ছিলে? তোমার অপেক্ষায় বসে বসে যে হয়রান হয়েছি!" নেড়া বল্‌ল—"বাদ্‌সা সাহেব! আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবেন বল্‌লেন আর কথা রাখলেন না?"—বাদসা বল্লেন, "সে কি! বিয়ে ত তোমার সঙ্গেই দেব। হোক্ না তোমার নেড়া মাথা, তাতে কি?" তখন "মাজ্‌জুন্! ছোড়্ দেও," এই বলে নেড়া সকলকে ছেড়ে দিল। আর সেই উজিরের ছেলে নাকি ছাড়া পেয়েই কোথা যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কিছুতেই আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

স্বরলিপি—বাতাসের গান

অরুণ মল্লার—দাদ্‌রা।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
সা ন্‌া II { সা -া রা -া রা -া I রা -া গা রা গা -া I মা -া ধপা -া মা -া I
মো রা না ০ চি ০ ফু ০ লে ০ ফু ০ লে ০ তু ০ লে ০ তু ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I (গা -া -রা সা ন্‌া -া) } I গা -া -া গা মা -া I পা -া পা -া পা -া I
লে ০ ০ মো রা ০ লে ০ ০ মো রা ০ না ০ চি ০ স্থ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I পা -া রা -া গা -া I মা -া ধপা -া মা -া I গা -া রা সা না -া II
০ র ০ ধু ০ নি ০ কূ ০ লে ০ কূ ০ লে ০ ০ মো রা ০

০ ১´ ০ ১´ ০
সা গা গা -া II { মা -া মা মা মা -া I মা -া মা মা মা -গা I
ক থ ন ০ চ ০ লি বে গে ০ ক ০ ভু মৃ হু ০
য থ ন ০ থা ০ কি ঘু মে ০ থা ০ কে ঘু মে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I রা গা রা মা গা -া I (-া -া গা গা গা -মা I পা -া পা পা পা -া I
চ ০ র ০ ণে ০ ০ ০ ক থ ন ০ ছু ০ টি মো রা ০
ধ ০ র ০ ণী ০ ০ ০ গ হ ন ০ ন দী দি নি ধি ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I পা -া পা পা পা -া I পা ধা পা ধা পা -া I -ধপা -ধা গা গা গা -া) } I
ফু ০ ল ফ ল ০ হ ০ র ০ ণে ০ ০০ ০ ক থ ন ০
ন ভে ০ মে ঘ ০ ত ০ র ০ ণী ০ ০০ ০ য থ ন ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I -া -া -া { গা গা -মা I পা -া পা -া পা -া I পা -া পা -া ধা -া I
০ ০ ০ কো থা ০ হ ০ তে ০ এ ০ সে ০ ছি ০ ক ০
০ ০ ০ পু ন ০ জা ০ গে ০ হ ০ র ০ ষে ০ মো ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I না -া র্সা -া ধা -া I না -া ধপা -পা গা -া I মা -া ধপ -া মা -া I
বে ০ যে ০ ভে ০ সে ০ ছি ০ ০ তা ০ গে ০ ছি ০ ভু ০
দে ০ র ০ প ০ র ০ শে ০ ০ ন ০ য ০ ন ০ খু ০

১´ ১´ ০
I (গা -া -া) } গা -া রা সা ন্‌া -া II
লে ০ ০ লে ০ ০ মো রা ০
লে ০ ০ লে ০ ০ মো রা ০

০ ০ ১´ ০ ১´ ০
-া -া -া -া II { পা -া পা -া পা -া I পা -া না -ধা না -া I
০ ০ ০ ০ খে ০ লি ০ লু ০ কো ০ চু ০ রি ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I র্সা -া র্রা -া না -া I র্সা -া -া -া -া -া I র্সা -া র্সা -া র্সা -া I
ক ০ ভু ০ ব ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ তি ০ নি ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I র্সা -া না -ধা না -া I না -া ধনা র্সা না -া I ধপা -পা -া -া -া -া } I
ধি ০ স ০ নে ০ ক ০ ভু ০ ০ র ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I { ণা -া ণা -া ণা -া I ধা পা ধা -া ধা -া I ধা া- র্সণা -া ধা -া I
ভা ০ সি ০ আ ০ কা ০ শে ০ নী ০ র ০ দ ০ স ০

১´ ০ ০ ১´ ০
I পা -া -া (মা -গা -া) } মা গা -া I { মা -া ধপা -পা মা -া I
নে ০ ০ ০ ০ ০ শ ত ০ পা ০ ল০ ০ তু ০

১´ ০ ১´ ০
I (গা -া -া রা গা -া) } I গা -া রা সা ন্া -া II II
লে ০ ০ শ ত ০ লে ০ ০ মো রা ০

ভোলানাথের সর্দ্দারি

সকল বিষয়েই সর্দ্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ্ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই সেখানে সে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে যায়; যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না, সেই কাজেও সে চট্‌পট্ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন "জ্যাঠা"—আর সমবয়সীরা বলে "ফর্‌ফরি-রাম"। কিন্তু তাহাতে তার কোন দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাস উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মত গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবষ্টারের ডিক্‌সনারি সব চাইতে ভাল। আমার বড়দাদা যে দু'ভলুম ওয়েবষ্টারের ডিক্‌সনারি কিনেছেন, তার এক একখানা বই এ-ত্তোখানি বড় আর এ-ম্নি মোটা! আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধান।" উঁচু ক্লাসের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কাণ মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মত?" কিন্তু তবু, ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন "এটা কিসের কল ভাই" বলিয়া খামখা সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনে শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি"? ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হ'ল বুঝি? দেখ্‌ত হাতলটা কি রকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশোনায় যে খুব ভাল ছিল তাহা নয়, কিন্তু তবু মাষ্টার মহাশয়

যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মত হইত, শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয় সেবারও সে এই রকম সর্দ্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া একদিন প্রত্যেক ক্লাসে ক্লাসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চুরি করিতেছে তোমরা কেউ কিছু জান?" ভোলানাথের ক্লাসে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম, হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জান্‌লে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লান বদনে বলিল "না, জানিনে—কিন্তু আমার মনে হয়।" মাষ্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন "জান না, তবে অমন কথা বললে কেন? ওরকম মনে কর্‌বার তোমার কি কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল "আমার মনে হচ্ছিল, বোধ হয় ও নেয়—তাই ত বললাম। আর ত কিছু আমি বলি নি।" মাষ্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই ভোলানাথের কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ান হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল তিনমাস পর্য্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর, বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কিরকম আট্‌কা পড়িয়াছিল, সে কথা ভাবিলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোন।

আমাদের স্কুলে আসিতে হইলে কলেজ বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে লেবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের-

ভিতরে গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরান হইতেছে, আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মত ঝিলীক্ জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি সখ হইল, সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল, যে ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছাটা তাহার কিছুতেই গেল না।

একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ী যাইতেছি, তখন ভোলানাথ যে কোন্ সময়ে কলেজ বাড়ীতে ঢুকিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে চুপি চুপি কলেজ বাড়ীর লেবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্ম্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সে দিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা বাজিয়া উঠিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে, আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও লাগাল পাওয়া গেল না। ভোলানাথের কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চীৎকার করা যাক্—যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, যে নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে, একটা পেঁচা হঠাৎ "ভূৎ-ভূতের ভূত" বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান!

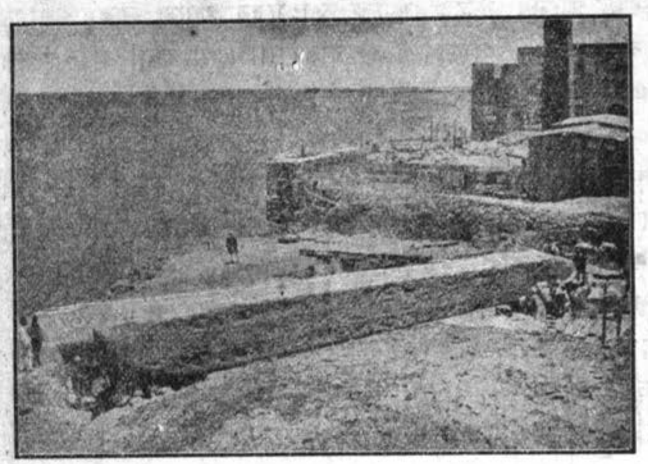
কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর ছু চারটি দেশভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহাউৎসাহে "হাঁ হাঁ রে কাহাঁ গয়ো রাম্" বলিয়া ঢোল কর্ত্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাত ছুপুর পর্য্যন্ত তাহাদের কীর্ত্তনের হল্লা চলিল ; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় ছুম্ছুম্ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক্—তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে, চিল্লানে দেও।" এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ীর লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকী রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল "ইস্কুল বাবুদের" কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই ছুম্ ছুম্ শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশী দেরী হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপাল বাবুর কাছে, গোপাল বাবু বাসায় নাই, ভাইঝির বিবাহে গিয়াছেন সোমবার আসিবেন ! তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সারসির কাঁচ ভাঙ্গিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে-মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাসে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আট্কা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। সে কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাছুরির জন্য কলেজ বাড়ীতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল ! যখন সে দেখিল যে তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুস্ড়াইয়া গেল যে অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দ্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

আদ্যিকালের কীর্ত্তিস্তম্ভ

লণ্ডন সহরের মধ্যে, যেখানে নিতান্তই একালের সব ঘর দালান খাড়া হ'য়ে রয়েছে, ঠিক তারই মাঝখানে, টেম্‌স্ নদীর ধারে, কোন্ আদ্যিকালের এক কীর্ত্তিস্তম্ভ দাঁড় করান হ'য়েছে। যেখানে পাঁচশ' বছরের পুরান জিনিষ দেখ্‌লে মানুষ বলে, "ইস্! কত প্রাচীন"—সেখানে সাড়ে চার হাজার বছরের পুরান এই স্তম্ভটি নিতান্তই যেন "উড়ে এসে জুড়ে বসেছে"।



স্তম্ভ আলেকজান্দ্রিয়ার বালিতে প'ড়ে

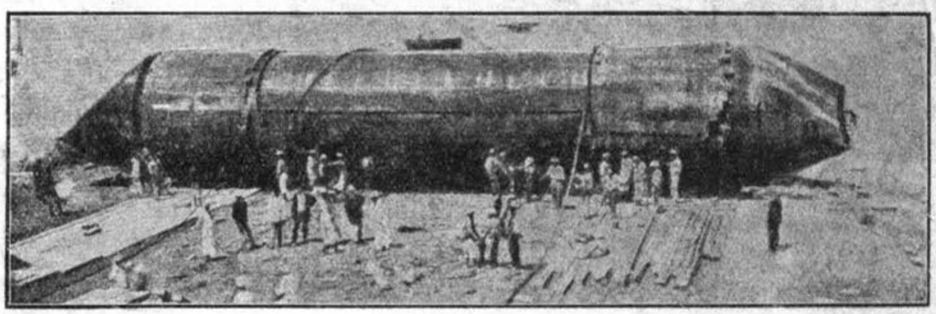
এই স্তম্ভের নাম 'Cleopatra's Needle' অর্থাৎ "ক্লিওপেট্রার সূচিস্তম্ভ"। ওজনে পাঁচ হাজার মণ ভারি, ৪৬ হাত লম্বা চৌকোণা থাম—তার আগাটি ছুঁচল, আর গায়ে হিজিবিজি ছবির মত সব অক্ষর! দেখ্‌তে যে খুব একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হয় তা নয়, কিন্তু স্তম্ভটির ইতিহাস ভারি অদ্ভুত।

সাড়ে চার হাজার বৎসর আগে, যখন লণ্ডনসহরের কোন অস্তিত্বই ছিল না, যখন গুহাবাসী অসভ্যেরা ইংলণ্ডের বাসিন্দা ছিল—সেই সময়ে ইজিপ্টের রাজা থৎমেস্ ভাব্‌লেন, তিনি এক কীর্ত্তিস্তম্ভ তৈরী করাবেন। ৭০০ মাইল দূর সমুদ্রের পার হ'তে আস্ত লাল পাথরের চালান এল। সেই পাথর খোদাই ক'রে ছবির ভাষায় রাজার কীর্ত্তির কথা আর সূর্য্যদেবের স্তবস্তুতি তার মধ্যে লেখা হ'ল। থৎমেসের রাজধানীতে—প্রাচীন গ্রীসেরা যাকে Heliopolis বা সূর্য্যপুরী বল্‌তেন সেই নগরে—কীর্ত্তিস্তম্ভ খাটান হ'ল।

দুহাজার বৎসর পরে, যখন সুন্দরী ক্লিওপেট্রা ছিলেন ইজিপ্টের রাণী, তখনও রোমানরা ইজিপ্ট জয় কর্‌তে এসে সূর্য্যপুরীর মাঝখানে সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখেছিল।

তখন তার গায়ে থৎমেসের গুণগান আর সূর্য্যের স্তব ছাড়াও আরও নূতন লেখা দেখা দিয়েছে। সেটি হ'চ্ছে রাজা রামেসেসের কীর্ত্তি। স্তম্ভের বয়স যখন প্রায় আটশ' বছর, তখন তার একটা দিক খালি দেখে রামেসেস্ তাঁর নিজের যশের কাহিনী তার উপর খুদিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই এক স্তম্ভ দেখেই দুটি রাজার রাজত্বের কথা, সেকালের সূর্য্য পূজার সংবাদ, আরও নানা রকমের অদ্ভুত খবর পাওয়া যায়।

রোমানরা আস্‌বার পর রাণী ক্লিওপেট্রা স্তম্ভটিকে মহা সমারোহ ক'রে নূতন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া নগরে সরিয়ে নিলেন। সেইখানে উনিশ শ' বৎসর

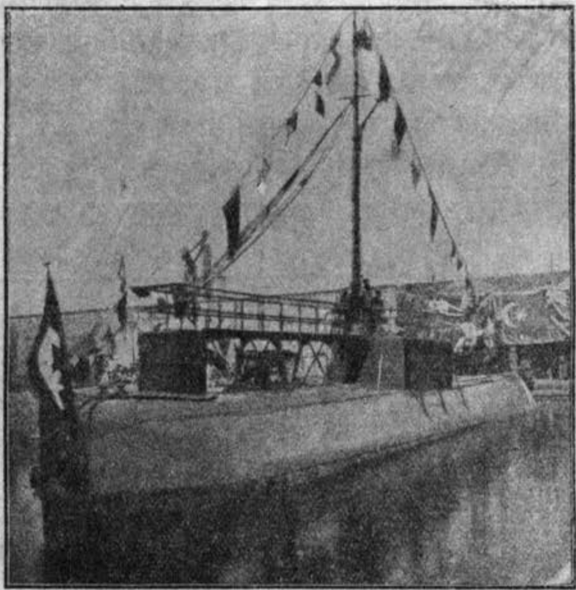


লোহার খোলে স্তম্ভ

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে কীর্ত্তিস্তম্ভ একদিন ধ'সে পড়ল। সমুদ্রের বালি এসে ক্রমে তার শেষচিহ্ন বুজিয়ে দিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সার রাল্‌ফ্ এবারকম্বি স্তম্ভটিকে সমুদ্রের বালির নীচ থেকে খুঁড়ে বার করেন। তখন থেকে চেষ্টা আরম্ভ হ'ল, স্তম্ভটিকে ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নেবার উপায় কি? উপায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে আর নানা রকম পরামর্শ কর্‌তে কর্‌তে ছিয়াত্তর বৎসর কেটে গেল। তখন স্থির হ'ল স্তম্ভটিকে লোহার খোলের মধ্যে পুরে তাতে হাল মাস্তুল লাগিয়ে রীতিমত জাহাজ গড়ে তুল্‌তে হবে।

অনেক যত্ন ও অনেক হাঙ্গামা ক'রে স্তম্ভের চারিদিকে লোহার পাত মুড়ে জাহাজের খোল তৈরী ক'রে, যেমন সেটা টেনে ভাসান হ'ল অম্নি সমুদ্রের একটা পাথরে লেগে জাহাজের খোল ফুঁটো হ'য়ে স্তম্ভশুদ্ধ ডুবে গেল। আবার অনেক চেষ্টার পর সমস্ত তুলে মেরামত ক'রে জাহাজ খাটান হ'ল। ছোট্ট জাহাজ,

তার ছয়জন নাবিক—একটা বড় ষ্টীমার তাকে সমুদ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে চল্‌ল। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর বয়সে স্তম্ভ তার জন্মভূমি ছেড়ে শেষ বিশ্রামের জন্য বিদেশে চল্‌ল। কিন্তু যাওয়াও ত সহজ ব্যাপার নয়; স্পেনদেশের উত্তরে বিস্কে উপসাগরে আসতেই এমন ঝড় আর তুফান উঠ্‌ল যে নাবিকেরা প্রাণের ভয়ে ছোট জাহাজ ছেড়ে বড় ষ্টীমারে উঠে পড়ল। সেই ষ্টীমার স্তম্ভশুদ্ধ জাহাজটিকে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে রেখে চলে গেল। ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে জাহাজ তখন ভেসে চল্‌ল! দু মাস পরে অন্য একটা বড় জাহাজ তাকে সমুদ্রের মধ্যে দেখতে পেয়ে টেনে এক বন্দরে নিয়ে হাজির করল। তার জন্য সেই জাহাজের মালিককে ত্রিশ হাজার টাকা বখশিস্ দেওয়া হ'য়েছিল।



১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর টেম্‌স্ নদীর ধারে ভিত্তি স্থাপন ক'রে স্তম্ভটিকে আবার নূতন ক'রে দাঁড় করান হ'ল। যদি আবার দু হাজার বছর পরে কেউ আবার মাটি খুঁড়ে তার আবিষ্কার করতে চায়, তখন সে ঐ ভিত্তির নীচে থেকেই আজকালকার মানুষের বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারবে। ঐ ভিত্তির মধ্যে ২৫০ রকম ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ আছে, একালকার নানা রকম মুদ্রা আছে, আসবাব, খেলনা, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছোট খাট অনেক জিনিষ আছে।